শিশুর জীবন ও শিক্ষা

শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য



শিশুর জীবন ও শিক্ষা

শিশুর জীবন ও শিক্ষা

অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-টি, এম-এ (এড),
এম-এ (লণ্ডন), টি-ডি (লণ্ডন)

ডিপ্লোমা-ইন-মণ্টেসরি ট্রেনিং (লণ্ডন), কাব্যতীর্থ, সাহিত্যভারতী (বিশ্বভারতী), সরস্বতী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানেন্দ্রমোহন রিসার্চ্চ স্কলার, লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ও আগ্রা বি. আর. ট্রেনিং কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক, কলিকাতা ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ শিক্ষাপ্রসার বিভাগের সহ-সম্পাদক ; 'শিক্ষা ও শিক্ষানীতি', 'শিক্ষাপ্রসঙ্গ', 'Society and Education' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম সংস্করণ ঃ
৭ই আশ্বিন,
১৮৭৯ শকাব্দ

চার টাকা
বার আনা

প্রচ্ছদসজ্জা ঃ
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীবিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
তারকনাথ প্রেস
২, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪

উৎসর্গ

যাঁর পূতজীবনের মহীয়ান্ আদর্শ অনুকরণীয় ছিল সেই স্বর্গত পিতৃদেবের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে এই ভক্তি-অর্ঘ্য।

শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য



ভূমিকা

আমার ছেলে রঞ্জু—মাত্র দুটি শীত পেরিয়েছে। তার চাওয়া-পাওয়ার কান্নাহাসির হিসেব মেলাতে মেলাতে দৃষ্টি ফিরল শিশুর মনোজগতের দিকে। বুঝলাম বিচিত্র শিশুর মন। একটু প্রেরণা একটু স্নেহ সোনার কাঠির মত তাদের মধ্যে জাগিয়ে দেয় বিপুল উৎসাহ, আনে গভীর তৃপ্তি। ছোট্ট শিশুকিশলয় স্নেহার্ত্তজনের আন্দোলনে দিন দিন পূর্ণতার পথে এগিয়ে যায়। তারা চায় স্নেহপূর্ণ সুষ্ঠু নির্দ্দেশ—নিষেধের গণ্ডী নয়।

তারাই জাতির ভবিষ্যৎ—আর তাদের ভবিষ্যৎ দুলছে শিক্ষক, অভিভাবক ও সমাজের হাতে। শিশুর জীবনবেদের কাহিনী নিজের অভিজ্ঞতা মিশিয়ে লিপিবদ্ধ ক'রবার প্রয়াস পেয়েছি, আর সেই সঙ্গে প্রত্যেক পিতামাতা, শিক্ষক, অভিভাবকের কর্ত্তব্য সম্পর্কেও ইঙ্গিত দিয়েছি এই বইএর মধ্যে।

আমাদের দেশে অনেক শিশুই আজ উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত। তাদের মুখে হাসি ফোটাতে হ'লে চাই পিতামাতার যত্ন, আত্মত্যাগ ও সংযম; চাই শিশুর ব্যক্তিত্বের প্রতি মর্য্যাদাবোধ ও তাদের রুচি ও প্রবণতার দিকে শৈশব থেকে দৃষ্টি। তাদের মাঝে যে বিপুল সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে তাকে রূপ দিতে হ'লে শিশুমনের খবর জানতে হবে। তাই রহস্যময় শিশুচিত্তের ওপর আলোকপাত ক'রবার প্রয়াস পেয়েছি এই গ্রন্থটির মাধ্যমে। বহু পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হ'লেও একসঙ্গে গ্রন্থাকারে প্রকাশ ক'রবার স্বপ্ন সার্থক হ'য়েছে কয়েকজনের অনুপ্রেরণায়। তাঁদের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় ডক্টর সুহৃদচন্দ্র মিত্র ও শিক্ষক শিক্ষণবিভাগের অধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধেয় কমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমার শ্রদ্ধেয় ও দরদী বন্ধু শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ যত্ন ও সহৃদয় দৃষ্টিভঙ্গী এই গ্রন্থটির প্রকাশ সম্ভব ক'রেছে। তাই তাঁর কাছে আমি একান্ত কৃতজ্ঞ।

বর্ত্তমান সংস্করণে ভুল ত্রুটী থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়—তাই এই সম্পর্কে কোন নির্দ্দেশ উপদেশ পেলে নিজেকে ধন্য মনে করব। ইতি—

—গ্রন্থকার

যে সব বই থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে ঃ

Maria Montessori—The Secret of Childhood

,, ,, —Discovery of Child

G. G. Thompson—Child Psychology

A. Bowley—The Natural Development of the Child

Benjamine Spock—Baby & Child Cares

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার
কর্তৃক প্রকাশিত —শিক্ষণ ব্যবহারিকা

প্রথম অধ্যায়

শিশুর জীবন ও মন

জীবনের সোনালি প্রভাত। আছে সোনার আলোয় ঝলমল প্রকৃতির অঞ্চল, আছে……কলোচ্ছ্বাস, আর আছে অজানা হতে স্পষ্ট-লোকের পথে রাতের অতিথির যাত্রা।

ধরণীর আলো অভ্যর্থনা জানাল নবাগত অতিথিকে। স্বর্গলোক থেকে সে এসেছে দেবদূতের মত,—দু' দিনের পরিচয় ধরণীর সঙ্গে। কতদিনের আঁধার কারাবাস থেকে মুক্তি পেয়েছে সে। তাই আলো যে তার কাছে অতি প্রিয়। অবাক বিস্ময়ে সে তাকিয়ে থাকে এই আলোর প্লাবনের দিকে, বর্ণ বৈচিত্র্য একে একে শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাইরে নীল শ্যামলের রূপ, রক্তরবির ঝিলিমিলি, বনভূমির আলো-ছায়ার দিকে শিশুর দৃষ্টি হয় প্রসারিত।

শব্দরাজ্যেও বিভিন্ন শব্দতরঙ্গ শিশুর কানে বাজতে থাকে। পাখীর ডাক, বৃষ্টির রিমঝিম শিশুকে আকৃষ্ট করে।

দিন আসে দিন যায়, দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু। দু'মাস যেতে না যেতেই সুরু হয় দেহের চালনা ও আত্মপ্রকাশের দুরন্ত প্রয়াস। আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে শিশু। মাকে ও নিজেকে ছাড়া তখন আর সে কাউকে জানে না।

তার পর সুরু হয় তার জীবন-সংগ্রাম। তার কাছে বাইরের জগৎ অজানা ও রহস্যময়। একে একে আলো-বাতাস ও কান্না-হাসি সব কিছুই তার মনে তুফান তুলতে সুরু করে। ক্রমশঃই পরিবেশ শিশুর মনে রেখাপাত করে। প্রকৃতি তার কাছে প্রথম ও প্রধান শিক্ষক হয়ে দাঁড়ায়। কিছুদিনের জন্য শরীরের দিক থেকেও তার অবস্থা হয় অসহায় এবং সব সময়েই সে 'মা'র কিংবা অন্য কোন দরদী বন্ধুর সহায়তা খুঁজতে থাকে। একথা বললে ভুল হবে যে প্রথম থেকেই শিশুর মন বলে কিছু একটা গড়ে ওঠে—কারণ মানসিক জীবন অন্ততঃ বেশ কিছু দিন না গেলে (ছয়মাস) সুরু হয় না। একটা অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে তারা দিন কাটাতে থাকে। অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে তার যে অভিযান সুরু হয় তা পূর্ণ হতে বেশ কিছু সময় লাগে। পশুদের সাথে মানুষের এইখানেই তফাৎ।

প্রায় তিন মাস পর্য্যন্ত শিশুর কোন ইন্দ্রিয়ই বিশেষ সজাগ হয়ে ওঠে না। তার চোখে অস্পষ্ট ছায়া, কানে চুড়ীর ঝন্‌ঝনানি একে একে তার প্রাণে নতুন এক চেতনা সঞ্চার করে। চোখ খুলে সে যতই দেখতে চেষ্টা করে ততই যেন তার সামনে অজানা সমুদ্র ভেসে ওঠে। সব কিছুই সেখানে তার অপরিচিত। তারপর এমন এক সময় আসে যখন সব কিছুরই প্রতি তার কৌতূহল হয় সজাগ। ইংরাজীতে একে বলে প্রাণসঞ্চার (Incarnation)। অন্যান্য প্রাণী থেকে মানব-শিশুর পরিণতি সময়-সাপেক্ষ। অন্ততঃ আট মাসের আগে এদের মুখে কথা ফোটে না, এক বছরের আগে চলতে পারে না ; কিন্তু তার আগে থাকতেই আত্মপ্রকাশের জন্য এদের সংগ্রাম সুরু হয়ে যায়।

অনেকে মনে করেন যে মাংসপেশীর দূর্ব্বলতার জন্যই এরা চলতে পারে না বা সোজা হয়ে বসতে পারে না। কিন্তু আসলে তা নয়। দেহের বিভিন্ন অংশ ও মনের মধ্যে যতদিন এরা সংহতি স্থাপন করতে না পারে ততদিনই এই অসহায় অবস্থা। এই সংহতির কাজ অনেকের পক্ষে বেশ কঠিন হয়ে পড়ে, ফলে তাদের কথা বলতে, দাঁড়াতে দেরী হয়। পরিবেশের সঙ্গে নিত্য-নতুন পরিচয়ের মধ্যে শিশুর মন ভরে উঠতে থাকে এবং তার সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে তার ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হতে থাকে।

এমনি করে যখন শিশুর চেতনালোকে রূপ, রস, গন্ধ, স্বর, স্পর্শ ছায়া ফেলে যায় তখন তার মন হয় সজীব ও সজাগ। সে মনের সন্ধান যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের কাছেই শিশু মানবের পিতা বলেই ধরা দেবে। মনে হবে—'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে।'

ছোট্ট যে শিশু, যাকে আমরা অনেক সময় উপেক্ষা করি তারও একটা সজাগ মন আছে এবং সে মন এতই সজাগ যে ভালো-মন্দ ঘাত-প্রতিঘাত সবই সে বুঝতে পারে। এমনও দেখা গেছে যে শৈশবে যখন বাপ মায়ের কাছ থেকে কোন শিশু বিশেষ কোন আঘাত পেয়েছে, তখন মুখে সে কিছু না বললেও মন থেকে তার সে আঘাতের কথা মুছে যায় নি এবং বড় হয়ে অন্যভাবে সে তার প্রতিশোধ নিয়েছে। তাই তাঁদের শৈশব থেকেই এদের প্রতি খুব সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। কোনরূপ অবহেলা ও উপেক্ষা শিশুর ভাবী জীবনকে অভিশপ্ত করে তুলতে পারে। শৈশবই জীবনের এক স্বর্ণযুগ, তাই এই মাহেন্দ্রক্ষণ উপেক্ষা

করা উচিত নয়। প্রত্যেক শিশুই সাধারণতঃ সত্যের পূজারী, সৌন্দর্য্যের উপাসক। সকলেই প্রায় সত্যকে ভালবাসে, সুন্দরকে মনে মনে পূজা করে। তাই যতই এই সময় শিশুর সত্যনিষ্ঠা জাগিয়ে দেওয়া যাবে ততই তার ভাবী জীবন উজ্জল হয়ে উঠবে।

অনেকের ধারণা যে শিশুরা বোধ হয় স্বভাবতঃই বিশৃঙ্খল ও চঞ্চল। কিন্তু তাদের শৃঙ্খলার প্রতি যে অগাধ শ্রদ্ধা আছে তা' ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তাই শিশুদের জীবনের সুরু থেকেই এই শৃঙ্খলাবোধকে জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করা উচিত। তার ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ অনেকটা নির্ভর করে বয়স্কদের তার প্রতি ব্যবহারের ওপর। চেতন মনের সব কিছু লক্ষণই অল্প বয়স থেকেই লক্ষ্য করা যায় এই সব নবাগত শিশুদের মধ্যে। বাইরে যে রূপের সমারোহ তা সব সময়ই তাকে আকর্ষণ করে, কত রকম শব্দতরঙ্গ তার কানে ভেসে আসে এবং অন্তরেও শিশু চায় এই সব ডাকে সাড়া দিতে। কথা ফুটবার আগে থাকতেই তার ভিতরে কথা বলবার চেষ্টা চলতে থাকে এবং বহুদিনের চেষ্টার ফলে একদিন হঠাৎ তার মুখে অর্থপূর্ণ ভাষার উচ্চারণ সম্ভব হয়। এমনি করেই তার সব ইন্দ্রিয়ই সজাগ হয়ে উঠে। জীবনের একটা সময়ে এদের চেতনা খুব প্রবল রূপ নেয়, ইংরাজীতে একে বলে sensitive period। মণ্টেসরীর মত শিক্ষাবিদ্ শিশুজীবনের এই বিশেষ মুহূর্ত্তকে যাতে উপেক্ষা না করা হয়, সেজন্য বিশেষ নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এই সময়ে শিশুর জীবন বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হতে থাকে। তাই যাতে সময়টির সদ্ব্যবহার হয় সেজন্য জীবনের উপযোগী নানা অনুশীলনী ও খেলাধূলার মধ্য দিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।

বীরত্বের প্রতি শিশুর আকর্ষণ যেমন স্বাভাবিক, বীর-পূজাও তেমন শিশু-মনের অন্যতম প্রবৃত্তি। গোপনে নিভৃতে সে তার মনের আসনে তারই অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে কোন বীরকে বসিয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে থাকে ও আত্মবিস্তারের পথ খুঁজতে থাকে।

শিশুমন স্বভাবতঃই ভাবপ্রবণ, তাই চঞ্চল। কোন কিছুতেই গণ্ডীবদ্ধ থাকতে তারা নারাজ। সব কিছুকেই নিবিড় ভাবে পাবার জন্যে এদের কৌতূহলের সীমা নেই। যে কোন অভিজ্ঞতার আস্বাদ লাভের জন্যে এরা সর্ব্বদাই আকুল। তাই কোন বাধা নিষেধ এদের নিরস্ত করতে পারে না। একমাত্র কাজ ও খেলাধূলার

মধ্যেই তারা যত আনন্দ পায়, কোন উপদেশ নির্দ্দেশ তাদের এত আনন্দ দিতে পারে না। আত্মকেন্দ্রিক শিশুর আত্ম-বিস্তারের প্রয়াসকে তাই কখনও ক্ষুণ্ণ করতে নেই।

শিশু মনের এই সব বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখেই তার শিক্ষাপদ্ধতি নির্দ্ধারিত করতে হবে, শিক্ষার মূল সূত্র খুঁজে বের করতে হবে।

শিশু হল কর্ম্মপ্রবণ তাই সে শ্রোতা হতে চায় না, হতে চায় কর্ম্মী। সব কিছু হাতে-কলমে শিখতে চায়, ভাঙ্গতে গড়তে চায়। এই জন্যেই শৈশবের শিক্ষা হবে মূলতঃ ক্রিয়া-কেন্দ্রিক। কারণ শিশুর কাছে কর্ম্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষার বিশেষ মূল্য নেই। একদিকে যেমন সৃজন-মূলক কাজের মধ্য দিয়ে তাকে জ্ঞানের পথে এগিয়ে দিতে হবে, তেমনি তাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে একে একে নিয়োজিত করতে হবে। কারণ যে কোন অভিজ্ঞতা আহরণের সিংহদ্বার এই ইন্দ্রিয়গুলি। যাতে যে কোন শিক্ষণীয় বিষয় বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিশু উপলব্ধি করতে পারে, সেজন্যে শিক্ষককে অনুরূপ আয়োজন করতে হবে। কখনও হাতের কাজের মাধ্যমে, কখনও বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে শিশুকে এনে, কখনও বা নানারূপ শিক্ষার উপকরণের সহায়তা নিয়ে শিশুশিক্ষা এগিয়ে যেতে থাকবে। তাই শিশুর পাঠ হবে উদাহরণের বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ; সেখানে থাকবে ছবি, নক্সা ও ছড়ার খেলা। তবেই সে আনন্দের সঙ্গে শিক্ষনীয় বিষয়কে গ্রহণ করবে। সে যে সুন্দরের উপাসক—তাই কোন নীরস তথ্য তাকে আকর্ষণ করতে পারবে না। তাই শিক্ষকের কাজ হবে তথ্যের চাপে শিশুকে ভারাক্রান্ত করে না তুলে আনন্দ-রসের আয়োজনে তার মনকে আকৃষ্ট করা। এই অনুরাগ-সৃষ্টি শিশুশিক্ষার মর্ম্মকথা। সে যাতে আনন্দ পাবে তাতে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে কার্পণ্য করবে না।

আগেই বলেছি প্রত্যক্ষ অনুভূতির মাধ্যমেই শিশুশিক্ষা বাঞ্ছনীয়। তাই শিক্ষককে থাকতে হবে নেপথ্যে। কখনও দরদী বন্ধুর আসন নিয়ে, কখনও স্নেহশীলা মায়ের বাৎসল্য নিয়ে, শিশুর মন বুঝে তাঁকে শিক্ষণের পথে এগুতে হবে। তাই বিষয়-বস্তুর চেয়ে শিশুকে জানবার প্রয়োজনই বেশী।

পরিবেশের মাঝেই লুকিয়ে আছে শিক্ষার উপাদান। কোথাও প্রকৃতি রাজ্যের অফুরন্ত রূপ ও বৈচিত্র্য, কোথাও বা সমাজ পরিবেশের কৃত্রিম স্পর্শ। এই দুয়ের মধ্যে যোগাযোগ করিয়ে দেবার কাজ শিক্ষকের। মাঝে মাঝে স্বাভাবিক চপলতার

জন্যে শিশুর মনে বিস্মৃতি দেখা দেয়। কারণ সাগর-সৈকতে তরঙ্গরেখার মত নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা শিশুচিত্তে রেখাপাত করে। নূতনের আগমনে পুরাতন মুছে যায়। তাই যা কিছু স্মরণীয় তাকেই শিশুর মনে জাগিয়ে রাখবার জন্যে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন। পাঠের মাঝে মাঝে শিক্ষক কৌশলের সঙ্গে পুনরাবৃত্তির ব্যবস্থা করে নেবেন। এই ভাবেই অজানা সমুদ্র মন্থনের সঙ্গে সঙ্গে রোমন্থনের সার্থকতা।

শৈশব অবস্থায় ক্রমশঃই ইন্দ্রিয়ের দিক থেকে শিশু সচেতন হয়ে ওঠে। একে একে তার ইন্দ্রিয়গুলির কাজ সুরু হয় এবং সেই সঙ্গে তার বুদ্ধি-বৃত্তিরও উন্মেষ হয়। এই বুদ্ধির উন্মেষ খুব মন্থর গতিতে হতে থাকে। যতই সে পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পায়, ততই বাস্তবের অভিজ্ঞতা তাকে বিজ্ঞ করে তোলে। একথা বললে ভুল হবে যে শিশু নিষ্ক্রিয়—সজীব নয়। শিক্ষা বিষয়ে গবেষণার ফলে আজ স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান গেছে যে শৈশব অবস্থায় এদের অনুভূতি এত তীব্র থাকে যে, সে সময়ের সুযোগ নিতে শিক্ষাবিদ্‌দের কুণ্ঠা করা কোন মতেই উচিত নয়।

দু' বছর বয়েস থেকেই শিশুবুদ্ধি সজাগ হতে থাকে, তারা ইন্দ্রিয়ের বাইরেও যে একটা বুদ্ধি-জগৎ আছে তার সন্ধান পায়। অনেকে মনে করেন যেসব জিনিষের বেশ জৌলুস আছে তাদের প্রতি শিশুরা আকৃষ্ট হয়, যেমন কোন উজ্জ্বল রং। এখন শিশুরা কি ভাবে এই বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সমন্বয়ে কাজে এগুবে, সেই নির্দ্দেশ শিক্ষককে দিতে হবে।

শিশুদের ভাল লাগে এমন অনেকগুলো কাজ খুঁজে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ শিশুরা সব জিনিযকে নিবিড়ভাবে পেতে চায়। শৃঙ্খলা ও ভাল জিনিষের ওপর লোভ শিশুদের পক্ষে স্বাভাবিক। শিশুদের সারা দেহ যখন আন্দোলিত হয়ে ওঠে তখন অনেক কিছুই আশা করা যায়।

পরিবেশের সঙ্গে শিশুদের জীবন যে জড়িয়ে আছে, সে কথা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছিলেন "মণ্টেসরি'' এবং এমনি আরও শিক্ষাবিদ্‌গণ। তাই তাঁদের মতে পরিবেশকেই অনুকূলে আনতে হবে। এই পরিবেশের মাধ্যমেই তাকে শিক্ষা দেবার যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। তাই তার শিক্ষার উপকরণ হবে পরিবেশ থেকেই সংগৃহীত আর প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে ভিত্তি করেই শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে উঠবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিশুর ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন সমস্যা

শিক্ষার কথা বলবার আগে শিশুর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। প্রত্যেক শিশুর চরিত্রে বা আচরণের মধ্যে কিছু-না-কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কিভাবে এই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ হয় তাও লক্ষ্যণীয়। প্রথমে দেখি, যে জন্ম নিল তার প্রাণে সঞ্চারিত হল এক নবচেতনা। একে একে ইন্দ্রিয়গুলোর কাজ সুরু হলো ও একটা নির্দ্দিষ্ট ধারায় সেগুলো কাজ করতে লাগলো। তারপর বাইরের জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে শিশুর অন্তর্জগতে চলতে থাকল বিবর্ত্তন, হলো বুদ্ধির বিকাশ। এই সামগ্রিক জীবনের পরিচয়ই তার ব্যক্তিত্বের পরিচয়।

ব্যক্তিত্ব কি ?

ব্যক্তিত্বকে খণ্ড খণ্ড করে দেখা যায় না, জীবনের সামগ্রিক রূপই তার পরিচায়ক ; তবুও তাকে যে কয়েকটা উপাদানে ভাগ করা যায় একথা অস্বীকার করা যায় না। যেমন :—

ক। বুদ্ধিবৃত্তি

খ। আবেগ-উচ্ছ্বাস

গ। দৈহিক শক্তি ইত্যাদি।

বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে দেখা যায়, প্রত্যেক শিশুরই কিছু-না-কিছু বুদ্ধির সম্পদ আছে, তবে তাদের মধ্যে পার্থক্য অনেক। শুধু তাই নয়, প্রাণশক্তির দিক থেকেও এই পার্থক্য ধরা পড়ে। এখন কি ভাবে এই পার্থক্যের হিসাব নেওয়া যায়, কি ভাবে বুদ্ধি অনুযায়ী এদের বিশেষ বিশেষ কাজে লাগান যায় সেদিকে দৃষ্টি পড়েছে। চেষ্টাও হচ্ছে যাতে করে শ্রেণী পাঠন ও শিক্ষাপদ্ধতি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে নিয়ন্ত্রিত হয়।

শিশুপ্রকৃতি কেবলই বুদ্ধির উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে আরও কিছুর উপর। আবেগ, প্রাণধর্ম্ম, অনুভব, মেজাজ ও ভাবদৃষ্টির উপরও শিশুর ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে। যে শিশু আবেগ-ধর্ম্মা তাকে সব সময়ই কামনা, উচ্ছ্বাস ও উল্লাস

আন্দোলিত করে। তবে কি তাকে অস্বাভাবিক বলা হবে? মোটেই নয়। প্রায় প্রত্যেকের জীবনেই আবেগের এলোমেলো স্রোতের জন্যে কিছু না কিছু সাময়িক ঝড় ঝাপটা দেখা দেয়। এর থেকে একেবারে নিস্তার পাবার উপায় নেই, তবে সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে এদের দিকে তাকাতে হবে আর চেষ্টা করতে হবে যাতে সম্ভব মতো এইসব কামনা পূর্ণ করা যায়। আবেগ-ধর্মী শিশুদের মোটামুটি কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায়ঃ—

ক। সহজেই যারা বিরক্ত হয়।
খ। যারা কারণে অকারণে আশঙ্কার দোলায় দুলতে থাকে।
গ। ক্রোধ যাদের সহজে অভিভূত করে।
ঘ। একগুঁয়ে শিশু।
ঙ। বৈক্লব্যগ্রস্ত শিশু।

সহজেই যারা বিরক্ত হয়

লক্ষণ—এই শ্রেণীর শিশু খুব তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ে; কোন কিছু মুখস্থ করতে দেরী হয় ও কোন কাজে মনোনিবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এরা বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমতে পারে না ও মাথার ওপর সব সময় যেন কিছুর বোঝা অনুভব করে। এরা ট্রামে বাসে চাপলে অসুস্থ অনুভব করে।

কারণ—এইসব মানসিক অসুস্থতার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—হয় অত্যধিক শরীরের ওপর পীড়ন, একটানা একঘেয়ে কাজ করা, কিংবা অন্য কোন অনেকদিনস্থায়ী ব্যাধি এইরূপ মানসিক অসুস্থতাকে ডেকে আনে।

করণীয়—ক্লান্তির দুটি প্রকার আছে—একটি দৈহিক, একটি মানসিক। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মানসিক ক্লান্তি দৈহিক ক্লান্তির চেয়ে প্রবল হয়, ফলে কার্য্যক্ষমতার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করে। শিক্ষককে সবসময় অবসাদের কারণগুলো মনে রাখতে হবে এবং নানা প্রকার কাজ দিয়ে শিশুদের প্রাণে আনন্দ দিতে হবে।

শিশুর যে বিষয়ে বেশী কৌতূহল সে বিষয়েই তাকে কাজ করতে দিতে হবে। প্রচুর খেলাধূলার ব্যবস্থা, মুক্ত বাতাসে মাঝে মাঝে চলাফেরা করতে দেওয়া ও কাজের ফাঁকে ফাঁকে কিছু হাল্কা ধরণের আনন্দ পরিবেশন এই সমস্যাকে দূর করে।

যারা কারণে অকারণে আশঙ্কার দোলায় দুলতে থাকে

যে সব শিশু এই পর্য্যায়ে পড়ে, অর্থাৎ যাদের মন সব সময় শঙ্কিত তাদের চিনতে বেশী দেরি হয় না, কারণ কয়েকটি লক্ষণ গোড়া থেকেই এদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

লক্ষণ—রাত্রের মাঝখানে এরা ভয়ে জড়সড় হয়ে অনেক সময় বিছানায় জেগে শুয়ে থাকে।

এই দলের অনেক শিশুর মধ্যেই তোতলামি দেখা দেয়, আর সে তোতলামির কারণ ভয়।

ঘুমের মাঝখানে অনেক সময় এরা দাঁতে দাঁতে শব্দ করে।

ঘুমতে ঘুমতে কথা বলে।

ভয়ের স্বপ্ন দেখে।

যারা উদ্বেগে ভুগতে থাকে তাদের মধ্যেও আবার প্রকার ভেদ লক্ষ্য করা যায়, যেমন—একদল আছে যারা নিজেদের প্রাধান্য দেখাতে না পেরে সব সময়ই আত্মসচেতন হয়ে পড়ে। সব সময়ই তাদের চিন্তা—হয়তো তাকে কেউ অবহেলা করছে কিংবা আত্মীয় বন্ধুদের কাছে তাদের যোগ্য সমাদর হচ্ছে না।

কারণ—যাদের উদ্বেগ শুধু অপরাধকে কেন্দ্র করে—অর্থাৎ যাদের মনে সব সময়ই অপরাধের চেতনা—মন তাদের গোড়া থেকেই কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে অভিভাবকদের দোষে, কারণ অভিভাবকদের সব সময় বাধা নিষেধ তাদের মনের স্বাভাবিক গতিকে খর্ব্ব করে দেয়।

এই অপরাধ-চেতনা ছাড়াও আর এক রকম উদ্বেগ এদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, সে হচ্ছে সমাজের কাছ থেকে পাওয়া অবহেলার জন্যে। হয় তার মনে হয়, তাকে বুঝি দেখতে খারাপ, না হয়, এমনি আরও হীনতাবোধ।

এই ধরণের শিশু খুব বেশী দেখা না গেলেও এদের সংখ্যা ক্রমশঃই যেন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগুন ও রক্তপাতের ভয় এবং এমনি আরও অনেক ভয় এদের জড়সড় করে তোলে তাই এদের নিয়ে প্রবল সমস্যা।

করণীয়—এই ধরণের শিশুদের নিয়ে শিক্ষককে খুব সতর্ক হতে হবে, কারণ অল্প একটু উপেক্ষা বা অসতর্কতা অনেক সময় অনেক অনর্থ ডেকে আনতে পারে।

এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি করা উচিত নয় যাতে শিশুর মনে ভীতির সঞ্চার হয়।

যাতে আবেগ বা উত্তেজনা দেখা যায় এমনি কোন ঘটনাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করা উচিত।

শিশুকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে ভয়ের কিছুই নেই ; অন্য সব শিশুর মত তাকেও বুক ফুলিয়ে চলতে হবে, তারও জগতে বাঁচবার অধিকার আছে। মোট কথা একটা দরদী প্রাণের স্পর্শই হচ্ছে শিশুর কাছে সব চেয়ে বড় প্রয়োজন।

ক্রোধ যাদের সহজে অভিভূত করে

লক্ষণ—ক্রোধই যাদের মনকে সব সময় অভিভূত করে, যাদের মেজাজ সব সময়ই রুক্ষ, তাদের বুঝতে হলে তার কারণ বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন।

এই ক্রোধ নানা রূপে দেখা দেয়, যেমন—একটি শিশু যা পায় তাকে কামড়াতে চেষ্টা করে, ছিঁড়ে ফেলে একাকার করার চেষ্টা করে। হাতের জিনিষ চুরমার করে ভেঙ্গে ফেলে তবে নিশ্চিন্ত হয়। লোকজন দেখলে তারা কি ভাবে তাদের অসুবিধা করবে বা আঘাত করবে এই জন্যে সচেষ্ট হয়। ধ্বংসের প্রতি একটা আকর্ষণ যেন এদের মনের একটি স্বভাবিক ধর্ম্ম হয়ে ওঠে।

আর একদল আছে যারা ধ্বংস না করলেও মনে মনে জিনিষ ভাঙ্গবার চুরবার জন্য সব সময় একটা প্রবল বাসনা পোষণ করে।

কারণ—অনেক সময় দেখা যায় যে এই সব শিশুরা প্রথম জীবনে অত্যন্ত বেশী আদর পেয়েছে এবং তার ফলে তাদের আবদারে মনোভাব এসে গেছে।

এদের পরিবারে হয়তো সব সময় অশান্তি গোলমাল ঝগড়াঝাটি লেগে থাকে ও তার ফলে ছেলেবেলা থেকেই মন এদের বিগড়ে যায়।

করণীয়—কারণ বিশ্লেষণ করার পরই যে সুযোগ থেকে শিশু বঞ্চিত হয়েছে সম্ভবমত তাকে সেই সুযোগ বা স্নেহ দিতে পারলে ভাল হয়। শুধু তাই নয়, বিশৃঙ্খল মনকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনবার জন্যে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে যা সুন্দর তাকে উপভোগ করতে গেলে চাই সংযম। এইভাবে শিশুর মনে দাগ কাটতে পারলে, ভালর প্রতি আকর্ষণ জন্মাতে পারলে ক্রমশঃই শাসন শৃঙ্খলার প্রয়োজন কমে যাবে।

একগুঁয়ে শিশু

এই ধরণের শিশুর প্রতি শিক্ষকের দায়িত্ব খুব বেশী, কারণ এদের মধ্যে অনেক সময় বিরাট সম্ভাবনা দেখা যায় এবং যত্ন ও পরিচালনার অভাবে সে সম্ভাবনা অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়।

লক্ষণ—এই সব শিশু সাধারণতঃ দেরী করে স্কুলে আসে, আঙ্গুলের নখ কামড়াতে থাকে, অন্যের বিরক্তি আনবার চেষ্টা করে এবং সাধারণতঃ বেশী কথা বলে। প্রাধান্য বিস্তারের একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা এদের মধ্যে প্রবল রূপ নিয়ে দেখা দেয়, তাই যেখানেই বিধি-নিষেধ তার বিরুদ্ধেই এরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

কারণ—মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব এইরূপ আচরণের প্রধান কারণ। একদিকে বাধা-নিষেধ আর একদিকে মনের স্বভাবিক গতিএই দুয়ের মাঝে যখন সংঘাত বাধে তখনি এদের আচরণের বিকৃতি দেখা দেয়, আর পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে শিশু হয়ে ওঠে বেপরোয়া। এর ফলেই এদের আচরণ সমাজ-বিদ্রোহী হয়ে দেখা দেয়।

করণীয়—যাদের মধ্যে এই রকম একগুঁয়েমি দেখা যায় তাদের সংশোধন করতে গেলে চাই শিক্ষকের কৌশলী মন। যেমন—যে শিশু খুব বেশী নিজের প্রাধান্য প্রকাশ করতে চায়, তাকে কোন কিছু দল বা সভা গড়বার সুযোগ দিতে হবে। যার মধ্যে ঝগড়া করবার প্রবৃত্তি খুব বেশী, তাকে মিথ্যা ও অসত্যের বিরুদ্ধে ঝগড়া করবার অবকাশ দিতে হবে। এমনি ভাবে তার আদিম প্রবৃত্তিগুলোর মোড় ঘুরিয়ে দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপকার দেখা যায়।

বৈক্লব্যগ্রস্ত শিশু

যেসব শিশুদের মধ্যে দৈহিক কিছু বৈক্লব্য দেখা যায় তাদের নিয়েও সমস্যা কম নয়। এই সব দৈহিক বৈক্লব্য নানারূপে প্রকাশ পায় :—

লক্ষণ—চলাফেরার মধ্যে জড়তা।
কথা বলবার শক্তি হারান।
অন্ধ বা বধির হয়ে যাওয়া।
স্মৃতিশক্তি বিলুপ্তি।

কারণ—দৈহিক বিকৃতির মূলে অনেক সময় মনের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। তাই যারা কেবল দেহতত্ত্বের জ্ঞান নিয়ে এই সব রোগ সারাতে চান তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে সংশয় আছে। আত্মপ্রত্যয়ের অভাব অনেক সময় পক্ষাঘাতেরও আংশিক কারণ হয়ে দাঁড়ায় একথা আজ অনেকেই বুঝতে স্বরু করেছেন।

আকস্মিক কোন মানসিক আঘাত বা আবেগের দিক থেকে কোন বিশৃঙ্খলা অথবা শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট অনেক সময় এই বিকৃতিকে ডেকে আনে।

অপ্রত্যাশিত কোন আলোকের বন্যা, বিপুল কোন শব্দ-তরঙ্গ গ্রহণ করতে যদি মনের প্রস্তুতি না থাকে তবে দৈহিক কারণ ছাড়াও এই বিকৃতি ঘটতে দেখা যায়।

বিস্মৃতির প্রধান কারণ মানুষের মনের নির্দিষ্ট ধারকতা ও সীমাবদ্ধ ক্ষমতা। আমরা যা ভুলতে চাই তাই ভুলি,—এমনি একটা কথা আজ মনোবিজ্ঞানীরা বলতে স্বরু করেছেন। অর্থাৎ যা আমাদের কাছে অপ্রীতিকর, যে অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে তিক্ত, সে মনের গহনে ঠাঁই পেলেও চেতনালোকে তার কোন ঠাঁই হয় না। এই জন্যই শিশুদের মধ্যে যখন চরম বিস্মৃতি দেখা দেয়, তখন সেই স্মৃতিলোপের কারণগুলো একে একে বিশ্লেষণ করতে হবে।

অনেক সময় বড় রোগের পর, মানসিক আঘাতের পর বা বিরাট অন্তর্দ্বন্দ্বের পর স্মৃতির বিলুপ্তি দেখা যায়। হয়তো মানুষের মন মুক্তি খুঁজতে চায় বাস্তবের সংঘাত থেকে, তাই স্মৃতির রাজ্যে ভাঙ্গাগড়া স্বরু হয়ে যায় এবং এমন এক সময় আসে যখন ঘটনার স্রোত মনের বালুচরে কোন রেখাপাতও করে না।

করণীয়—মনস্তাত্বিক ফ্রয়েড বলেছেন যে, অবচেতন মনের অন্তরালে এমন অনেক সংঘাত দেখা দেয় যার প্রতিক্রিয়া ভয়ানক রূপ নেয়। এই সব প্রতিক্রিয়ার ফলেই নাকি নানা বিকৃতি বৈক্লব্য সূচিত হয়। এই সব সমস্যার সমাধান করতে হলে চাই মনঃসমীক্ষণ অর্থাৎ মনের মাঝখানে ডুব দিয়ে রোগীর সমস্যার কারণ আবিষ্কার করবার চেষ্টা। এই পদ্ধতিকে কার্য্যকরী করে তুলতে হলে সব চেয়ে প্রয়োজন রোগীর বিশ্বাসভাজন হওয়া। সঙ্গে

সঙ্গে রোগীকে সহানুভূতি দিয়ে শাসন করতে হবে ও এক সময় দেখা যাবে যখন রোগী তার সব-কিছুই খুলে বলবে কোন কিছু গোপন না রেখে রোগী তার সব কিছুই খুলে বলবে, সেই ফেলে-আসা দিনগুলির ইতিবৃত্ত থেকে সংগ্রহ করে নিতে হবে চিকিৎসার মূলসূত্রটি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, অনেক রোগী ডাক্তার বা শিক্ষকের সঙ্গেই প্রেমে পড়ে যায়। এই অবস্থায় বুঝতে হবে রোগীর মনের আঘাতের কথা, অভিমানের কথা, আর তাকে সাহায্য করতে হবে সুস্থ সবল মন ফিরে পেতে।

শিশুর ব্যক্তিত্ব নিরূপণের সমস্যা

শিশুকে শিক্ষা দেবার আগেই তার বুদ্ধি-বৃত্তি ও ব্যক্তিত্ব নিরূপণ করার চেষ্টা করাই বোধ হয় বাঞ্ছনীয়। কারণ কোন্ শিশুর মধ্যে কতটা সম্ভাবনা আছে তা বিচার করতে হলে জানতে হবে তার রুচি অর্থাৎ কোন্ বিষয়ে তার আগ্রহ বেশী—ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, আত্মপ্রত্যয়, কার্য্যে ক্ষিপ্রতা, মেজাজ, সততা ও এমনি নানা রকম গুণাবলী। এই ব্যক্তিত্ব নিরূপণের চেষ্টা সার্থক করে তুলতে হলে চাই কয়েকটি পরীক্ষা নিরীক্ষা। ধরা যাক শিশুর কোন পরিমাপক কাজে লেগে থাকবার ক্ষমতা ও আত্মপ্রত্যয় জানতে হবে আর এই দুইটি গুণ জানতে চাওয়াও খুব অস্বাভাবিক নয়। কারণ দেখা যায় এই দুটি গুণের উপর শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের কৃতিত্ব অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে ওঠে কেবল তার শক্তি সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করেই নয়, তার আগ্রহ ও আসক্তি এগুলোর উপরও নির্ভর করে তার সাফল্য। যে, যে বিষয়ে আগ্রহশীল সে বিষয়েই স্বভাবতঃ তার কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এই জন্য আগ্রহ ও আসক্তি নিরূপণের চেষ্টা করাও বোধ হয় শিক্ষকের পক্ষে বাঞ্ছনীয় হবে। কিন্তু কিভাবে এই আসক্তি নিরূপণ করা যায় এই কথাই আজ শিক্ষাবিদ্‌দের বিব্রত করে তুলেছে। অনেক রকম পদ্ধতি আছে, যেমন অনেকগুলো কাজের তালিকা দিয়ে কোন্ কাজ করতে ভাল লাগে তা জেনে নেওয়ার চেষ্টা। অবশ্য এই কাজগুলো এমনভাবে সাজান হয়েছে যে এক একটি কাজ এক একটি দিকের নির্দেশ দেবে; যেমন—অভিনয় করা, এখন যে অভিনয় করা পছন্দ করবে নিশ্চয় বুঝতে হবে তার মধ্যে লুকিয়ে আছে একটি শিল্পী-সুলভ মন। বাগান করা যার ভাল

লাগে বুঝতে হবে তার কৃষির দিকে প্রবণতা বা ঝোঁক আছে। তাহলেই প্রশ্ন উঠে যে, কটা মূলধারায় মানুষের রুচিকে ভাগ করা যায়। এবিষয়ে অনেকের অনেক রকম মত আছে, তবে ভারতীয় পরিবেশে কাজের সুবিধার জন্য মানুষের রুচিকে নিম্নের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় :—

ক। কলা বা চারুকলা।
খ। বিজ্ঞান।
গ। ব্যবসা-বাণিজ্য।
ঘ। যন্ত্রপাতি।
ঙ। কৃষি।
চ। জ্ঞান আহরণ।

অনেক রকম পদ্ধতি* থাকলেও সব কয়টি প্রয়োগ করার সুবিধা বা সুযোগ হয় না। তবে কয়েকটি পদ্ধতি তার মধ্যে বেছে নেওয়া দরকার। যে, যে-বিষয়ে অনুরাগী সে সে-বিষয়ে যে বেশ কিছু খবর রাখবে এটা খুবই স্বাভাবিক। যেমন যার অনুরাগ আছে কৃষির উপর—তার পক্ষে কোন্ গাছে কি সার দেওয়া উচিত, গাছের গোড়া কোন্ সময় খুঁড়ে দেওয়া উচিত, কোন্ গাছ অন্ধকার জায়গায় ভাল হয়, এই রকম সব খবর রাখা সম্ভব। এমনি যার অনুরাগ আছে সাহিত্য বিষয়ে—সে নিশ্চয় খবর রাখবে, কোন্ দেশে কে বড় কবি, কে কোন্ কাব্য বা উপন্যাস লিখে "নোবেল প্রাইজ" পেয়েছেন ইত্যাদি। এই ধরণের বিষয়ের প্রতি অনুরাগ ধরা প'ড়তে পারে শিক্ষার্থীর খবর জানবার প্রবৃত্তির ওপর বা খবরের পরিমাণের ওপর।

আর একটি পদ্ধতি আছে যেখানে অনেকগুলো কাজের তালিকা দিয়ে শিশুকে নির্ব্বাচন করতে বলা হয়। সে সব কাজের মধ্যে কোন্ কাজ সে পছন্দ করে এটা জানবার জন্য তাকে অনেক রকম প্রশ্ন অনেক সময় করা হয়। যেমন, —স্কুল থেকে ফিরে এসে তুমি সাধারণতঃ কোন্ কাজ করে আনন্দ পাও ?

অনেকে বলেন যে, প্রশ্ন দিয়ে শিশুদের কাছ থেকে তাদের অনুরাগ জানবার চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। কারণ অনেক সময় প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণ করবার মত বুদ্ধি শিশুদের থাকে না, বা বিশ্লেষণ করতে পারলেও সততার অভাবে তারা ঠিক উত্তর দেয় না। এইজন্যে প্রশ্ন না দিয়ে সত্যিকারের পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে বা অনুরূপ কোন পরীক্ষা করে তাদের অনুরাগ নির্ব্বাচনের চেষ্টা বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে করেন।

---

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অধ্যায়

শৈশবে অভ্যাস গঠন ও তার প্রয়োজন

মানুষের জীবনে অভ্যাসের প্রভাব অপরিসীম। অভ্যাসকে তাই শিক্ষায় বিশেষ স্থান দিতে হবে। একই কাজকে বারংবার নিষ্পন্ন করার ফলে যে কৌশল অর্জ্জিত হয় তা অভ্যাসেরই ফল। তাই যে কাজকে প্রথমে কঠিন বলে মনে হয় অভ্যাসের বশে ক্রমশঃ তা সহজ হয়ে আসে। যতই বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষ এই অভ্যাস গঠনে এগিয়ে যায় ততই তার শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়। কারণ যে কাজেই অভ্যাস জন্মায় তার জন্যে প্রয়াসের প্রয়োজন কমে আসে। ফলে সেই প্রচেষ্টা ও শক্তি অন্য নূতন কাজে নিয়োজিত হতে পারে। "থর্নডাইক"এর মতে অভ্যাস হল কয়েকটি প্রতিক্রিয়ার ভঙ্গি যার ওপর অনুশীলন বা শিক্ষার বিশেষ প্রভাব আছে।

অভ্যাসের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল মনের প্রক্রিয়াকে কমিয়ে নিয়ে আসা। অর্থাৎ যে কাজ অভ্যাসে পরিণত হয় তার পিছনে বুদ্ধি বিবেচনার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। তাই যে কাজ আমরা অভ্যাস বশে করি তাতে ক্লান্তিও অনেক কম। বিশেষ মনোযোগ ছাড়াও অভ্যস্ত ক্রিয়া চলতে পারে। কারণ অভ্যস্ত ক্রিয়া অনেক সময়ে যান্ত্রিক ভাবেই সম্পন্ন হয়। অভ্যাস শুধু দৈহিক কর্ম্মেরই নয়, অভ্যাস চিন্তারও হতে পারে। আমাদের বাঁধা খাতে জীবন যাত্রা অনেক সময় অভ্যাসেরই শৃঙ্খলে বাঁধা, আবার যে কোন সাধনা অভ্যাসকে কেন্দ্র করেই অগ্রসর হয়। তাই বোধ হয় অভ্যাসকে যোগ বলা হয়েছে। "ম্যাক্‌ডুগ্যাল" বলেছেন যে আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও এমন কি চিন্তাধারা সব কিছুই অভ্যাসমত পরিবেশের প্রতিফলন মাত্র। "বার্ট্রাণ্ড রাসেলে"র মতেও অভ্যাস সামাজিক জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

কারণ আমাদের সংস্কারের ওপরও অভ্যাসের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। তবে সংস্কার সহজাত আর অভ্যাস চেষ্টার্জ্জিত।

অভ্যাসের ফল

অভ্যাস শ্রমের লাঘব করে, জীবনের প্রাত্যহিক অনেক কাজই সহজে সম্পন্ন করতে সহায়তা করে। এই জন্যই অনেক সময়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অনেক

বিষয়ে অভ্যাস-গঠনে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। অনুশীলন অভ্যাসের মূল কথা বলেই বাঞ্ছনীয় সুঅভ্যাস গঠনের জন্য শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের সুযোগ দিতে হবে। বার বার মনের মধ্যে সেই বিষয়টির প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে প্রেরণা সঞ্চারের চেষ্টা করা দরকার। যদি তারা কোন বিশেষ কাজের প্রয়োজনকে অনুভব করে তবে তার অনুশীলনেও তারা কখনও পশ্চাদপদ হবে না। জোর করে কোন বদ অভ্যাস শিশুর মন থেকে সহজে দূর করা যায় না। যা মন্দ, যা অবাঞ্ছনীয় তাকে শিশুর সামনে তুলে না ধরাই ভাল। কোন বদ অভ্যাস দূর করতে হলে কোন সদ্-অভ্যাসের প্রতি শিশুকে অধিক আকৃষ্ট করতে হবে।

শিক্ষার্থীর জীবনকে বলিষ্ঠ করে তুলতে হলে তাকে কোন অভ্যাসের দাস করাই উচিত নয়। কারণ কোন অভ্যাসের শৃঙ্খলে বাঁধা না পড়াই যে সব চেয়ে ভাল অভ্যাস এ কথা অনেকেই বলে থাকেন। তাঁদের মতে পরিবর্তনশীল জীবনে কোন কিছুরই স্থায়ী মূল্য থাকতে পারে না। আজ যে অভ্যাস বন্ধুর কাজ করে, কাল তার জন্যে বিশেষ অসুবিধারই সৃষ্টি হতে পারে। তাদের এই সতর্কবাণী সত্ত্বেও জীবনে অভ্যাসের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া হয়তো বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ অভ্যাস কোন লক্ষ্যে উপনীত হবার সোপান মাত্র, তাই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে যদি কোন সদ্-অভ্যাস গঠন করা যায় তা পরিণামে ক্ষতিকর হতে পারে না। জীবনে এমন কয়েকটি লক্ষ্য আছে যার মূল্য সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ নেই। তাই সেই সব লক্ষ্যের শাশ্বত মূল্য যদি স্বীকার করতে হয় তবে তাতে উপনীত হবার উপায়কেও মর্য্যাদা দিতে হবে। এই হিসাবে সদ্-অভ্যাসের মূল্য কোন দিনই ম্লান হবার নয়। এখন সদ্-অভ্যাস কি কি, কি কি সদ্-অভ্যাস গঠনে শিক্ষার্থীকে শৈশব থেকেই উৎসাহিত করতে হবে এই নিয়েই প্রশ্ন। সুস্থ দেহে সুস্থ মনের প্রতিষ্ঠা বোধ হয় শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এই জন্যেই চিরকালই দেহের সুস্থতা মনের বলিষ্ঠতার দিকে দৃষ্টি রেখে অভ্যাস গঠনে তৎপর হওয়ার প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জীবনে সত্য কথা বলা, মানুষকে ভাল বাসতে শেখা, প্রকৃত জ্ঞানের পথে এগিয়ে যাওয়া, দেহের বলিষ্ঠতার জন্যে নিয়মিত ভাবে আহার নিদ্রা ও ব্যায়ামের অভ্যাস রাখা ও জীবনে সত্য সুন্দরের মূল্য দেওয়া বিশেষ লক্ষ্য হবে এবং এই লক্ষ্যকে রূপ দিতে হলে যে যে অভ্যাস অনুশীলনের প্রয়োজন তাকে স্বীকার করে নিতে হবে।

তাহলে প্রতিটি জীবনই সুন্দর ও সার্থক হয়ে উঠে। যেমন সুন্দর ভাবে সোজা হয়ে হাঁটা চলার অভ্যাসের প্রয়োজন, তেমনি জীবনের পথে সোজা হয়ে চলতে হলে কয়েকটি বিশেষ অভ্যাস গঠনের সার্থকতা আছে। হয়তো স্থান ও কাল ভেদে উপযোগিতার তারতম্য ঘটতে পারে কিন্তু তার সামগ্রিক মূল্য যে যথেষ্ট তা মানতেই হবে।

শিক্ষার্থী-জীবনে কয়েকটি অভ্যাস গঠনের নির্দেশ :—

ক। ভোরে ওঠা।

খ। বেশী কথা না বলা।

গ। সত্য কথা বলা।

ঘ। নিয়মিত পাঠাভ্যাস করা ইত্যাদি।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা ও তার লক্ষ্য

শৈশবের শিক্ষা সুরু হয় এই প্রাথমিক বিদ্যালয়েই, তাই যাতে শিশুকে জীবন-যাত্রার পথে এগিয়ে যাবার জন্যে উপযুক্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিতরণ করা যায়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন করা দরকার। সাধারণতঃ ভারতবর্ষে অধিকাংশ অভিভাবকই দরিদ্র। অনেকের আকাঙ্ক্ষা সত্বেও ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা দিয়েই শিক্ষার পালা শেষ করতে হয়। আবার অনেকের জীবন পল্লী-পরিবেশের মধ্যেই অতিবাহিত হয়। এই সব দিকে দৃষ্টি রেখে এই স্তরের পাঠ্যসূচী নির্দ্ধারিত করা উচিত। সামাজিক ও বাস্তব প্রয়োজনের দিকেও যেমন দৃষ্টি রাখতে হবে, তেমনি এই স্তরের শিক্ষার্থীর চিত্তবৃত্তি অনুযায়ী শিক্ষার আয়োজন করতে হবে। কারণ যা কিছু শিক্ষার্থীর চিত্তবৃত্তির প্রতিকূল, অভিজ্ঞতার বাইরে, তাকে জোর করে পরিবেশন করলে সুফলের আশা কম।

এখন দেখা যাক কি কি বিষয় কেমন ভাবে উপস্থাপিত হলে তার উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকবে না।

সাধারণতঃ পাঁচ বছর বয়স থেকেই শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়। তখন তাদের মধ্যে যে কয়েকটি প্রবৃত্তি বিশেষ প্রবল হয়, তার মধ্যে কৌতূহল সৃজন, খেলাধূলা ও দলবদ্ধতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া কল্পনা শিশুমনের ধর্ম্ম। তাদের উপযোগী পাঠ্যসূচীর মধ্যে তাই এই সব প্রবৃত্তির প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। মোট কথা, শিশুর ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধন করতে গেলে চাই তার শারীরিক ও মানসিক পরিপুষ্টি। কেবল বুদ্ধির পরিপোষণই একমাত্র লক্ষ্য হবে না। যাতে হৃদয়ের ধর্ম্ম, স্নেহ, প্রীতি, আবেগের দিকও উপেক্ষিত না হয় সেদিকে সজাগ থাকতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাস্তবের উপযোগী করে তুলতে হ'লে কায়িক শ্রমের প্রতি মর্য্যাদাবোধ তাদের মনে জাগিয়ে দিতে হবে ও প্রত্যেককে কায়িক শ্রমের অভ্যাস গঠনে সহায়তা করতে হবে।

কি কি বিষয় পাঠ্যসূচীভুক্ত হওয়া উচিত :—

(ক) হাতের কাজ : হাতের কাজ করতে শিশুরা কখনই বিরক্ত হয় না,

বরঞ্চ তাদের রুচিমত হাতের কাজ করতে পেলে শিশুরা অত্যন্ত খুসী হয়। কারণ এই কাজের মাধ্যমেই তারা আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়। সৃষ্টির আনন্দ তাদের মনকে ভরপূর করে তোলে, সঙ্গে সঙ্গে দেহেরও পরিপুষ্টি হয়।

(খ) পরিবেশ-পরিচিতি : বাস্তবের সাথে পরিচিত হতে হলে শিক্ষার্থীকে ক্রমশঃ পরিবেশের সঙ্গে নিবিড় ভাবে পরিচিত হতে হবে। জীবনের চলার পথে যে সব মানুষ, প্রকৃতি, জীবজন্তু, বন, পাহাড়, নদী নালার সঙ্গে তাদের দেখাশুনা হয়, সেই হলো তাদের প্রধান শিক্ষার উৎস। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়, তাই শিক্ষকের কাজ হবে শিক্ষার্থীকে নানাভাবে বিভিন্ন পরিবেশের সম্মুখীন করা। এই স্তরে ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, যাই পড়ান হোক না কেন, তাকে জীবনের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে ক্রিয়ার মাধ্যমেই শেখান উচিত।

(গ) কাজের মাধ্যমে যেমন শিশুরা আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায় তেমনি ভাষাকে কেন্দ্র করেও তাদের আত্মপ্রকাশ হবে। তাই প্রথমেই মাতৃভাষা শেখানোর দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে, যাতে তারা একে একে মাতৃভাষাকে ভালবাসতে শেখে। মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ জন্মালে ক্রমশঃ অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তারা অনুরাগী হবে। এই স্তরে যে কোন ভাষা শিক্ষার জন্য মনস্তাত্বিক উপায় অবলম্বন করা উচিত। প্রকাশের দিক ছাড়াও অনুভূতির যে একটা দিক আছে সে দিকেও উপেক্ষা করলে চলবে না।

(ঘ) বাস্তবের যে কোন অবস্থায় জয়লাভ করতে হলে বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও যৌক্তিকতার প্রয়োজন। এই দুইটি শক্তি মানুষের বিশেষ সম্পদ। তাই গণিত শিক্ষার সার্থকতা আছে। অঙ্ক বা গণিতকে এমনভাবে শেখাতে হবে যা শিক্ষার্থীকে বাস্তবের উপযোগী করে তোলে যাতে সে দোকানে-বাজারে, ঘরে-বাইরে কোথাও সে প্রতারিত না হয়।

(ঙ) পঠন, লিখন ও গণন এই তিনটি একদিন শিক্ষাক্ষেত্র বিশেষ স্থান লাভ করেছিল। কিন্তু আজ এগুলি ছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্র অনেক ব্যাপক হয়েছে। অঙ্কন, সামাজিকশিক্ষা, নীতিশিক্ষা, শরীর-শিক্ষা আজ শিশুজীবনে অপরিহার্য্য।

শিশুর অনুরাগ ও রুচির দিকে লক্ষ্য রেখে বিষয়গুলিকে পরিবেশন করবার ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানীয় ও সামাজিক প্রয়োজনকে কখনই উপেক্ষা করা

বাঞ্ছনীয় নয়। যেটি গ্রামের বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী, সেটি সহরের বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী থেকে কিছু না কিছু স্বতন্ত্র হবেই।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার লক্ষ্য ঃ—

(ক) শৈশবের শিক্ষাকে যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ করার প্রয়োজন। এইজন্যে বুনিয়াদী শিক্ষা হিসাবে তাকে ব্যাপক করতে হবে। জীবনে সকলের পক্ষে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ নাও মিলতে পারে—এই কথা মনে রেখে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকে ভাবী নাগরিক গড়বার শিক্ষা হিসাবে রূপ দিতে হবে। তাই জীবনের পথে চলতে গেলে মোটামুটি যে যে বিষয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন তার সবকিছুই মোটামুটি ভাবে পরিবেশন করা এই স্তরের পাঠ্যতালিকার উদ্দেশ্য হবে।

(খ) ব্যক্তিত্বের বিকাশের সহায়ক করতে হলে প্রাথমিক-পাঠ্যসূচীকে বৈচিত্র্যময় করার প্রয়োজন। বিশেষ করে শৈশবই শিক্ষার স্বর্ণযুগ, বীজ-বপনের প্রকৃষ্ট সময়। তাই পাঠ্যসূচীকে পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে—ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রগঠনের পরিপোষক করার বিশেষ সার্থকতা আছে।

(গ) কমনীয় বৃত্তি, সদভ্যাস, নীতিবোধ ও সমাজ-চেতনা যাতে ছেলেবেলা থেকেই গড়ে ওঠে সেদিকে দৃষ্টি রেখেই এদের শিক্ষার আয়োজন ও পাঠ্য তালিকা নির্ব্বাচিত হবে। শরীর-শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে বিদ্যালয়ের কর্ম্ম-তালিকার মধ্যে তার অন্তর্ভুক্তির একান্ত প্রয়োজন। কারণ শৈশবে শরীর সংগঠন না হ'লে ভাবী জীবনে হঠাৎ তাকে গড়ে তোলা কঠিন হ'য়ে পড়ে।

(ঘ) শিশুর দেহ, মন ও আত্মার বিকাশ সাধনের দিকে দৃষ্টি রেখে তার সামগ্রিক উন্নতিই হবে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য।

প্রাথমিক পাঠ্যসূচীতে পঠন, লিখন ও গণিতের স্থান

শিশুর প্রাথমিক প্রয়োজন হিসেবে পড়া, লেখা ও অঙ্ক কষার নৈপুণ্য অর্জ্জনের সার্থকতাকে স্বীকার করতেই হবে। কারণ জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই তিনটিতে দক্ষতা না জন্মালে বর্ত্তমান জগতে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখাই কঠিন হয়ে পড়ে।

আজ জীবনের প্রয়োজন অনেক বেড়ে গেছে—দৃষ্টিভঙ্গীও পাল্টে গেছে। তাই শিক্ষার আদর্শ বা লক্ষ্য হয়েছে ব্যাপক। কিন্তু তবুও বুনিয়াদ ভাল করতে হলে পড়া, লেখা ও গণিতে দক্ষতা জাগিয়ে দিতেই হবে।

অনেকে হয়ত বলবেন যে, এ তিনটি শিক্ষার লক্ষ্য হতে পারে না—এরা কেবল জ্ঞানের পথে এগিয়ে যাবার সোপান মাত্র। হয়ত তাই। তবে যাকে কেন্দ্র ক'রে শিশুর এই অগ্রগতি ঘটবে তাকে উপেক্ষা করা হয়ত সমীচীন হবে না।

শিশুর পড়ার দিকে গোড়ার থেকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ পড়ার ওপর নির্ভর করে বিষয়বস্তুর বোধ ও অনুভূতি। পড়া শুদ্ধ ও সুন্দর হলে শিশুমন যথেষ্ট আনন্দ পায়। কথায় আছে—"আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।" যদি যত্নের সঙ্গে কোন কিছু পড়া যায় তবে বর্ণাশুদ্ধিও কম হবে।

সেইরূপ লেখার মূল্যও শিক্ষার্থী-জীবনে যথেষ্ট। "Writing makes a man perfect"—লেখার মাধ্যমে শিশু সৃষ্টির আনন্দ পায়। ক্রমশঃ সে যে জিনিষ দেখবে তাকে রূপ দিতে চেষ্টা করবে ও অনেক হিজিবিজি কাটবে। একে একে সে লিখতে শিখবে।

শিশু-শিক্ষাপদ্ধতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

হাতে-কলমে কাজের মধ্যে দিয়ে এদের শিক্ষা দিলে তা বিশেষ কার্য্যকরী হয়। কোন কিছু ক্লান্তি বোধ না করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এরা একটি হাতের কাজ করে যেতে পারে, কিন্তু মৌখিক উপদেশ এদের সহজে অভিভূত করতে পারে না। যেমন, যদি বলা হয় একটি শিশি থেকে এক ফোঁটা জল না ফেলে আর একটি শিশিতে ভর্ত্তি করতে, তাহলে যতক্ষণ তাদের ক্ষমতা থাকবে ততক্ষণ তারা এই কাজ করে যাবে। কিন্তু যদি একটি বই দিয়ে তাকে পড়তে বলা হয়, তবে দেখা যাবে যে কিছুক্ষণ বাদেই তার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবে। অর্থাৎ অন্তরের অনুভূতি ও আনন্দ দিয়ে তারা যা নিজে থেকে করে বা করতে চায়, তাছাড়া কোন কাজ চাপালে তার কোন বিশেষ ফল হয় না, সেজন্য শিশুকে ভালভাবে জেনে তার প্রয়োজন মত কাজ দিতে হয়।

অনেকে ভুল করেন যে শিশুর হয়তো কোন আত্মচেতনা নেই। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এদের মাঝেও আত্মমর্য্যাদাবোধ প্রখর। এরাও বোঝে মান অপমান—তাই এরা যা চায় তা না পেলে অনেক সময় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, কখনও বা অভিমান জানায়। অনেক শিশুকেই ছেলেবেলা থেকেই বেশ একগুঁয়ে দেখা যায়, কারণ তাদের আত্মমর্য্যাদা বোধ খুবই প্রকট। তাই পিতামাতার বা

অভিভাবকের কর্তব্য হবে শিশুকে আরও একগুঁয়ে করে না তোলা, সে যা চায় তা সাধ্যমত যুগিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে তার প্রতি সকলের সহানুভূতি আছে। দরদ ও স্নেহ শিশুর পরম কাম্য। তাই সেখানে কোন ঘাটতি ঘটলে সে অভিযোগ জানায়।

শিশুর মধ্যে কেবলমাত্র শুভ বুদ্ধির উন্মেষ ঘটাবার দায়িত্ব অনেকটা তার অভিভাবকের ওপর। আর এই শুভবুদ্ধি একবার জাগলে তাকে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে আসা খুব সহজ হয়। তাই পরিবেশকে যতটা সম্ভব অনুকূল করে এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে নামতে হবে।

পরিবেশের সাথে শিশুর একে একে পরিচয় হয়, চঞ্চল জগতে সে নিজেও চঞ্চল হয়ে পড়ে। পাখীর ডাক, রৌদ্রের লুকোচুরি খেলা সব কিছুই তাকে আত্মপ্রকাশের দিকে উদ্বুদ্ধ করে। অন্তরের ভাবকে প্রকাশ করবার জন্যে তাই সুরু হয় কতই না আকুলি বিকুলি। সে প্রাণপণে চেষ্টা করে তাকে রূপ দিতে। তাই কিছু দিনের জন্যে সে অর্থহীন কয়েকটি কথা উচ্চারণ করেই তৃপ্তি পায়। একে একে অর্থযুক্ত শব্দ তার কানে বাজতে থাকে। বস্তুর সাথে ভাষার একটা যোগাযোগ সে লক্ষ্য করে; প্রত্যেক জিনিষেরই যে একটা বিশেষ নাম আছে সে কথা সে বুঝতে শেখে। উচ্চারণের অসুবিধা হ'লেও একে একে সে ভাষা আয়ত্ত করে—দিন কয়েকের জন্যে তার মুখ দিয়ে কথার ফোয়ারা ছোটে। এই অবস্থায় তাকে জড় ও জীব-জগতের সঙ্গে একে একে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। ক্রমশঃ তার ইন্দ্রিয়গুলি সজাগ ও সক্রিয় হবে।

শিশুকে অজানা থেকে ক্রমশঃ জানার দিকে নিয়ে যেতে হলে তার অভিজ্ঞতার পরিধিকে সব সময় মনে রাখতে হবে। যা কিছু জানা তাকে কেন্দ্র করেই এই অভিযান সুরু হবে। তাই শিশুর যে পরিবেশের সঙ্গে নিত্য পরিচয় তা থেকে বৃহত্তর পরিবেশে তাকে নিয়ে আসতে হবে। গৃহ থেকে বিদ্যালয়ে, বিদ্যালয় থেকে গ্রামে—এমনি করে পরিচয়ের পরিধি বিস্তীর্ণ হবে।

শিশুশিক্ষাকে ফলপ্রসূ করে তুলতে হলে ব্যক্তিগত পার্থক্যকেও জানবার প্রয়োজন। কোন্ শিশুর কি বিষয়ে অনুরাগ ও প্রবণতা, কার কতটুকু ধারণা-শক্তি এই সব বিবেচনা করেই শিশুকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। যার যে দিকে অনুরাগ তাকে কেন্দ্র করেই যদি শিক্ষা দেওয়া হয় তবে শিশু সহজেই তা গ্রহণ করতে পারে। জোর করে শিশুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে কোন কিছু

শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তাকে শিক্ষা দেবার সময়ে তার স্বাস্থ্য, শক্তি ও সমস্যাকে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। অনেক সময়ে পারিবারিক সমস্যা বা অন্য কোন আবেগ-মূলক সমস্যা শিশুকে বিব্রত করে। ফলে সে শিক্ষার পথে পিছিয়ে পড়ে। এজন্যে শিক্ষকের সহানুভূতি ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি শিশুশিক্ষার পক্ষে একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বিষয়-বস্তুর উপস্থাপনের ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করে। তাই বিষয়কে সজীব করে তোলবার জন্যে শিক্ষককে যত্নবান হতে হবে। গল্প, ছড়া, ছবি, উদাহরণ, মডেল ও এমন কি ছোট-খাট আলোক-চিত্রের সাহায্যে পাঠকে সরস করবার প্রয়োজন। তাই শিক্ষায় শ্রাব্য-চাক্ষুষ সহায়তার (Audio-visual-aids) কথা আজ এত শোনা যায়।

আজ শিক্ষাক্ষেত্রে যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার মধ্যে পিছিয়ে-পড়া শিশুর সমস্যাও কম নয়। কেন শিশুরা দিনের পর দিন পিছিয়ে পড়তে থাকে, অন্যান্য সহপাঠীদের সঙ্গে ধাপ মিলিয়ে চলতে পারে না, একথা আজ অনেক শিক্ষাবিদ্‌কেই চিন্তিত করে তুলেছে।

কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে শৈশবে শিশুর প্রতি ঔদাসীন্য, তার আকাঙ্ক্ষা অনুরাগের প্রতি অবজ্ঞা ও শিক্ষকের অবহেলা এইজন্য মূলতঃ দায়ী।

প্রথম থেকেই যদি শিশুকে পাঠে অনুরাগী করা যায়, যদি তাকে আত্ম-প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয় ও তার বুদ্ধি বৃত্তির সদ্‌ব্যবহার করা যায় তবে এই সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে আসে।

পঞ্চম অধ্যায়

শিশু-শিক্ষা প্রণালী

শিক্ষকের প্রধান কাজ শিশুর প্রয়োজন বুঝে শেখান। আর তার এই প্রয়োজন বুঝাতে হলে তাকেই আগে বুঝবার দরকার। তাই বর্তমান যুগে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, যাতে আনন্দের সঙ্গে স্বাধীনভাবে শিশুরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে স্বচ্ছন্দে শিক্ষা লাভ করতে পারে। আজ দিকে দিকে সেই আয়োজন সুরু হয়েছে। কিন্তু সব আয়োজনকে সার্থক করে তুলতে হলে চাই—শিক্ষকের শিশু-দরদী মন ও শিশুর প্রতি সহানুভূতি। এই জন্যেই শিশুকে শেখান বেশ কঠিন কাজ। কারণ শিশুর দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিপথে রেখেই শিক্ষককে এগিয়ে চলতে হবে। এখন দেখা যাক শিশুজীবনের বৈশিষ্ট্য কি কি।

আবেগ উচ্ছ্বাসে ভরপুর চপল শিশুচিত্ত অপরিচয়ের অকূল জলধির মধ্যে কল্পনার পাল-তোলা নৌকা ছেড়ে দিয়ে প্রতিটি মুহূর্তকে মুখর করে তোলে। প্রচুর তাদের প্রাণশক্তি, বিপুল তাদের আত্মপ্রকাশের উৎসাহ। তাই শিশুদের মন কখনও হয় নূতনের পূজারী, কখনও বা অজানার রহস্য ভেদ করার জন্যে তাদের মন হয় আন্দোলিত।

শৈশবে শিশুর ইন্দ্রিয়গুলি এতই সজাগ থাকে যে, প্রকৃতি রাজ্যের যে-কোন ছায়াছবি, জীবনের যে কোন ঘটনা তাদের মনে রেখাপাত করে ও নতুন নতুন ভাবের তুফান তোলে।

আকৃতির দিক থেকে শিশুকে মানুষের ছোট্ট সংস্করণ বলে মনে হলেও মনের দিক থেকে তার জগৎ ভিন্ন। তাই বহু শিক্ষাবিদ্ শৈশবের রহস্য উদ্ঘাটন করবার প্রয়াসী হয়েছেন। এই সময় তাদের অবয়ব থাকে কোমল, শক্তি থাকে সীমাবদ্ধ, কিন্তু সম্ভাবনা থাকে প্রচুর। সাধ্যকে অতিক্রম করে অনেক সময় সাধ পক্ষ বিস্তার করে। তাই কখনও মনে হয় বড় হলে সে কত বড় বীর হবে, কত দূর দূরান্তরে ঘোড়া ছুটিয়ে কতই না দিগ্বিজয় করবে।

ভাষাশিক্ষা

শিশুদের কথার জড়তা কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করা, পূর্ণ বাক্য দ্বারা নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করা, শব্দের উচ্চারণে শুদ্ধি আনয়ন করা প্রভৃতি উদ্দেশ্য শিক্ষককে মনে রাখতে হবে। প্রথমেই শিক্ষক শিশুর পরিবার গৃহ আবেষ্টনী গ্রাম সম্পর্কে প্রশ্ন করে উত্তর সংগ্রহ করবেন ও ক্রমশঃ শিশুর জড়তা কাটিয়ে দেবেন। অনেকগুলো পরিচিত শব্দের মধ্য দিয়ে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করবার সুযোগ দিতে হবে। ছোট শিশুকে বই না দিয়ে কথা বলার ও শব্দ শেখান একটি ভাল উপায়।

এই ভাবে যখন বাক্যের সম্পর্কে শিশুর ধারণা স্পষ্ট হবে তখন বাক্যের অংশ-গুলোর ওপর একে একে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। উচ্চারণগত যে সব ভুল ত্রুটি শিশুর রয়ে যাবে সেগুলোকে সঙ্গে সঙ্গে শুধরে দেবার ভার শিক্ষকের ওপর। অনেক সময় "টনসিল" বা অন্য কোন স্নায়ুবিদ্ধ কারণে শিশুরা তোতলা হয়ে যায়। সে জন্যে শিশু যাতে তাড়াতাড়ি না করে, ধীরে ধীরে শান্ত ভাবে কথা বলতে অভ্যাস করে সেদিকে তাকে উৎসাহিত করতে হবে।

শিশুরা পরিচিত শব্দ সমষ্টির সাহায্যে ভাব প্রকাশের চেষ্টা করবে। নানান রকম গল্পের মধ্য দিয়ে তাকে আত্ম-প্রকাশের সুযোগ করে দিতে হবে। গল্পগুলি সাধারণতঃ শিশুর কাছে খুব আকর্ষণীয় হওয়া চাই। অনেক রকম গল্পই বলা চলে, যেমন—রূপকথার গল্প, পৌরাণিক গল্প, দেশবিদেশের গল্প, গাছ-পালা বা জন্তু জানোয়ারের গল্প বা অন্য কোন মজার গল্প। এই সমস্ত গল্প বলবার সময় শিক্ষককে শিশুর পরিচিত শব্দ সমষ্টির ওপর ভিত্তি করে একে একে নানারূপ নতুন শব্দের সাহায্য নিতে হবে। শৈশবের কল্পনাপ্রবণ মন গল্পগুলির মধ্য থেকে আনন্দের সন্ধান পাবে, সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নূতন শব্দের সঙ্গেও পরিচিত হবে।

এই গল্প বলার ভঙ্গিটি বিশেষ আকর্ষণীয় হওয়া দরকার। গল্প বলতে হবে সাধারণতঃ চলতি সহজ ভাষায়। চারিদিকে শিশুদের বসিয়ে মাঝখানে বসে বেশ সরল করে দরদ দিয়ে গল্প না বললে তার সার্থকতা অনেক কমে যায়।

প্রত্যেক শিশুই গল্প শুনতে ভালবাসে এবং শৈশবের এক এক স্তরে এক এক রকম গল্প তাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। অপরিচয়ের মধ্যে কিছু কিছু পরিচয় শিশুর কাছে আলোক-স্তম্ভের মত। তার চেনা-জানা জিনিষ, বাড়ীর পোষা বিড়াল, কুকুর, গরু, এদের নিয়ে গল্প সুরু করতে হবে। কারণ

ছোট্ট বয়সেই শিশুর অভিজ্ঞতার গণ্ডীও থাকে খুব ছোট। একটু বড় হলে মাটির গণ্ডী ছেড়ে তাদের চোখ পড়ে দূরের আকাশের দিকে। মেঘের রাজ্যে মন ওড়ে, কল্পনার নৌকায় ভর করে। তাই বনের পশু, গাছপালা ছেড়ে তারা পাখী, বক ও এমনি আরও উড়ন্ত প্রাণীদের কথা জানতে চায়। সাতরঙা রামধনুকের দেশে কে আছে, কি হচ্ছে ইত্যাদি নানা খবর জানার ইচ্ছা তাদের প্রবল হয়। সাধারণতঃ পাঁচ ছয় বছর বয়সেই কাল্পনিক রূপকথা শিশুর কাছে খুব ভাল লাগে। তবে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে সেগুলো শুধু কল্পনাই, সত্য নয়। মোট কথা এক এক স্তরে এক এক রকম গল্প শিশুদের কৌতূহল ও প্রয়োজন বুঝে বলতে হবে।

শিশু অনুকরণ প্রিয়। তার এই অনুকরণ শক্তি আছে বলেই সে অক্ষরগুলোর আকৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাকে দেখে অনুরূপ অক্ষর লিখতে চেষ্টা করে। বাংলা অক্ষরের সংখ্যা এতই বেশী যে তা শিখতে বড়ই সময় লাগে, ফলে শিশুর কাছে অনেক সময় কাজটি একঘেয়ে হয় পড়ে। তাই অক্ষরগুলোর আকৃতিগত সাদৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ করা চলে। প্রত্যেক শ্রেণীতে কয়েকটি করে অক্ষর থাকে। শিশুকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে বাংলার প্রতিটি অক্ষর কয়েকটি সরল রেখা বৃত্ত ও বৃত্তাংশ দিয়ে তৈরী করা যায়। কয়েকটি অক্ষর কেবল সরল রেখা ও বৃত্তাংশ দিয়ে, আবার কয়েকটি অক্ষর বৃত্ত বা বৃত্তাংশ দিয়ে তৈরী। উদাহরণ—শুধু সরল রেখা দিয়ে তৈরী—ব, ছ, য, দ সরল রেখা এবং বৃত্তাংশ দিয়ে তৈরী—ক, খ, গ ইত্যাদি।

লিপিমালার এই আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিকে শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে এবং খেলার মধ্য দিয়ে এই শিক্ষা দিলে কাজ অনেক সময় সুগম ও সহজ হয়। যেমন কতকগুলো জিনিষের ছবি কার্ডে এঁকে তার নামগুলো বড় বড় করে তার নিচেয় লিখতে বলা।

কিংবা কতকগুলো কাঠি বা নানা আকারের তারে বৃত্তাংশ দিয়ে বা কার্ড-বোর্ডে কাটা অংশ দিয়ে কয়েকটি অক্ষর তৈরী করে দেখাতে হবে এবং শিশুকে তা তৈরী করতে উৎসাহিত করতে হবে। এই ভাবে অক্ষর-গুলোর সাথে পরিচিত হবার পর শিশু যখন নিজেই পরম আগ্রহে লেখা সুরু করবে ও প্রত্যেক জিনিষের নাম শিখে তা নিজে লিখতে পারবে, তখনি হবে তার শব্দ-পরিচয়। এর পরেই গল্প ও অন্যান্য কথাবার্তার মধ্য দিয়ে বাক্য ও ভাষার সঙ্গে পরিচয় ঘটতে থাকবে। কিন্তু বাক্য

প্রয়োগ বা শব্দ ঘোষণা করতে হলে চাই শব্দগুলির সম্পর্কে জ্ঞান। যদিও কথা বলতে বলতে বা শুনতে শুনতে শিশুর বাক্যবিন্যাস সম্পর্কে জ্ঞান জন্মাবে, তবুও তার শুদ্ধ প্রয়োগ সম্পর্কে তাকে সচেতন করে দিতে হলে চাই ব্যাকরণের ধারণা। এইজন্যে ব্যাকরণের জ্ঞান শিশুর কাছে অপরিহার্য্য। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে ব্যাকরণের জন্য ভাষা নয়, ভাষার জন্য ব্যাকরণ।

উপকরণ—কয়েকটি পরিচিত জিনিষের নাম লেখা ছোট ছোট কাগজ।

বাক্য—(ক) শিশুকে ব্যাকরণ শেখান, (খ) বিভিন্ন পদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। কোন রকমে এই শিক্ষা দেওয়া উচিত। পাঁচ থেকে ছয় বছর।

উপস্থাপন—শিশুর পাশে বসে তাকে এক একটি জিনিষ বা "মডেল" দেখাতে হবে, আর বাক্স থেকে কাগজের ওপর লেখা নাম তুলে তার নীচেয় রাখতে হবে। এই ভাবে নানা জিনিষ নিয়ে শিশুকে পরীক্ষা করতে হবে। যখন এমনি অনেকগুলো জিনিষ ও নাম এক সঙ্গে জড় হবে, তখন শিশুকে প্রশ্ন করতে হবে—এর মধ্যে কোন্‌গুলো জন্তুর নাম আর কোন্‌গুলো জিনিষের নাম। তারপর তাদের বর্ণনা করতে বলা হবে। এই সময় শিশু বলবে কাল গরু, লাল ফুল ইত্যাদি। এবার প্রাণী বা বস্তুর নাম এক শ্রেণীতে আর এক শ্রেণীতে তাদের গুণগুলোর নাম ভাগ করে বলতে শেখানে হবে। তারপর শিশুকে যে কোন একটি জিনিষ দিয়ে বর্ণনা করতে বললে সে হয়তো শুধু জিনিষগুলোর গুণই বর্ণনা করবে না, প্রাণীরা কি করছে না করছে তাদের কাজও বর্ণনা করবে; যেমন—কাল কুকুরটি দৌড়াচ্ছে। এখন যে শব্দগুলো দিয়ে কাজ বোঝায় তাদের আলাদা করে ভাগ করে ফেলতে বললে দেখা যাবে যে, এই পদগুলো একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এইভাবে শিশুকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, এক একটি বাক্য পূর্ণ হতে গেলে নানা রকম পদের প্রয়োজন। পরে সেগুলোকে একে একে বিশেষ ভাবে শিশুর সামনে তুলে ধরতে হবে।

বিভিন্ন পদের সঙ্গে পরিচয় করাতে বেশকিছু সময় লাগলেও একটি নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী শিক্ষক শিশুকে শিক্ষা দেবেন। কোনদিন কেবল বিশেষ্য পদকে নিয়ে, কোনদিন বিশেষণ, কোনদিন বা ক্রিয়া—এমনিভাবে হাতে-কলমে

ধীরে ধীরে শিক্ষা না দিলে ব্যাকরণের মত নীরস ও জটিল বিষয় শিশুর কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। তাই যাতে শিশুর আগ্রহ অক্ষুণ্ণ থাকে, সেদিকে শিক্ষককে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে ও নিত্য নূতন উপায়ের উদ্ভাবন করতে হবে।

শিশুকে ব্যাকরণ শেখাতে গেলে মোটামুটি কয়েকটি নীতি অনুসরণ করতে হবে; যেমন—অজানা থেকে জানার দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা সহানুভূতির মাধ্যমেই সম্ভবপর। অস্পষ্ট ধারণাকে স্পষ্ট করতে গেলে প্রচুর উদাহরণ, উপকরণ, ও সক্রিয় অনুষ্ঠান থাকা দরকার।

পদ-পরিচয়

বিশেষ্য পদ—বিশেষ্য পদ শিশুকে তার সংজ্ঞা দিয়েই বুঝিয়ে দিলে চলবে না, উপকরণ ও কাজের সাহায্যে এই শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে যে, বস্তু বা প্রাণীর নাম বোঝালে সেগুলো বিশেষ্য পদ হবে। এই ধারণাকে আরও স্পষ্ট করতে গেলে অনেকগুলি জিনিষ বা জিনিষের মডেল যোগাড় করে তাদের নামগুলো কাল কার্ডের ওপর লিখে দিতে হবে, তারপর শিশু একে একে জিনিষগুলো হাতে নেবে, আসনে বা কার্পেটের ওপর রাখবে ও তার নীচে নীচে কার্ডগুলো রাখবে। এমনি ভাবে বস্তু ও নামের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হবে।

বিশেষ্য ও ক্রিয়া পদের জন্য এমনি পৃথক পৃথক বর্ণের কার্ড তৈয়ারী করতে হবে। তারপর সেগুলো আলাদা আলাদা বাক্সে রাখতে হবে। এইবার মোটামুটি তিনরকমের বাক্স পাওয়া গেল—একটিতে বিশেষ্য পদ আর একটিতে বিশেষণ এবং অন্য একটিতে ক্রিয়া। এখন শিশুকে বলতে হবে যে-কোন একটি জিনিষ বা প্রাণীর মডেল কার্পেটে রাখতে। তারপর সেই অনুযায়ী কার্ডের ওপর লেখাটিও তার নীচে রাখতে বলতে হবে। এখন শিশু মুখে উচ্চারণ করবে সেটি কি এবং চোখ দিয়ে লেখাটিও দেখবে। এবারে শিক্ষকের কাজ হবে শিশুকে উপযুক্ত বিশেষণ ও ক্রিয়া পদে যোগ করতে সহায়তা করা। শিশু আর দুটি বাক্স থেকে বেছে বেছে বিশেষণ ও ক্রিয়াপদ তুলে নেবে। মডেলটিকে মাঝখানে রেখে বিশেষণ পদটিকে তার বাঁ দিকে আর ক্রিয়াপদটিকে তার ডানদিকে রাখবে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে যে, শিশু হয়তো বিশেষ্য পদ খুঁজতে গিয়ে একটি ঘোড়ার মডেল বা ছবি তুলে নিল। তারপর হয়তো বিশেষণ পদের বাক্সটি থেকে "সাদা" এই বিশেষণটি তুলে নিয়ে মডেল বা ছবিটির বাঁদিকে রাখতে হবে। দৌড়ান এই ক্রিয়াপদটি ছবি বা মডেলের ডান দিকে রাখতে হবে। এই ভাবে কাজের মধ্যদিয়ে শিশুর আনন্দের সঙ্গে পদ-পরিচিতি হবে।

সর্ব্বনাম, অব্যয় প্রভৃতি আরও যেসব পদ আছে সেগুলোর সঙ্গেও এই ভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। মোট কথা অবরোহ পদ্ধতিতে উদাহরণের সাহায্যে শিশুর ব্যাকরণ শিক্ষা হওয়া উচিত।

ইতিহাস শেখানোর পদ্ধতি

ভূমিকা—প্রাথমিক স্তরে ইতিহাসের বিষয়বস্তুর সাথে পরিচিতির আগে শিশুর পরিবেশ-পরিচিতি হবার প্রয়োজন। কারণ প্রথম শৈশবে তার বোধ-শক্তি সম্যকভাবে জাগ্রত না হবার জন্যে তাকে প্রথমেই আশে-পাশের অঞ্চল বা নিজের গ্রামের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। কতদিন ধরে গ্রামটির পত্তন হয়েছে, কয়টি পরিবার গ্রামে বাস করে, তার পূর্ব্বপুরুষ কে ছিল এবং এমনি আরও ছোট-খাট প্রশ্নের মাধ্যমেই শিশুর ইতিহাসে হাতে-খড়ি হবে। নিজের পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় বা অনুরূপ কোন পরিচিতি গল্পচ্ছলে উপস্থাপিত হলে শিশুর মনে তা রেখাপাত করে। অনেক সময় পৌরাণিক কাহিনী, রাজা-রাজড়া বা যুদ্ধের গল্প শিশুর মনকে আকৃষ্ট করে এবং এই ভাবেই সুরু হয় অতীতকে জানবার ইচ্ছা। দেশ-বিদেশের মানুষ, তাদের সভ্যতার ইতিহাস ইত্যাদি জানতে শিশুর ভালই লাগে। অতীত থেকেই যে বর্ত্তমানের উদ্ভব তা বুঝতে দেরী হলেও ঘটনাগুলোর বিন্যাসে ক্রমশঃই শিশু অভ্যস্ত হয়। এইজন্যে শিক্ষককে শিশুর আত্মপ্রকাশের সহায়তা করতে হবে।

ইতিহাস শেখাবার অনেকগুলি পদ্ধতি আছে, যেমন :

১। জীবনকাহিনীর ভিতর দিয়ে ইতিহাস শেখা

২। কোন বিষয়কে অবলম্বন করে ইতিহাস শেখা

৩। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে ইতিহাস শেখা।

প্রাথমিক অবস্থায় ইতিহাস শিক্ষা বাস্তব ও ব্যক্তিগত হওয়া চাই। তাই

শিশুদের জীবন-চরিত সঞ্চয় করতে বলা বা কোন কিছু আবিষ্কারের ক্রমবিকাশ সম্পর্কেই তথ্য সংগ্রহ করতে বলা একটি বিশেষ উপায়। কেবল এই বিকাশের মাধ্যমেই শিক্ষা দেবার প্রয়োজন নেই, যে বিষয়ে শিশু বেশী আগ্রহশীল সেইরূপ কোন প্রসঙ্গকে অবলম্বন করে যাতে শিশু ইতিহাস শিখতে পারে সেদিকেও শিক্ষককে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে—হয়তো শিশু রেলগাড়ীতে চড়তে খুব ভালবাসে আর তার রেলগাড়ীর ওপর কৌতূহলও খুব বেশী। তাই শিক্ষকের কাজ হবে সবচেয়ে আগে কে রেলগাড়ী আবিষ্কার করেছিলেন, কিভাবে তা সম্ভব হয়েছিল, একে একে কিভাবে এই ইঞ্জিনের উন্নতি সাধন হয় এবং কে কে এই উন্নতি সাধনের সহায়তা করেছিলেন এমনি। অনেক কিছু তথ্য শিশুকে পরিবেশন করা যেতে পারে এবং শিশুও তা আনন্দের সাথে গ্রহণ করতে পারে।

কাজের ভিতর দিয়ে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জন্মায় তাকে ইতিহাস শেখাবার কাজেও লাগান যায়। পুরাতন প্রণালীতে ইতিহাসের বইগুলোর স্থান ছিল সবচেয়ে বড়, কিন্তু আজ প্রাথমিক অবস্থায় এই বইগুলোর বিশেষ ঠাঁই নেই বল্লেই চলে। বই এর বদলে কাজের তালিকা নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। তাকে আর বিষয়বস্তু মুখস্ত করতে হয় না বটে কিন্তু নানান কাজের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়। কখনও তাকে পর্য্যবেক্ষণ করতে, কখনও অনুসন্ধান করতে, কখনও কোন হাতের কাজ দিয়ে জিনিষ তৈরী করতে, কখনও বা অভিনয় করতে তাকে উৎসাহিত করা হয়। কোনদিন হয়তো তাকে কোন একটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক স্থানে নিয়ে যাওয়া হল এবং তাকে তা পর্য্যবেক্ষণ করে কিছু বলতে বলা হল। সুবিধা হলে তাকে কাছাকাছি কোন যাদুঘরে নিয়ে যাওয়া যায় এবং সেখানে মৃত জন্তুদের আকার কিভাবে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি দিতে বলা যায়।

কোন একটা ধারা অবলম্বন করে কোন ছবির বই তৈরী করা, কোন ছবির সঙ্কলন করা, বা কোন জিনিষ দিনের পর দিন দেখে তার ক্রমবিবরণ দেওয়া অনেক সময় শিশুর কাছে আনন্দের কাজ হয়ে পড়ে।

আলোকচিত্রের সাহায্যে কোন ঐতিহাসিক বিষয়ের উপস্থাপন শিশুর কাছে খুবই চিত্তাকর্ষক হয়, তবে সবখানেই আলোকচিত্রের মাধ্যমে ইতিহাসশিক্ষা সম্ভব

হয় না ; তাই সেই সব স্থানে নানা রঙিন ছবি বা তালিকা ব্যবহার করা যেতে পারে। অভিনয়ও ইতিহাস-শিক্ষাকে সার্থক করে তোলে। বিশেষ করে কোন যুদ্ধ বা কোন রাজ্যের উত্থান-পতনের কাহিনী অভিনয়ের মাধ্যমে খুবই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। শোনা গল্প অভিনয় করার মধ্যে শিশু একসাথে পায় আনন্দ আর অভিজ্ঞতা বাড়াবার সুযোগ ; সাথে সাথে আত্মপ্রকাশের পথেও শিশুমন এগিয়ে যায়।

সাধারণতঃ ইতিহাস শেখবার দুটি মূল সূত্র আছে। একটিকে ইংরাজীতে বলে Source method (মূলসূত্র-প্রণালী), আর অন্যটিকে বলা হয় Project method (কর্ম্মকেন্দ্রিক প্রণালী)।

মূলসূত্র প্রণালী কেবল গবেষণাগারের জন্যই প্রযুক্ত হয় না, ইতিহাস শেখার কাজেও এই প্রণালী কাজে লাগতে পারে। সাধারণতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের এই প্রণালীর মধ্যমে শিক্ষা দিলে তা খুব সার্থক হয়ে ওঠে। যেমন বলা যেতে পারে, শিশুকে পলাশী যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে গিয়ে বা মুর্শিদাবাদে রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখাতে নিয়ে গিয়ে সেই সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে ইতিহাস শেখান। এখানে শিশু যা দেখল তাকে প্রকাশ করবার সুযোগ করে দিলে সে একে একে আত্মপ্রকাশ করতেও শিখবে। এমনি আরও অনেক জায়গায় শিশুকে নিয়ে যেতে পারা যায়, যেমন—'ভিক্টোরিয়া স্মৃতিস্তম্ভ', 'ফোর্ট উইলিয়ম' বা এমনি আরও অনেক জায়গায়।

কর্ম্মকেন্দ্রিক প্রণালী

এই প্রণালী শিশুর কাছে খুব আদরের হয়ে ওঠে, কারণ এর মধ্যে সে হাতে-কলমে কাজ করবার সুযোগ পায়। ইতিহাস শেখান, নানা উদ্দেশ্যের মাঝে একটি উদ্দেশ্য জীবনকে ভাল করে জানা ও বোঝা। আর এ উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে গেলে চাই শিক্ষকের সহযোগিতা। তিনি শিশুকে নিয়ে প্রথমেই পাড়ার এটা-ওটার দিকেই শিশুর দৃষ্টি ঘোরাতে পারেন। হাট-বাজার, মঠমন্দির, নদী-পাহাড়, ভগ্নস্তূপ ও এমনি আরও অনেক পল্লী বা প্রকৃতির জিনিষের দিকে শিশুকে কৌতূহলী করে ও তার ওপর প্রশ্ন করে তার দৃষ্টি প্রসারিত করে দেওয়াই হবে শিক্ষকের প্রধান উদ্দেশ্য। তারপর যখন পরিবেশের সাথে শিশুর পরিচয় হবে তখন সে প্রত্যেকটি জিনিষের প্রয়োজন বুঝবে ও প্রশ্ন করবে। জীবন যে পরিবর্ত্তনশীল। আজ যেখানে নগরী ভগ্নস্তূপ, অতীতে হয়তো সে একদিন

স্পন্দনমুখর ছিল ; আজ যেখানে নগরীর ব্যস্ততা, অতীতে সেখানে হয়তো গহন অরণ্য বিরাজ করত। জীবনের এই পট-পরিবর্ত্তনের পদ্ধতির দিকে শিশু যখন সচেতন হবে তখনই তার গড়ে উঠবে একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ 'মণ্টেসরি' ইতিহাসপঠনের জন্য সময়তালিকা প্রয়োগ করিবার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এই সময়তালিকা বলতে নানারকম ঘটনার বিবর্ত্তনের ইতিহাস বোঝাবার জন্যে তারিখগুলোর ধারাবাহিক তালিকা বোঝায়।

অতীতের মানুষ যা ভেবেছে যা করেছে ইতিহাস তাই বর্ণনা করে। তাদের সুখদুঃখ, কান্নাহাসি, জয়-পরাজয়ের কাহিনীই ইতিহাসের উপাদান। দেশ-বিদেশের বিগত দিনের মানুষের জীবন শিশু জানতে চায়, কারণ কৌতূহল শিশুদের একটি স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাই তার আগ্রহ ও কৌতূহলকে ভিত্তি করেই ইতিহাসের শিক্ষাপ্রণালী গড়ে ওঠা উচিত। শিক্ষককে সব সময় মনে রাখতে হবে যে, শিশুর আগ্রহ, রুচি, অভিজ্ঞতা ও শক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তিকে ঘিরেই ইতিহাসের পাঠন সুরু হওয়া উচিত। তাই শৈশবের প্রাথমিক স্তরে ইতিহাসের কোন নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যগ্রন্থ না থাকাই ভাল। তখন শুধু কাজের ভিতর দিয়ে, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে।

প্রথম শ্রেণীতে ঐতিহাসিক কাহিনীর সাথে শিশুর পরিচয় করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু কাহিনী পরিবেশনের নৈপুণ্যের ওপর ইতিহাস-পাঠনের সার্থকতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের যোগাযোগ স্থাপন করাই এই শ্রেণীর শিক্ষকের প্রধান কাজ।

ঐতিহাসিক কাহিনীর মত মহামানবদের জীবনকাহিনীও শিশুর কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। তবে কেবল ঘটনাবলী ধারাবাহিক বর্ণনা করলেই চলবে না, ঘটনার সাথে ব্যক্তিত্বের স্পর্শ, খণ্ড ছিন্ন জীবনের এলোমেলো ঘটনাকে কেন্দ্র করে মালা-গাঁথা এবং ঐতিহাসিকের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করাই হলো এই শ্রেণীর শিক্ষকের বিশেষ কাজ। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় যে, সময়ের অনুক্রম অনুসারে সব সময় ইতিহাসের পাঠন নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত নয়। আনন্দ ও রসের কার্পণ্য যাতে না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রেখে বিষয়-বস্তুকে বৈচিত্র্যময় করে তোলা, শিশুর আত্মপ্রকাশের ক্ষমতাকে জাগিয়ে দেওয়া ও সঙ্গে সঙ্গে ফেলে-আসা দিনের সাথে শিশুকে পরিচিত করিয়ে দেওয়াই ইতিহাস-পাঠনের মূল লক্ষ্য।

কেবল বর্ণনা বা বিবৃতি শিশুচিত্তকে আকর্ষণ করে না, সে চায় কাজের মধ্য দিয়ে আনন্দ পেতে। তাই এমন অনেক কাজ তাকে দেওয়া চলে যার মধ্যে দিয়ে শিশুর ইতিহাসশিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠতে পারে। সাধারণতঃ পর্য্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান ও হাতের কাজের মধ্য দিয়ে ইতিহাসশিক্ষা চলতে থাকে। যেমন শিশুকে কোন ঐতিহাসিক মূল্যপূর্ণ বিশিষ্ট স্থানে নিয়ে গিয়ে তাকে সেই স্থান থেকে বিবরণী সংগ্রহ করতে বলা হয়, ছবির বই সংগ্রহ করে তার থেকে ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বর্ণনা তৈরী করা, নানা রকম মিউজিয়াম বা বিশেষ প্রদর্শনীতে গিয়ে তার একটা ধারাবাহিক বিবরণী তৈরী করা ইত্যাদি কাজ দিয়ে শিশুকে ইতিহাসশিক্ষার পথে এগিয়ে দেওয়াই হবে শিক্ষকের কর্ত্তব্য।

অনেক সময় অভিনয় বা চলচ্চিত্র এই ইতিহাসশিক্ষাকে আনন্দময় করে তুলতে পারে, হয়তো কোন ঐতিহাসিক বিষয়কে নিয়ে কোন অভিনয় করা হলো বা কোন চলচ্চিত্র বা আলোকচিত্র দেখান হলো। ফলে শিশুরা আনন্দ পেল এবং অজ্ঞাতসারেই ঐতিহাসিক ঘটনা বা বিষয়ের সাথে পরিচিত হয়ে গেল। পল্লীর বিদ্যালয়ে সুযোগ কম থাকলেও শিক্ষকের যদি প্রচেষ্টা থাকে তবে তাঁরা শিশুদের উপযোগী করে এমনি কোন ছোটখাট নাটক মঞ্চস্থ করতে পারেন কিংবা এমন কোন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারেন যেখানে ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গেই পরিচয় হবে বেশী।

প্রাথমিক অবস্থায় ইতিহাসশিক্ষার প্রণালী কিছু স্বতন্ত্র হবে। দুটি মূল-নীতিকে কেন্দ্র করে শিক্ষাপদ্ধতিকে গড়ে তুলতে হবে। গল্প বলতে বা গল্প শুনতে ছেলেরা ভালবাসে, তাই গল্পই শিশুশ্রেণীতে বেশী ঠাঁই পাবে। মাঝে মাঝে কোন বিশিষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়া দরকার। কোন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বা মন্দির প্রভৃতি স্থান দেখে শিশুরা কেবল শেখেই না, আনন্দও পায়। বিদ্যালয়ে উৎসব-আনন্দের মধ্য দিয়ে মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনা, দু-চার জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদ্যালয়-বাসরে কোন কিছু বলতে বলা বা অনুরূপ কোন অনুষ্ঠান ইতিহাসপাঠনকে সার্থক করে তোলে।

সাধারণতঃ ইতিহাসপাঠন প্রণালীকে দুটি পর্য্যায়ে ভাগ করা চলে। একটি মূলসূত্র-প্রণালী (Source method), আর অন্যটি কর্ম্মকেন্দ্রিক প্রণালী (Project method).

ভূগোল শিক্ষা

ভূগোল শিক্ষার আগেই পরিবেশ-পরিচিতির প্রয়োজন। পরিবেশের সাথে পরিচয় না হলে ভূগোলপাঠন নিরর্থক হয়ে পড়ে। আমরা আমাদের পরিবেশের মধ্যে নিত্যনূতন পরিচয়ে ধন্য হই। কিন্তু একটি সন্ধানী মন ও দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে পরিবেশ-পরিচিতি নিবিড় হয়ে ওঠে না। ভূগোলপাঠনের পূর্ব্বেই তাই সেইদিকে শিশুকে সজাগ করে দিতে হবে।

ভূগোলসম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি আজ পাল্‌টে গেছে। কেবল দেশবিদেশের পল্লী-নগরীর পরিচয়ের মধ্যেই ভূগোল আজ সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্বের বুকে মানুষের পদসঞ্চারের কথাই আজকের ভূগোল জানিয়ে দেয়। মরুর বুকে ফুল-ফোটানোর সাধনা, প্রবাল দ্বীপে ইন্দ্রপুরী রচনার যুগব্যাপী ইতিহাস ক্রমশঃই ভূগোলের অঙ্গীভূত হয়ে উঠছে। কোথায় কেন কি করে কোন্ বন্দর গড়ে উঠল, কিভাবে মানুষ সভ্যতার বলে প্রকৃতিকে জয় করে আরণ্যক সভ্যতাকে খর্ব্ব করে নগরী পত্তন করল—এই সব বিবৃতি আজ ভূগোলের মাধ্যমেই জানতে পারা যায়; তাছাড়া সমাজ ও অর্থনীতির সাথেও যে ভূগোলের যোগাযোগ আছে একথা ক্রমশঃই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, বিশেষ করে প্রথম দুই শ্রেণীতে ছোট ছোট শিশুদের পক্ষে ভূগোলের জ্ঞান সহজে আসে না; অথচ তারা জানতে চায় তার পরিবেশের কথা, দেশবিদেশের মানুষের কথা। একে একে তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয় গৃহ হতে পল্লীর দিকে; পল্লী হতে জনপদের দিকে, জনপদ থেকে স্বদেশের দিকে, স্বদেশ থেকে বিদেশের দিকে। ক্রমশঃ পৃথিবীর আকৃতি ও আয়তন, তার গতিবিধি ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের সঙ্গে যাতে শিশুর পরিচয় হয় এদিকে লক্ষ্য রেখে শিশুকে ভূগোলপাঠনের কাজে এগুতে হবে।

প্রথম শ্রেণীতে ভূগোলের জন্য কোন বিশেষ পাঠ্যপুস্তক না থাকাই শ্রেয়ঃ। পরিবেশ-পরিচিতির জন্যে গ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে বা নদী, বন ও এমন কোন প্রাকৃতিক সৃষ্টির সঙ্গে একে একে শিশুর পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। জড় ও জীব-জগৎ শিশুর কাছে পরিচিত হবে। গ্রামের ধোপা, নাপিত, মুদি, গোয়ালা প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যবসায়ের লোকদের সাথে গড়ে উঠবে তার পরিচয়। কোন্ সম্প্রদায় তার জীবিকার উপযোগী কিরূপ বাসস্থান কোথায় নির্ব্বাচন

করে—ইত্যাদি নানা রকম প্রশ্নই শিশুর মনে জাগিয়ে তুলতে হবে। গ্রামের মাঝে কোথায় হাট, কোথায় মন্দির, কোথায় বা পুরানো দীঘি ও তাদের অবস্থিতি সম্পর্কে শিশুর মনে ধারণা জন্মিয়ে দেবার দরকার।

পথ চলতে চলতে নানা রকম জীবজন্তু, তরু ও উদ্ভিদের সাথেও শিশুর পরিচয় ঘটবে। কোন্ ফল কোন্ ঋতুতে জন্মায়, কখন কোন্ ফুলের ঝরে পড়বার সময়, সূর্য্য, চন্দ্র কখন কোন্ দিকে আকাশে দেখা যায় এমনি সব কিছু পরিবেশের পরিবর্ত্তনের ধারার দিকে শিশুকে সচেতন করে তুলতে হবে। দিগ্ নির্ণয়ে সহায়তা করবার জন্যেও শিক্ষককে নানা উপায় উদ্ভাবন করা উচিত। মোট কথা, ভূগোল শিক্ষাকে সরস করে তোলবার জন্যে যত পন্থা অবলম্বন করা যায়, তা সবই করতে হবে। অনেক সময়ে বাড়ীতেই নানা রকম জীবজন্তু পুষলে তাদের সম্বন্ধে জ্ঞান শিশুকে ভূগোল শিক্ষার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

নানা হাতের কাজ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আহরণ করতে শিশুকে সহায়তা করে—যেমন পরিভ্রমণের সময় শিশু যা দেখেছে তার নক্সা বা ছবি আঁকা, মানচিত্রকে নিয়ে নানারূপ খেলার ব্যবস্থা করা বা নানারকম মডেলের মধ্য দিয়ে শিশুর ধারণাকে স্পষ্ট করা। মাটিতে বালি কাদা ইত্যাদি নিয়েও খেলার ব্যবস্থা করতে হবে যা দিয়ে দ্বীপ, অন্তরীপ, মরুভূমি, মরূদ্যান, হ্রদ ইত্যাদি জিনিষের ধারণা স্পষ্ট হয়।

প্রথম শ্রেণীর মত মত দ্বিতীয় শ্রেণীতেও কোনরূপ পাঠ্যপুস্তক থাকবে না। গ্রামের চারিপাশে নানা ফল ও ফসল, ক্ষেতখামার প্রভৃতি শিশু লক্ষ্য করবে। তবে যাতে শিশুর পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা আরও বেড়ে ওঠে, যাতে তার দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হয়, সেজন্যে শিক্ষককে অধিকতর সচেষ্ট হতে হবে। যানবাহন সম্পর্কেও এই স্তরে শিশুর ধারণা জন্মিয়ে দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। এক স্থান হতে অন্যস্থানে যেতে হলে কোথায় কিভাবে যাওয়া যায় সে সম্পর্কেও শিশুকে সচেতন করে দিতে হবে। গ্রামের মাঝে কোন হাট বা বাজার থাকলে শিশুকে সেখানে নিয়ে গিয়ে সেখানে কি কি জিনিষ পাওয়া যায় না-যায়, কোথা থেকে সে সব জিনিষের আমদানী হয়েছে, কোথায় কিভাবে রপ্তানী হবে—এসব দিকে তার দৃষ্টিকে সজাগ করে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। হাতের কাজ,

সংগ্রহ, অনুশীলন ইত্যাদি নানা উপায়ে শিশুর ভূগোল শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হবে। যেমন ঃ—

তালিকা ঃ

১। শিশুরা কাদামাটি পাতা দিয়ে ঘরবাড়ী, পথঘাট তৈরী করবে।

২। পরিভ্রমণের সময় শিশু যা দেখেছে তার ছবি আঁকবে।

৩। নানারূপ মডেল ও খেলনা সংগ্রহ করে সেগুলোকে তার বিশিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী সাজাবে—যেমন কোন পল্লী বা নগরীর পরিকল্পনা নিয়ে মডেল বা খেলনাগুলোকে সাজিয়ে রাখবে।

৪। বাড়ীতে নিজেদের পরিবেশের মধ্যে নানা ফল, ফুল, পাতা, পাথর, ঝিনুক, নানারূপ মাটি প্রভৃতি সংগ্রহ করবে।

৫। বাড়ীর বা বিদ্যালয়ের নক্সা তৈরী করে নক্সার স্থানে স্থানে বিশেষ বিশেষ বস্তু যোজনা করবে।

৬। কোন্ দিন কতখানি বৃষ্টি হলো, শিশুরা তা লক্ষ্য রাখতে পারে ও সারা মাসে বা সারা বছরে কত ইঞ্চি বৃষ্টি হলো তা পরিমাপের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে পারে। শিক্ষককে দেখিয়ে দিতে হবে কিভাবে এই ব্যবস্থা করা যায়।

আবহাওয়া ও ঋতু-সম্পর্কে ধারণা জন্মে দেওয়াও ভূগোল শিক্ষার অঙ্গ। কখন কোন্ দিকে বাতাস বইছে তা শিশুরা একটা বিশেষ উপায়ে ঠিক করতে পারে, যেমন বাড়ীর উঠানে উচু একটা কাঠের বা বাঁশের কাঠি পুঁতে তার ওপর একটি টিনের ফলক এমনভাবে যুক্ত করতে হবে যাতে অল্প বাতাসে টিনের ফলকটি ঘুরতে থাকবে। ফলে বাতাসের গতি-পথ সম্পর্কে নির্দ্দেশ পাওয়া যাবে। এমনিভাবে আবহাওয়া-সম্পর্কে ধারণা জন্মে দেবার জন্যে অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। কেবল আবহাওয়াই নয়, ঋতুর বিবর্ত্তনের দৃশ্যগুলো শিশুর দৃষ্টিপথে আনতে হবে। সূর্য্যের গতি, উদয়াস্ত ও তার সাথে ঋতুর বিবর্ত্তনের সম্পর্কটিও শিশুকে ক্রমশঃ বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

গ্রামে বা নগরে যে যে বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলো সম্পর্কেও শিশুকে সজাগ করিয়ে দেওয়া যায়। ডাকঘর, থানা, বিদ্যালয়, জেলা, স্বাস্থ্যবিভাগ—এমনি আরও বিশেষ বিশেষ স্থানের সঙ্গে একে একে শিশুর পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

শিশুচিত্ত সাধারণতঃ চপল, তাই তাদের কাজের মধ্য দিয়েই শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয়। নানারূপ চার্ট বা ক্যালেণ্ডার তৈরী করতে দেওয়া, নানারূপ নক্সা ও মডেল তৈরী করতে বলা শিক্ষকের পক্ষে বিশেষ সার্থক হয়ে উঠবে। দেশবিদেশের ছবি, ফটো ও আলোকচিত্র ভূগোল শিক্ষাকে সহজ ও আনন্দময় করে তুলতে পারে।

গণিত শিক্ষা

শিশুর মন যতই পরিণত হতে থাকে ততই সে সব কিছু স্পষ্টভাবে পেতে চায়। অস্পষ্টের আভাস তাকে তৃপ্ত করতে পারে না। তাই সে যা দেখে, যে অভিজ্ঞতা আহরণ করে তাকে হিসেবের মধ্যে আনতে চায়। বাগানে কটি ফুল ফুটলো, কটা ফল পাকল, কত রকমের ফসল হলো তা জানবার জন্যে তার মন ক্রমশঃ সচেতন হয়ে ওঠে। পরিমাণসম্পর্কে চেতনা আনতে গেলে, খণ্ড-ছিন্ন অভিজ্ঞতার সংহত রূপ দিতে গেলে চাই গণিতের প্রয়োগ ; বাস্তব জীবনে এই জ্ঞানের বিশেষ সার্থকতা আছে।

আজ গণিত শিক্ষার ধারা পাল্টে গেছে। শিশুর অভিজ্ঞতা ও রুচির ওপর ভিত্তি করে সব শিক্ষাব্যবস্থাই গড়ে উঠছে, কর্মের ভিতর দিয়েই শিশু অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট লোকের দিয়ে যাত্রা সুরু করতে পারে। নানারূপ সমস্যা তার সামনে তুলে ধরা হয়, আর তার সমাধানও খুঁজে বার করতে শিশুকেই উৎসাহিত করা হয়।

গণিত শিক্ষার উদ্দেশ্য

জ্ঞানের স্পষ্টতা, বাস্তব বুদ্ধি, নিয়মনিষ্ঠা ইত্যাদি নানারূপ গুণ শিশুকে বাস্তবের উপযোগী করে তোলে। ঘর থেকে যখন সে বাইরে পা বাড়ায় তখন প্রতি মুহূর্তে তার প্রয়োজন হয় এই বাস্তব বুদ্ধির। সময়জ্ঞান, শৃঙ্খলা-বোধ, বিশ্লেষণবুদ্ধিকে পরিমার্জ্জিত করে এই গণিতশিক্ষাই। তাই শিশু মনে বিশ্লেষণের শক্তি জাগিয়ে দেওয়া গণিতশিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

শিক্ষাপদ্ধতি

প্রত্যেক শিক্ষকেরই কর্তব্য হবে শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করে তোলা আর নীরস বিষয়বস্তুকে সরস ও সহজ করে তোলা। শিশুর পর্য্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা





কাগজের টুক্‌রো দিয়ে তৈরীকরা সংখ্যা

ও চিত্তবৃত্তির ওপর ভিত্তি করেই শিক্ষাপদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, তাই বিষয়বস্তু-উপস্থাপনের ওপরই অনেক কিছু নির্ভর করে।

একটি নির্দ্দিষ্ট পাঠক্রম অনুসরণ করেই শিশুর শিক্ষা সুরু করা উচিত। একে একে তার অভিজ্ঞতার গণ্ডীকে প্রসারিত করতে হবে, তাই এক সাথে সব শিক্ষণীয় বিষয়কে উপস্থাপিত না করে অল্প অল্প করে একটি নির্দ্দিষ্ট ক্রম-অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া উচিত। যেমন প্রথম দিনে এক থেকে দশ বা তারও কম সংখ্যার সঙ্গে শিশুকে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

পাঠক্রম

১। আকার, আয়তন, ওজন, পরিমাণ ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট করবার জন্যে শিশুকে সুযোগ দেওয়া।

২। খেলার মধ্য দিয়ে ৫০ পর্য্যন্ত সংখ্যাগণন।

৩। সংখ্যা চেনা ও লেখা।

৪। সংখ্যাগঠন ও বিশ্লেষণ।

৫। রৈখিক পরিমাণ সম্পর্কে শিশুকে সচেতন করা।

৬। সময়ের পরিমাণ, যেমন সময়, দিন, সপ্তাহ ও মাসের সঙ্গে পরিচয়।

৭। মুদ্রার সঙ্গে পরিচয় ইত্যাদি।

আকার ও আয়তন

বিদ্যালয়ে আসবার আগেই গৃহ পরিবেশের মাঝখানে শিশুর বিভিন্ন আকারের বা ওজনের কিংবা আয়তনের জিনিষের সঙ্গে পরিচয় হওয়া স্বাভাবিক। কতরকম তরি-তরকারি, ফলফুল বা গৃহস্থালী জিনিষের সঙ্গে পরিচয়ে তার আয়তন ও ওজন সম্পর্কে ধারণা ক্রমশঃ স্পষ্ট হতে থাকে।

এই বয়সে অর্থাৎ প্রথম শৈশবে ছেলেদের ধারণাকে স্পষ্ট করবার জন্যে নানা রকম খেলনা বা টুকিটাকি জিনিষ ছোট-বড় বাক্স তাদের হাতে দেওয়া যেতে পারে। এই সব জিনিষ নাড়াচাড়া করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিশুর আকার ও আয়তন-সম্পর্কে জ্ঞান ক্রমশঃই স্পষ্ট হতে থাকে।

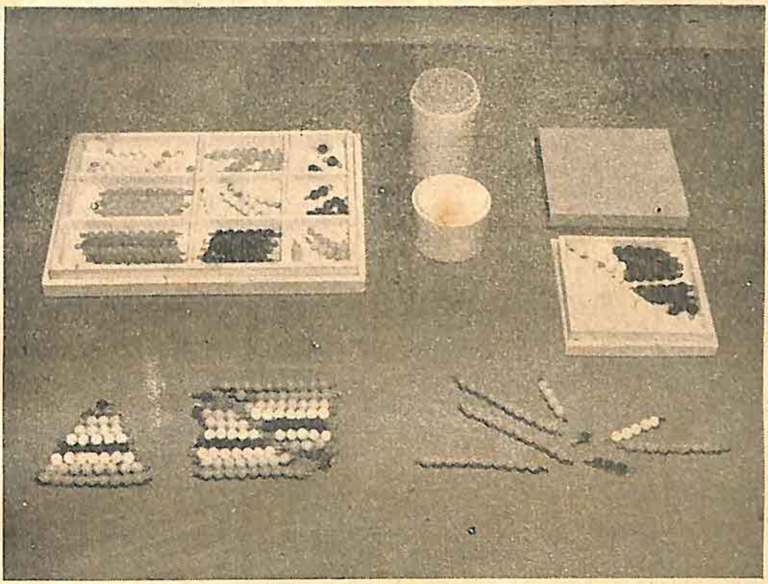
সংখ্যাগণনা

সংখ্যার ধারণা শিশুর মনে জন্মে দেওয়া বেশ কঠিন, কিন্তু এই কাজ সহজ হয়ে আসে যদি কেবল সংখ্যার রূপকে বস্তুর মধ্যে দিয়ে প্রকট করে তোলা যায়। শিশু যা দেখে তাকেই উপলক্ষ করে তাকে জিজ্ঞাসা করা যায়—কয়টি হাত, কয়টি ফল, কয়টি আঙ্গুল ইত্যাদি। প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়েই শিশুর সংখ্যাগণনার অভ্যাস স্থরু হয় ও একে একে সে সংখ্যা বলতে স্থযোগ পায়। আরও অনেক উপায়ে সংখ্যা পড়া ও লেখার অভ্যাস হতে পারে, যেমন কাঠের ব্লক, ক্যালেণ্ডার ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে। এক দিকে এক একটি কাঠের ছকের ওপর বিন্দু দিয়ে এক থেকে ১০ পর্য্যন্ত বোঝানো থাকবে আর এক দিকে সংখ্যাগুলোর লিপি রাখা হবে। ১ থেকে ১০ পর্য্যন্ত সংখ্যার ক্রমিক অর্থ শিশু যখন বুঝতে পারবে, তখন তার সমষ্টিগত বা দল-গত অর্থ বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি সংখ্যা কি ভাবে গড়ে ওঠে, তার ধারণাও যেমন স্পষ্ট হওয়া উচিত, তেমনি সংখ্যাগুলোর দলগত রূপও ছকের সাহায্যে বা অনুরূপ কোন পদ্ধতির সাহায্যে দেওয়া যেতে পারে। উদাহরণ-স্বরূপ 'ডমিনো'-পদ্ধতির কথা বলা যেতে পারে।

এর পর খেলার সাহায্যে এই সংখ্যার অর্থ শিশুর মনে আরও বদ্ধমূল করে দেওয়া যায়। কয়েকটি কুঁচ বা তেঁতুলবিচি নিয়ে শিশুকে ১ থেকে ১০ পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলোর রূপ দিতে বলা যেতে পারে এবং তার নীচে নীচে সংখ্যাগুলো লিখতে বলা যেতে পারে। সংখ্যাগুলো লিখবার আগে সংখ্যাগুলো চেনার কাজ ভাল হওয়া দরকার। সংখ্যাগুলোর আকারের ওপর হাত বুলিয়ে লেখা সহজ হতে পারে।

সংখ্যাগঠন ও বিশ্লেষণ

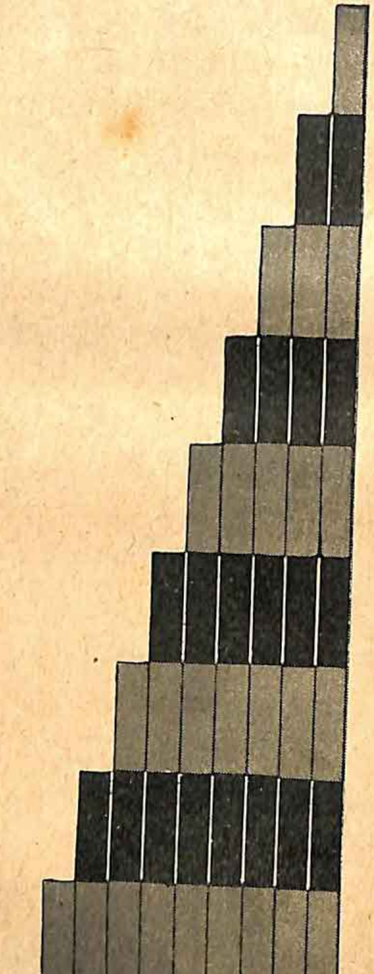
কি ভাবে একের পর এক যোগ করলে দুই হয় বা দুইয়ের সাথে তিন যোগ করলে পাঁচ হয়—এই সংখ্যাগঠনের পদ্ধতিটিকে কাজের মধ্য দিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখাতে হবে। গঠন ও বিশ্লেষণ এক সাথে চলতে থাকবে। এই গঠন ও বিশ্লেষণ-সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা জন্মিয়ে দেবার জন্যে সংখ্যার তালিকা ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন—



সংখ্যাগণনার জন্য পুঁথি ও পুঁতির মালা



সংখ্যাগণনা-রত শিশু



সংখ্যা গণনার জন্য কাঠের টুক্‌রো

১	২	৩	৪
১+১=২	২+১=৩	৩+১=৪	৪+১=৫
১+২=৩	২+২=৪	৩+২=৫	৪+২=৬
১+৩=৪	২+৩=৫	৩+৩=৬	৪+৩=৭
১+৪=৫	২+৪=৬	৩+৪=৭	৪+৪=৮
১+৫=৬	২+৫=৭	৩+৫=৮	৪+৫=৯
১+৬=৭	২+৬=৮	৩+৬=৯	৪+৬=১০
১+৭=৮	২+৭=৯	৩+৭=১০	
১+৮=৯	২+৮=১০		
১+৯=১০			

৫	৬	৭	৮	৯
৫+১=৬	৬+১=৭	৭+১=৮	৮+১=৯	৯+১=১০
৫+২=৭	৬+২=৮	৭+২=৯	৮+২=১০	
৫+৩=৮	৬+৩=৯	৭+৩=১০		
৫+৪=৯	৬+৪=১০			
৫+৫=১০				

এই ভাবে দশ পর্যন্ত সংখ্যা শিশুর যখন শেখা হবে, তখন দশের পরে যে সংখ্যাগুলো আছে তার দিকে এগুতে হবে।

কাঠির গোছা, পুঁতির মালা প্রভৃতি উপকরণের মধ্য দিয়ে গঠন ও বিশ্লেষণের কাজ সহজ ও সুগম হতে পারে।

রৈখিক পরিমাপ ও সময়ের পরিমাণ

রৈখিক পরিমাপের ধারণা না হলে গণিতের ধারণা অস্পষ্ট থাকে, তাই হাত, আঙুল বিঘৎ, ইঞ্চি, গজ প্রভৃতি বিভিন্ন এককের সাহায্যে এই ধারণাকে স্পষ্ট করতে হবে, কিন্তু হাতের কাজ না দিলে কেবল মনের ক্রিয়া দিয়েই শিশুদের কোন কিছুরই স্পষ্ট ধারণা হয় না। তাই বিভিন্ন মাপের কাঠি, দড়ি বা রঙিন ফিতে ইত্যাদি নানারকম উপকরণের আয়োজন করা

যেতে পারে। এক সমান মাপের ফিতে বা দড়ি কাঁচি দিয়ে কেটে যদি শিশুকে একক সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়, তবে সে কাজে আরও আনন্দ পাবে। কেবল তাই নয়, ঘরের আয়তন, দেওয়ালের উচ্চতা, দরজা-জানালার আয়তনের প্রতি শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। কেবল রৈখিক পরিমাপই নয়, সময়ের পরিমাণসম্পর্কেও শিশুকে সচেতন করে দিতে হবে। সময়, দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর, এমনি সব কাল-পরিমাণের তারতম্য বিষয়ে শিশুকে সজাগ করে দেওয়া প্রয়োজন। দিনসম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয় বারের নাম থেকে; কোন্ বারে গ্রামের হাট হয়, কোন্ বারে দোকান বন্ধ থাকে ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ ঘটনার দ্বারা বারের বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া চলে। একে একে ক্যালেণ্ডার বা দিনপঞ্জীর দিকে শিশুর দৃষ্টিকে সজাগ করা উচিত। এই প্রসঙ্গে ঘড়ির সাহায্যে ঘণ্টা, মিনিট বা সেকেণ্ডের ক্রমিক ধারণা এনে দিতে হবে। ক্রমে মাসের নামগুলোর সাথেও শিশুর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দরকার। তারপর কোন্ মাসে কি পার্ব্বণ, কি পূজা, কি উৎসব মাসগুলিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তার পরিচয় পেলে শিশু আনন্দের সঙ্গে মাসগুলির কথা মনে রাখবে।

মুদ্রার সাথে পরিচয়

অন্যান্য গাণিতিক পরিমাণের পরিচয়ের মতই মুদ্রার সাথে পরিচয়ও প্রয়োজনীয়। এই পরিচয়কে নানাভাবে নানা কাজের মধ্য দিয়ে নিবিড় করা চলে। প্রথমে প্রচলিত স্থানীয় মুদ্রার সাথে শিশুর পরিচয় হওয়া দরকার। তাদের বিশিষ্ট রূপ, আয়তন ও মূল্যের দিকেও তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। তারপর ডাকটিকিট, নোট, চেক্ ও অনুরূপ মুদ্রাস্থানীয় বস্তুর সঙ্গেও শিক্ষক পরিচয় করিয়ে দেবেন। বাজারে বা কাছাকাছি দোকানে অল্প দামের জিনিষ কিনতেও ৬।৭ বছরের শিশুকে পাঠান যেতে পারে ও পরীক্ষা-মূলকভাবে তার মুদ্রাসম্পর্কে জ্ঞানের পরীক্ষা করতে পারা যায়।

যখন মোটামুটি শিশুদের সংখ্যাগঠন ও বিশ্লেষণ সম্পর্কে ধারণা বদ্ধমূল হবে, তখন শিক্ষকের চেষ্টা হবে, শিশুকে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া ও বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজনকে শিশুর সামনে তুলে ধরা।

যোগ

যোগ শেখানর নানান উপায় উদ্ভাবিত হলেও "মণ্টেসরির" পদ্ধতি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এর তিনটি পর্য্যায় আছে, যেমন :—

উপকরণ—দশটি কাঠের টুকরো যেগুলোর পরিমাণগত পার্থক্য আছে। প্রত্যেকটির সাথে প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্যগত পার্থক্য চোখে ধরা পড়ে। যেটি সব থেকে ছোট টুকরো সেটি সব থেকে বড় টুকরোর ১/১০ ভাগ। সাধারণতঃ কাঠের টুকুরোগুলো যথাক্রমে লাল ও নীল রং-এর অর্থাৎ প্রথম টুকরোটি যদি লাল হয়, দ্বিতীয় টুকরোটি হবে নীল। এমনিভাবে শিশুকে বুঝিয়ে দিতে হবে সব থেকে যে টুকরোটি ছোট সেটি এককের কাজ করে, তার চেয়ে বড় টুকরোগুলো দুই থেকে দশ পর্য্যন্ত সংখ্যার প্রতীক। যেমন, যে টুকরোটি ৫ বোঝায় সেটি যথাক্রমে লাল ও নীল রং-এর ৫টি এককে ভাগ করা আছে।

উপস্থাপন—কোন মাদুরের বা কার্পেটের ওপর একে একে কাঠের টুকরো-গুলোকে ধীরে ধীরে রাখতে হবে। শিশুকে উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু বলবার প্রয়োজন নেই। একে একে প্রত্যেক টুকরোটির সাথে শিশুর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলতে হবে যে এইটি এক, অপরটি দুই ইত্যাদি। ফলে এক-একটি কাঠের টুকরোকে এক-একটি সংখ্যার নাম দিয়ে যখন বুঝিয়ে দেওয়া হবে তখন স্বরু হবে যোগ শেখাবার পালা। এই পদ্ধতিটিকে চিত্তাকর্ষক করতে হলে শিক্ষককে বিশেষ যত্নবান্ হতে হবে, শিশুর প্রয়োজনের দিকে বিশেষ সজাগ থাকতে হবে। কত ভাবে একটি সংখ্যাগঠন সম্ভব তাও শিশুর মনে জাগিয়ে তুলতে হবে এবং কাঠের টুকরোগুলো একের সাথে আর-একটি জুড়ে তা দেখিয়ে দেওয়া দরকার ; যেমন সাত—এইটি নানাভাবে গঠন করা যেতে পারে :—৬ + ১ = ৭, ৫ + ২ = ৭, ৪ + ৩ = ৭ কাঠের টুকরোগুলি এদিক ওদিক করে এই কাজটিকে খুব চিত্তাকর্ষক করে তোলা যায়।

শিশুর এক থেকে দশ পর্য্যন্ত প্রত্যেক সংখ্যার সহিত পরিচিতির পর তাকে কাঠের টুকরোগুলো দিতে হবে এবং কার্ডের ওপর লেখা ১ থেকে ১০ পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলো কাঠের টুকরোর নীচে নীচে রাখবার জন্য দিতে হবে। শিশু কাঠের টুকরোগুলো দৈর্ঘ্য অনুযায়ী সাজিয়ে যাবে এবং তার নীচে নীচে সংখ্যাগুলো রেখে যাবে। এইভাবে যখন এক থেকে দশ

পর্য্যন্ত সংখ্যার সঙ্গে শিশুর পরিচয় হয়ে যাবে তখন ১১ থেকে ২০ পর্য্যন্ত সংখ্যার সঙ্গে পরিচয় করা সুরু হবে। যেমন, শিশুকে যদি বলা যায় ১৩ সংখ্যাটি দিতে, তখন সে কি করে তা দিতে পারে প্রয়োজন হলে তা দেখিয়ে দিতে হবে। ১০ সংখ্যাটির প্রতীক যে কাঠের টুকরোটি আছে সেইটির সঙ্গে ২ সংখ্যাটির প্রতীক কাঠের টুকরোটি জোড়া লাগিয়ে শিশুকে দশের চেয়ে বড় সংখ্যাগঠনের পদ্ধতি বুঝিয়ে দিতে হবে।

অভিযোজন—শিশু যখন মোটামুটি সংখ্যাগুলির সঙ্গে পরিচিত হবে তখন তাকে তিনটি স্তরের প্রশ্নের মধ্য দিয়ে শিক্ষার পথে সহায়তা করতে হবে। যথন—

১। তুমি কি অমুক সংখ্যাটি তুলে নিতে পার ?

২। সংখ্যাটি কি ?

৩। সংখ্যাটিকে অন্য কি ভাবে বোঝানো যায় ?

প্রয়োজন হলে শিশুকে সহায়তা করতে হবে এবং ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে তার ভুল ভেঙ্গে দিতে হবে। অনেক সময় কাঠের টুকরো বা কার্ডবোর্ডগুলো দিয়ে সে তার খেয়াল মেটাবার চেষ্টা করবে, কিন্তু এসব ক্ষেত্রে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে নিরস্ত করতে হবে। বার বার কাঠের টুকরোগুলো মিশিয়ে দিয়ে শিশুকে নূতন কাজে উৎসাহিত করতে হবে ও কাজের মধ্যে যাতে আনন্দ ও আগ্রহ নিয়ে শিশু মগ্ন থাকতে পারে তার জন্যে সচেষ্ট হওয়া দরকার।

মন্তব্য—কাঠের টুকরোগুলোর দৈর্ঘ্যের তারতম্য এবং টুকরোগুলোর ওপর লাল-নীল রং-এর ভাগ শিশুকে নিজের ভুল-সংশোধনে সহায়তা করবে।

সংখ্যাগুলোর নামের সঙ্গে শিশু যখন পরিচিত হবে, তখন তাকে নামের সঙ্গে সংখ্যার পরিমাণগত অর্থের যোগাযোগ স্থাপনের জন্য আরও কয়েকটি অনুশীলনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

অনুশীলন (ক)

উপকরণ—শূন্য থেকে ৯ পর্য্যন্ত বোঝানোর জন্যে ১০ খানি কার্ড। এই কার্ডবোর্ডের ওপর লেখা সংখ্যাগুলো একটি বাক্সের ভিতর রাখা হয়। তারপর শিশুকে এই সংখ্যাগুলো হাতে তুলে নিতে উৎসাহ দেওয়া হয়। কার্ডবোর্ডের ওপর শিরিষ কাগজ দিয়ে প্রতিটি সংখ্যা লেখা থাকে।

উপস্থাপন—ডান হাতের আঙ্গুলগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে যাতে স্পর্শ-বোধ তীক্ষ্ণ হয়। টেবিল থেকে অন্যান্য সব জিনিষ সরিয়ে শিশুর ডান ধারে বসে বাঁ হাত দিয়ে এক-একটি সংখ্যা তুলে ধরতে হবে ও তাকে টেবিলের ওপর রেখে তার ওপর হাত বুলাতে হবে। হাত বুলানোর সময় শিশুকে জিজ্ঞাসা করতে হবে সেও সংখ্যাগুলোকে স্পর্শ দিয়ে অনুভব করতে চায় কি-না। তারপর নাম করে এক-একটি সংখ্যা শিশুকে দিতে বলতে হবে এবং সেইটিকে অনুভব করতে বলতে হবে। এইভাবে শিশুর সংখ্যা-পরিচিতি যাতে নিবিড় হয় সেজন্যে ধৈর্য্য ধরে অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তাকে প্রস্তুত করতে হবে।

অভিযোজন—শিশু যখন সংখ্যাগুলোকে নিয়ে টেবিলের ওপর রাখবে তখন লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সে সংখ্যাগুলো যেন সোজা করে টেবিলের ওপর রাখে, কারণ উল্টো করে রাখলে শিশুর ভ্রান্ত ধারণাই জন্মাবে। তাই খুব ধীরে ধীরেই এই কাজে এগুতে হবে ও শিশুকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

মন্তব্য—শিশু এই কাজে অনেক ভুল করলেও স্পর্শযোগ, অনুভূতি ও দৃষ্টি তার ভুল সংশোধন করতে সহায়তা করবে। সাধারণতঃ চার বছর থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে শিশুকে এই কাজ দেওয়া চলে।

অনুশীলন (খ)

উপকরণ—একটি বাক্সের দুইটি দিকের প্রত্যেকটি দিকের পাঁচটি করে ভাগ আছে। এক দিকে শূন্য থেকে চার ও অন্য দিকে পাঁচ থেকে নয়—'এই সংখ্যাগুলো পর পর আটা দিয়ে লাগানো আছে। এখন অনেকগুলো পেন্সিল বাক্সের একটি ধারে থাকে এবং শিশুকে বাক্সের খাপে তার সংখ্যা অনুযায়ী পেন্সিলগুলোকে ফেলতে বলা হয়। যেমন, এক নম্বরের খাপে একটি পেন্সিল, চার নম্বরের খাপে চারটি ইত্যাদি।

উপস্থাপন—প্রথমে শিশুকে প্রথম পাঁচটি বাক্সের খোপ ভর্তি করার জন্যে অনুরূপ সংখ্যার পেন্সিল দিয়ে দিতে হবে। তারপর পেন্সিলগুলোকে খোপের সংখ্যা অনুযায়ী যথাস্থানে রাখতে বলতে হবে, বিশেষ করে শূন্যের ঘরের দিকে শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে শূন্য বলতে কিছুই বোঝায় না। তাই শূন্যের ঘরে কোন পেন্সিলই ফেলা যায় না।

অভিযোজন—শূন্যের ঘরে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার পর শিশুকে অন্যান্য সংখ্যার দিকেও সচেতন করে জিজ্ঞাসা করতে হবে : 'এইটি কোন্ সংখ্যা, ঐটি কোন্ সংখ্যা ?'—ইত্যাদি। সে যদি ঠিকমত উত্তর দিতে না পারে তবে তাকে অন্য একটি সংখ্যাকে নিয়ে প্রশ্ন করতে হবে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা

পরিবেশ-পরিচিতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শিশুর দৃষ্টি ক্রমশঃ সজাগ করে তুলতে হবে, প্রকৃতির মাধ্যমে শিশু যাতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে পারে, অভিজ্ঞতা আহরণ করতে পারে, সেদিকে দৃষ্টির প্রয়োজন। এই প্রকৃতিবিজ্ঞান আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য হবে শিশুর ঔৎসুক্য পরিতৃপ্ত করা ও তার পর্যবেক্ষণ-শক্তির বিকাশের সহায়তা করা। কেবল তাই নয়, যাতে শিশুর পরীক্ষা করবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পরিপুষ্ট হতে পারে, যাতে মানবপ্রকৃতির মাঝে সম্পর্কনির্ণয়ের কথা তার মনে রেখাপাত ক'রে বিভিন্ন বস্তুর মাঝে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য শিশুর চোখে ধরা পড়ে, সেই দিকে দৃষ্টি রেখে শিশুকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শিক্ষা দিতে হবে। প্রকৃতির এলোমেলো রূপ ও জগতের বিচিত্র ঘটনার মধ্য থেকে একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলাই হবে এই শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

সাধারণতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিম্নস্তর থেকেই প্রকৃতিবিজ্ঞান আলোচনা স্থুরু হবে। কারণ শিশুর কাছে প্রকৃতি একজন বিশিষ্ট শিক্ষক।

পদ্ধতি

কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়া বোধহয় শিশুদের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। সঙ্গে সঙ্গে যাতে শিশু আনন্দ পায় সেজন্যে প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় রূপের দিকেও তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে হবে। বর্ষার কালো মেঘ কেমন করে পৃথিবী ভিজিয়ে দেয়, কেমন করে বৈশাখীর ঝড় সব কিছু আলোড়িত করে, শীতের সোনালী প্রাতে শিশির-ভেজা ঘাসে সূর্য্যের কিরণ কিভাবে প্রতিফলিত হয়, দিন-রাতের বিবর্ত্তন, ঋতুর যাওয়া-আসা এই সব কিছুই শিশুচিত্তে ভাবের তুফান তোলে, সঙ্গে সঙ্গে সে নিত্য নূতন তথ্যের সন্ধান পায়। নানা প্রশ্ন তার মনের কোণে এসে ভীড় করে এবং এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে সে

একটা বিজ্ঞানী মন গড়ে তোলে। প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার ও বিরাট রাজ্যই শিশুর কাছে পাঠ্য পুস্তকের স্থান অধিকার করে। কখন শ্যামল ক্ষেতে ধানের শীষে বাংলার রূপসুষমা অপরূপ হয়ে ওঠে, কখনও আবার কচি কচি ধান সোনার ফসলে রূপ নেয়—এই সব গাছের জীবনের ইতিহাস শিশু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে শিখবে। এইজন্যে শিশুকে বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে ফেলতে হবে, বিভিন্ন ব্যবসায়ের মানুষের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিতে হবে।

আগেই বলেছি যে, কাজের মধ্য দিয়েই যে, শিক্ষা তাই সব চেয়ে সার্থক হয়ে ওঠে। এইজন্যে নানা উপায় উদ্ভাবন করা দরকার যাতে শিশু চুপ করে বসে না থেকে আনন্দের সঙ্গে কাজ করতে থাকে। ফলফুলের বিভিন্ন নমুনা-সংগ্রহ, গৃহ বা বিদ্যালয় পরিবেশে জমির চাষ, বাগানের কাজ সব কিছুই শিশুকে করতে উৎসাহিত করা দরকার। এই প্রসঙ্গে কেঁচো, উই-এর ঢিবি, মাকড়সা, শামুক, প্রজাপতি শুয়োপোকা প্রভৃতি নানা রকম কীটপতঙ্গের জীবনযাত্রার দিকে শিশুর দৃষ্টিকে একে একে সজাগ করে তোলবার প্রয়োজন।

এমনিভাবে মাটি, ফল, ফসল, উদ্ভিদ্‌, কীটপতঙ্গ, আবহাওয়া ও প্রকৃতির নানা দিকের কথা শিশুকে বলতে হবে। জাগিয়ে দিতে হবে তার মনে অজানার প্রতি কৌতূহল। কতকগুলি প্রাকৃতিক ঘটনা শিশুর কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু হয়ে দাঁড়ায়; যেমন, সূর্য্যের পরিক্রমা, ঝড়বাদলের খেলা, তারা-ভরা আকাশ, চাঁদের হ্রাসবৃদ্ধি, আলো ও ছায়া—এই সব দিকে শিশুকে সহজেই আকৃষ্ট করা যায়।

ভ্রমণের মাধ্যমে যে প্রকৃতিপরিচয় ঘটে তা সব ক্ষেত্রেই খুব কার্য্যকরী হয়ে ওঠে। যখন ভ্রমণের সুযোগ খুবই অল্প বা যে সব ক্ষেত্রে ভ্রমণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-আহরণের পথে অসুবিধা আছে, সেখানে অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির জন্য ছবি, চার্ট ও নানারূপ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা সমীচীন। খেলার ছলে প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় অনেক সময়ে ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। যেমন বাড়ী থেকে বিদ্যালয়ে আসবার পথে যে যে জিনিষ সে দেখেছে যদি কান শিশু তার একটা তালিকা করে, তাহলে সে একসঙ্গে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা দুইই আহরণ করল। মোট কথা, শিশু নিজে যতই তথ্য আহরণ করবে, যতই আগ্রহ দেখাবে, ততই জ্ঞানরাজ্যের সন্ধান তার কাছে সুলভ হয়ে উঠবে।

সাহিত্য শিক্ষা

সাহিত্য সকলের কাছেই, বিশেষ করে শিশুর কাছে খুবই প্রিয়। কিন্তু যা হাল্কা সাহিত্য যেমন ছড়া, গল্প, তা শিশুকে বেশী আনন্দ দেয়। শিশু-মনে ভাবগাম্ভীর্য্য বা অত্যন্ত ব্যঞ্জনাপূর্ণ ভাষা বিশেষ রেখাপাত করতে পারে না। কারণ সেগুলো তাদের কাছে ভার হয়ে দাঁড়ায়। তাই ছন্দ ও ছড়া শৈশবের প্রাথমিক স্তরে বিশেষ উপভোগ্য হয়ে ওঠে। কোন বিশেষ অর্থ না থাকলেও অনেক ছড়া পড়ে শিশু আনন্দ পায়। গল্পের ক্ষেত্রেও রূপকথা, রাক্ষস-খোক্কসের গল্প ও এমনি আরও ছোটখাট হাল্কা ধরণের কথাবস্তু শিশুকে বিশেষ আনন্দ দেয়।

সাহিত্যের মাধ্যমে ভাষাশিক্ষা বর্ত্তমানে অনুমোদিত ও মনোবিজ্ঞান সম্মত। ভাষার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য শিশুর দৃষ্টিপথে আনতে হবে আনন্দের মধ্য দিয়ে, ব্যাকরণের জটিল বিষয়বস্তুর উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে নয়। আত্মপ্রকাশ, রসানুভূতি ও সাহিত্য-পরিচিতি এই তিনটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে শিশুকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে হবে, যাতে সহজ ও সরল ভাষায় শিশু ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করতে পারে, নিজের মনের কথা বলতে পারে, সেজন্যে তাকে উৎসাহিত করতে হবে। শৈশবের সীমাঘেরা অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে তারা ভালবাসে, তাই শিক্ষক যদি নানাভাবে শিশুর জড়তা কাটিয়ে দিতে ও আত্মপ্রত্যয় আনতে সহায়তা করেন তবে শিশুর সাহিত্যশিক্ষা পরিণামে সার্থক হয়ে ওঠে। ভাষা ও সাহিত্যশিক্ষা একসঙ্গে এগুতে থাকলে শিক্ষার কাজ সহজ হয়ে আসে, কিন্তু কি ভাবে একটা ধারা অবলম্বন করে শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন করা যায় তা চিন্তনীয়। সাধারণতঃ শৈশবেই বিভিন্ন স্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রথম স্তরে শিশুর আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। তার বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কল্পনাকে কেন্দ্র করে তার রুচি ও আগ্রহের মধ্য দিয়ে তাকে লিখতে ও পড়তে শেখাতে হবে; কিন্তু এ লেখাপড়া সুরু করার আগে বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণীতে বেশ কয়দিন ধরে শিশু-মনকে, নানা কাজ ও খেলার মধ্য দিয়ে ভাষা ও সাহিত্য-শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করে নিতে হবে। নানা রকম প্রশ্নের মধ্য দিয়ে তার আগ্রহকে সজীব করে তোলা প্রয়োজন। শিশুর স্বাভাবিক ঔৎসুক্যকে যদি ভিত্তি

করা যায়, তবে ক্রমশঃ তাকে বৃহত্তর গণ্ডিতে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর। যে কয়টি শব্দের সঙ্গে শিশুর পরিচয় তাকে কেন্দ্র করেই একটা ক্রম-অনুসারে নূতন নূতন শব্দের আমদানী করলে শিশুর পক্ষে তা আয়ত্ত করা সহজ হয়ে আসে।

প্রাথমিক স্তরে শিশুর এই আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা কিছুটা গড়ে উঠলে তাকে একে একে সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিয়ে আসতে হবে। গল্প বলা ও গল্প বলতে বলা এই দুইটি হবে এই স্তরের প্রধান শিক্ষারীতি। নানারকম গল্প অবলম্বন করে শিক্ষা চলতে পারে, যেমন রূপকথার গল্প, পৌরাণিক গল্প, মজার গল্প, নানারকম জন্তু-জানোয়ারের গল্প, পরীর গল্প ও দেশ-বিদেশের ছেলেমেয়েদের বিচিত্র গল্প। গল্প বলবার সময়ে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সেগুলি যেন তাদের উপযোগী হয় ও তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার আওতায় পড়ে। সেই সঙ্গে শেখা শব্দের সঙ্গে কিছু কিছু নতুন শব্দ যোজনা করে গল্পগুলোকে উপস্থাপিত করতে পারলে অপরিচিত শব্দগুলোও যেন পরিচিতের মত মনে হবে। তাদের অর্থবোধের জন্যে শিশুকে বেশী বেগ পেতে হবে না।

যেমন গদ্যের বা গদ্যসাহিত্যের মাঝে গল্প একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে, তেমনি সাহিত্যের অন্য দিকও আছে যেখানে ছড়া ও কবিতার প্রাধান্য। শিশুমনে ছন্দের প্রভাব সামান্য নয়; কারণ যা কিছু ছন্দোময়, যা কিছু সরস তাই শিশুমনে দোলা দেয়। প্রথম স্তরে ছড়া ও ধ্বনিমূলক কবিতা শিশুকে আবৃত্তি করে শোনালে সে তার প্রাণে একটা আনন্দের স্পর্শ অনুভব করে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, এই স্তরে ভাষার আঙ্গিকের দিকেই, ছন্দের বৈচিত্র্য ও শব্দের ঝঙ্কারের দিকেই শিশু বেশী সজাগ থাকে। অর্থবোধের চেয়ে এই দিকেই তার আকর্ষণ এই সময়েই স্বাভাবিক।

শিশুর মানসিক বিকাশে ছড়ার প্রয়োজনীয়তা বোধহয় স্বীকার করতেই হবে। কারণ বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে, বিভিন্ন রকমের ছড়া শিশু-মনের বিকাশের পথে বিভিন্ন উপাদান জুগিয়ে থাকে। ছড়াকে সাধারণতঃ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন ঘুমপাড়ানি ছড়া, চিত্রবহুল ছড়া, দেশভক্তি বা মাতৃস্নেহের পরিচায়ক ছড়া, প্রকৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত ছড়া, কোন খেলাকে কেন্দ্র করে রচিত ছড়া। প্রত্যেক রকম ছড়ারই শিশুর কাছে একটা বিশেষ স্থান আছে। কেউ ঝঙ্কারের মাধ্যমে অজ্ঞাতসারে শিশুমনে রসবোধ জন্মিয়ে দেয় ও

সাহিত্যিক মনের উন্মেষ করে; কেউ-বা শিশুর কল্পনাশক্তির বিকাশসাধনের সহায়তা করে। ছড়া-আবৃত্তির দ্বারা শিশুর আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, বাক্-শক্তি ও উচ্চারণের জড়তা কমে যায়, শিশুর শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি পায় ও কখনও কখনও চিত্রধর্মী ছড়ার সাহায্যে স্মৃতিশক্তির উন্মেষ হয়।

কয়েকটি ছড়ার উদাহরণ দিলে বিষয়বস্তু আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে ঃ

গল্প ও ছড়ার মাধ্যমে শিশুর সাহিত্যশিক্ষা যখন ক্রমপরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে তখন সাহিত্যের আর-একটি রূপের দিকে শিশুকে সচেতন করে তোলার প্রয়োজন। এ হচ্ছে নাটকের কথা। নাটক অভিনয় সাধারণতঃ শিশুদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়, কারণ নাটকের মাধ্যমে শিশুর আত্মপ্রকাশ খুবই সাবলীল হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া ক্রিয়াকেন্দ্রিকতাও ঐ আকর্ষণের অন্যতম কারণ। এই সময় রাজারাণীর অভিনয়, যুদ্ধ ও অনুরূপ কোন ক্রিয়াপ্রধান অভিনয় করতে শিশুরা ভালবাসে। এমন কি জন্তু-জানোয়ারদের সম্পর্কেও কোন গল্পকে কেন্দ্র করে কোন নাট্যাভিনয় করতেও শিশুরা গররাজী নয়।

নানাভাবে শিশুর মন পড়াশুনার জন্যে যখন প্রস্তুত হয়ে উঠবে তখন সুরু করতে হবে তার পড়বার আয়োজন। এতদিন পর্য্যন্ত তার জন্যে কোন নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যগ্রন্থের ব্যবস্থা ছিল না। এখন সমস্যা হলো কি ভাবে শিশুর গ্রন্থপরিচিতি পরিকল্পিত হওয়া উচিত। পরিচিত এবং সহজবোধ্য শব্দ দিয়েই এই পড়া সুরু করতে হবে এবং এমন বই শিশুর জন্য নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত যেখানে আছে ছবির প্রাচুর্য্য ও একটা সহজ থেকে কঠিনের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা। এই নির্দ্দিষ্ট ক্রম-অনুসারে শিশুর শব্দপরিচিতি ঘটলে তার পক্ষে তা আয়ত্ত করা সহজ হয়। এক সঙ্গে অনেক অপরিচিতি শব্দ শিশুর সামনে তুলে না ধরে কয়েকটি শব্দ নিয়েই পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে তার শিক্ষাকে সার্থক করে তোলবার চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষাপদ্ধতি আজ পাল্টে গেছে, তাই বাক্যদ্বারাই শিশুর পড়া সুরু হবে। শব্দগুলির সঙ্গে প্রথমতঃ শিশুর পরিচিতি হবে। পাঠের ক্রম-অনুসারে শব্দযোজনা থাকবে এবং বিচ্ছিন্ন বাক্য পাঠের মধ্যে না থাকাই বাঞ্ছনীয়। এই স্তরে শিক্ষার সার্থকতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে শিক্ষকের নৈপুণ্যের ওপর। শিশুর বর্ণশিক্ষা বোধহয় সবচেয়ে কঠিন। তাই বস্তু ও ক্রিয়ার সাথে অক্ষর শেখার কাজকে যুক্ত করতে পারলে শিশু আগ্রহ সহকারে এই কঠিন কাজে এগুতে পারে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা চলে যে, মাটি দিয়ে একটি 'আনারস' তৈরী

করে শিশুকে দিতে হবে, তার পর তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে সেটা কি ? যখন সে তার নাম বলবে তখন শিক্ষককে সেটা খড়ি দিয়ে শ্লেটের ওপর লিখে দিতে হবে। তারপর যখন বস্তুর সাথে নামের যোজনা করা হলো তখন তাকে বলা যায় 'আনারস আন'। শিশু আগ্রহ নিয়েই হয়তো সেই আনারসটি শিক্ষকের হাতে দিতে চাইবে। শিক্ষক তখন বলতে পারেন তিনি মুখে না বলে সেই কথাটি যদি লিখতে চান তবে তা কি রকম দেখাবে। তখন তিনি তা লিখে দেখাবেন ও লেখার মধ্যে যেসব অক্ষর আছে তাও বিশ্লেষণ করে শিশুর দৃষ্টিপথে আনবেন। ব্যঞ্জনবর্ণ ও স্বরবর্ণের বিশ্লেষণ করবার পর শিশুর দৃষ্টি পড়বে, বিশেষ করে 'আ'-কারটির ওপর। এইভাবে নিত্য নূতন উদাহরণ সৃষ্টি করে শিশুকে অক্ষরের সাথে পরিচিত করতে হবে।

শিশুর বর্ণপরিচয় বেশ সময়সাপেক্ষ। প্রথমে যে সব শব্দে স্বরবর্ণের বাহুল্য, সেই সব শব্দের সাথে শিশুর পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। একে একে স্বর থেকে ব্যঞ্জন ও ব্যঞ্জন থেকে যুক্তাক্ষরের দিকে শিশুর অভিযান স্থরু হবে। যতই সে বর্ণগুলোর সাথে পরিচিত হবে, ততই আনন্দের সাথে সেগুলো উচ্চারণ করে জোরে জোরে পড়বার আগ্রহ তার বাড়বে। সে যে পড়তে পারে একথা সকলকে জানিয়ে দিতে তার চেষ্টার কোন ক্রটি হবে না।

বর্ণপরিচিতির পর শিশুর যখন উচ্চারণ স্থরু হয় তখন তাকে উচ্চারণের শুদ্ধি-সম্পর্কে সজাগ থাকবার নির্দ্দেশ দিতে হবে। অনেক সময় জিহ্বার আড়ষ্ট ভাব ও শ্বাসপ্রশ্বাসের অস্থবিধা উচ্চারণের বিকৃতি ঘটায়। এই সব ক্ষেত্রে চিকিৎসকের সহায়তা নিয়ে শিক্ষককে সমস্যাসমাধানের পথ খুঁজতে হয়।

বোধের পথে আবৃত্তির স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাই ছেলেবেলা থেকেই শিশুদের আবৃত্তি যাতে স্থন্দর ও সার্থক হয়ে ওঠে, যাতে অনুভূতি নিয়ে ছন্দ বজায় রেখে আবেগের সাথে তারা কোন কিছু আবৃত্তি করতে পারে, শিক্ষক দৃষ্টান্ত দিয়ে শিশুকে তা শিক্ষা দেবেন।

প্রথমে ছন্দের দিকে দৃষ্টি দিয়ে শিশুরা কোন কিছু আবৃত্তি করবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে, কিন্তু একে একে বিষয়বস্তু ও ভাবের দিকটি তাদের চেতনায় ধরা দেয় ও সেই অনুযায়ী আবৃত্তিও নিয়ন্ত্রিত হয়। বেশ খানিকক্ষণ শিশুর আবৃত্তি চলতে থাকলে সে ক্রমশঃ বিষয় বস্তুর দিকে সচেতন হয়। এই চেতনাকে আরও স্পষ্ট করে তুলতে হলে শিক্ষককে প্রশ্নোত্তরের অবতারণা করতে হবে। কিছুক্ষণ

আবৃত্তির পর প্রশ্ন করে বুঝতে হবে শিশু কতদূর বিষয়বস্তু উপলব্ধি করেছে। যদি পাঠের মধ্যে বিশেষ কঠিন শব্দ শিশুর বোধের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে, তবে শব্দগুলোর অর্থ নানা উদাহরণের মধ্য দিয়ে শিশুর সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরার দায়িত্ব শিক্ষকের। বিষয়বস্তুর সাথে পরিচিত হবার পর রসবোধের দিকে সম্ভব-স্থলে শিশুকে সজাগ করে দিতে হবে। এজন্যে শিক্ষকের কৌশলজ্ঞান ও সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শৈশবের প্রথম স্তরে হয়তো 'হারবার্টের' পদ্ধতি পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করা উচিত হবে না, কিন্তু মোটামুটি তাকে লক্ষ্য করে পদ্ধতির পরিবর্তন করা বাঞ্ছনীয় হবে। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রকার পাঠের বিবরণ উল্লেখযোগ্য :—

১। চর্বণা (critical appreciation);
২। স্বাদনা (appreciation);
৩। বোধ (comprehension).

সঙ্গীত

শিক্ষায় সঙ্গীতের প্রভাবসম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই বুনিয়াদি শিক্ষা-পদ্ধতিতেও সঙ্গীত একটি বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে। যা ছন্দহীন তাকে ছন্দময় করে তোলা সঙ্গীতের পক্ষেই সম্ভবপর। সঙ্গীতকে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় :—

ভজন বা ধর্ম্মসঙ্গীত ;
জাতীয় সঙ্গীত ;
ঋতু-সঙ্গীত ;
কর্ম্মসঙ্গীত ;
হাসি ও আনন্দের গান।

সঙ্গীতের সাহায্যে বিদ্যালয়ের সাধারণ কর্ম্মসূচীতে বৈচিত্র্য আসে। আনন্দময় হয়ে ওঠে তাদের গতানুগতিক জীবন। সঙ্গীতের স্পর্শে শুধু তাই নয়, একটি মার্জ্জিত রুচিগঠনে ও আত্মার সুসমঞ্জস বিকাশে সঙ্গীতের অবদান অসামান্য। জীবনের যেদিক রমণীয় ও কমনীয় সেই দিকে শিশুর চলচপল চিত্ত আকৃষ্ট হতে থাকে। কর্ম্মে আনন্দ বৃদ্ধি পায়, ছন্দের দোলা লেগে।

সঙ্গীতশিক্ষার বিভিন্ন স্তর আছে : প্রথম শৈশবেই সমবেত সঙ্গীত,

হাসি ও আনন্দের গান, প্রাকৃতিক সঙ্গীত বা লোকসঙ্গীত বিশেষ উপযোগী। সঙ্গীতের সুর, যাতে এই স্তরে বিশেষ স্বরবৈচিত্র্য দাবী না করে সেদিকেও লক্ষ্য রাখবার প্রয়োজন। অনেক সময় সমবেত সঙ্গীতেও দেখা যায় কয়েকটি ছাত্রছাত্রী সঙ্গীতে যোগ না নিয়ে অন্যমনস্কভাবে অন্য কাজে লিপ্ত হয়ে আছে। তাদের যাতে আগ্রহ ও আনন্দ বেড়ে ওঠে, যাতে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে তারা সঙ্গীতে যোগ দেয়, এজন্য শিক্ষক সকলকে উৎসাহিত করবেন। যদি কারও কণ্ঠস্বরে কোন সামঞ্জস্যের অভাব ঘটে, তাহলে সেখানেও শিক্ষকের উৎসাহ বিশেষ কার্যকরী হয়। সব শিশুই গায়ক হতে পারে না, তবে সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ নির্ভর করে শিক্ষকের প্রয়াসের ওপর। শিশু যাতে শিক্ষকের সাহায্য না নিয়েই নিজেই সঙ্গীতচর্চ্চা করতে অভ্যস্ত হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় যে, বাদ্যযন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে শিশুরা গান গাইতে পারে না। এজন্যে এই অভ্যাস থেকে শিশু যাতে মুক্ত হতে পারে প্রথম থেকেই সেদিকে নজর রাখতে হবে। মোট কথা, চারুকলার ক্ষেত্রে সঙ্গীতের প্রভাব যে অসামান্য সেদিকে শিশুর দৃষ্টি সজাগ করে দিয়ে জীবনে তার সার্থকতার কথা জানিয়ে দিতে হবে। দুঃখ ও সংগ্রামের মাঝে সঙ্গীত যে শান্তির প্রলেপ বহন করে আনে, নৈরাশ্যের আঁধারে আশার আলো জ্বালিয়ে দেয়, একথা শিশু একবার বুঝতে পারলে স্বভাবতঃই সে সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হবে।

নীতিশিক্ষা

ভারতবর্ষ অধ্যাত্মবিদ্যার লীলাভূমি। তাই যারা ভারতের সন্তান তাদের নৈতিক আদর্শ যাতে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে আকর্ষণ করতে পারে, সেদিকে শিক্ষকের বিশেষ সজাগ হবার প্রয়োজন। কেবল উপদেশ-নির্দ্দেশের দ্বারাই নয়, ব্যক্তিগত চরিত্রের মাধ্যমে তাদের নীতিবোধকে জাগিয়ে তুলতে হবে। উপযুক্ত পরিবেশ রচনা এই কাজে বিশেষ সহায়তা করতে পারে। মাঝে মাঝে আলোচনাসভা, প্রার্থনাসভা বা অনুরূপ কোন সম্মিলনী এই নীতিবোধের উন্মেষের পথে বিশেষ সহায়ক। সাধারণতঃ এই নীতি হবে ধর্ম্মনিরপেক্ষ ও মানবিকতার ওপর নির্ভরশীল। তাই এখানে গোঁড়ামির কোন ঠাঁই নেই। যা সত্য ও সুন্দর, যা কল্যাণময় তাকে কেন্দ্র করেই এই নৈতিক আদর্শ শিশুমনে সঞ্চারিত করতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিশুদরদী শিক্ষাবিদ্‌ ও তাঁদের অবদান

ফ্রয়েবেলের কিণ্ডারগার্ডেন পদ্ধতি

শিক্ষাজগতে যে সব মনীষীসাধকের আবির্ভাব ঘটেছে তাদের মধ্যে ফ্রয়েবেলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জার্ম্মানীর এক পার্ব্বত্য অঞ্চলে এক নিভৃত পল্লীতে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তার পর থেকে তাঁর জীবন নানা দুঃখের মধ্যে অতিবাহিত হয়। অল্পবয়সে মাকে হারিয়ে স্নেহকাঙাল ফ্রয়েবেলের দিন কাটতে থাকে প্রকৃতির স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে। শৈশবের নিঃসঙ্গ জীবন তাঁকে দিয়েছিল সাধনার সুযোগ। বেশী দূর পড়বার সুযোগ না ঘটলেও তাঁর প্রতিভাকে বিকাশের পথে ক্রমশঃ স্ফুরিত হতে দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন। নিজে স্নেহবঞ্চিত ছিলেন বলেই হয়তো শিশুর প্রতি তাঁর সব দরদ উপছে পড়েছিল। শিশুকে কেন্দ্র করেই তাই সুরু হল তাঁর সাধনা। গতানুগতিক শিক্ষার মধ্যে শিশু যে উপেক্ষিত অবজ্ঞাত, একথা ফ্রয়েবেল বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন। তিনি শিক্ষার কয়েকটি মূল সূত্র আবিষ্কার করে দিকে দিকে তার প্রচারের ব্যবস্থা খুঁজতে লাগলেন। প্রথমে তাঁর শিক্ষানীতি বহু সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল সত্য, কিন্তু তাঁর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মনস্বিতা ক্রমশঃ স্বীকৃতি লাভ করল। 'পেষ্টালৎসি'ই ছিলেন ফ্রয়েবেলের শিক্ষাগুরু। তাই তাঁর অসমাপ্ত কাজকে পূর্ণতা দেওয়াই ছিল তাঁর ব্রত। তাঁর গুরুর শিক্ষানীতির মধ্যে যা কিছু অস্পষ্ট ছিল তাকে স্পষ্টভাবে রূপ দিলেন ফ্রয়েবেল।

শিশুপ্রকৃতি যে মানবপ্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয় এই সিদ্ধান্তে তিনি প্রথমে উপনীত হন। তাই তিনি শিশুশিক্ষার প্রথম স্তরে মাতার স্নেহপূর্ণ পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট করে অনুভব করলেন। মানুষের মনের সঙ্গে বাইরের প্রকৃতির যে একটা আত্মীয়তা আছে, তারা যে একই নিয়ম অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত, ফ্রয়েবেলের সাধনা এই সত্য উদ্ঘাটন করল।

শিশুকে শিক্ষার চাপ থেকে মুক্তি দেবার জন্য তিনি যে নূতন ধরণের বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, তিনি তাঁর নাম দেন কিণ্ডারগার্ডেন অর্থাৎ শিশু-উদ্যান। শিশুকে চারাগাছের সঙ্গে এবং শিশুকে বাগানের মালীর সাথে তুলনা করে তাঁর

এই শিশু-উদ্যানের পরিকল্পনা। তাই শিশুর মাঝে যে সব শক্তি লুকিয়ে আছে তাকে প্রকাশিত করে তোলার দায়িত্ব শিক্ষকের। মালী যেমন কখনও জল সিঞ্চন করে, কখনও-বা তাকে কীটপতঙ্গ থেকে রক্ষা করে ও কিশলয়কে পর্ণে পরিণত করবার স্বপ্ন দেখে, তেমনি শিক্ষক স্নেহরসসিঞ্চনে শিশুকে ধন্য করে জ্ঞানের আলোকের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

শিক্ষাকে ফ্রয়েবেল সমগ্র বিশ্ব ও জীবনের বিকাশের ধারার সাথে যুক্ত করে দেখেছেন। মানুষের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও দেহের বিভিন্ন প্রকাশ তাঁর মতে একই সূত্রে গ্রথিত। ফ্রয়েবেলের এই সমগ্র দৃষ্টি এক নূতন সঙ্কেত বহন করে এনেছে যে সঙ্কেত ব্যক্তিত্ববিকাশের সঙ্কেত, যাতে মানুষের সমস্ত শক্তি, ইচ্ছা, অনুভূতি একই সঙ্গে পরিণতি লাভ করতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই ঐকতানের সন্ধান পেয়েছিল মহামতি ফ্রয়েবেল।

একটি ঐচ্ছিকশক্তি যে সমগ্র বিশ্বজগতে প্রতিফলিত এই ধারণাই তাঁর বদ্ধমূল হয়েছিল। তাই যে শক্তি নিখিল সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশিত তার ক্রমবিকাশের কথা বুঝতে হলে বুঝতে হবে এই জীবনদর্পণের কথা। কোন এক অলক্ষ্য শক্তির তাড়নায় বীজের আবরণ বিদীর্ণ করে দেখা দেয় সবুজ অঙ্কুর। সেই অঙ্কুর একে একে ফলে ফুলে বিকশিত হয়ে ওঠে। এই যে অন্তরের তাগিদ এই সম্পর্কেই ফ্রয়েবেল অলক্ষ্যে ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাই সেই শক্তিকে জোর করে বিকশিত করা যায় না, তার বিকাশ স্বতঃস্ফূর্ত। তাই শিক্ষাও হবে ফ্রয়েবেলের মতে স্বতঃস্ফূর্ত। শিশুচিত্তের ধর্ম্ম ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। যাতে স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিশু তার চারি পাশের জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৃহৎ ঐক্যবন্ধনে ধরা দিতে পারে, সেই দিকেই দৃষ্টি রেখে শিশুশিক্ষা পরিকল্পিত হওয়া উচিত।

শিশুর মন হল সৃষ্টিধর্ম্মী। সে চায় নূতন সৃষ্টি করতে। তাই ক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর যে শিক্ষা তার বিকাশ ও পরিণতির পক্ষে যে অনেক বেশী উপযোগী একথা ফ্রয়েবেল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন।

প্রকৃতির সঙ্গে শিশুর প্রত্যক্ষ পরিচয় করিয়ে দেওয়া শিক্ষকের আর-একটি কাজ, কারণ ফ্রয়েবেলের মতে গাছপালা, পাথর, ধাতু, সব কিছুর মধ্যেই সৃষ্টির ঐকতান ধ্বনিত। প্রকৃতি ভগবানের সৃষ্টি, ভগবানের প্রকাশ।

ফ্রয়েবেলের প্রবর্ত্তিত শিক্ষানীতি

ফ্রেয়েবেল শিক্ষাক্ষেত্রে যে যুগান্তর এনেছেন একথা আজ স্বীকৃত। কিন্তু তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষানীতি যে তাঁর একান্ত নিজস্ব ও মৌলিক, একথা তিনি নিজেও দাবী করেন নি। বরঞ্চ মুক্তকণ্ঠে তিনি তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিক ও শিক্ষাগুরুদের কাছ থেকে ঋণ স্বীকার করেছেন। যে সব দার্শনিক মতবাদ তাঁর শিক্ষা-নীতিকে প্রভাবিত করেছে তার মধ্যে ফিক্‌টে, শিলার ও বিশেষ করে হেগেল-এর কথা উল্লেখযোগ্য। সকলের কাছ থেকেই তিনি তাঁর তথ্য আহরণ করেছেন এবং এক পরম সত্যের সন্ধান পেয়েছেন। সেই সত্যকেই কেন্দ্র করে তাঁর এই শিক্ষানীতি গড়ে উঠেছে। এই নীতি বিশ্লেষণ করলে তাকে নিম্নলিখিত সূত্রে প্রকাশ করা যায় :—

(ক) শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রমবিকাশের নীতি—প্রাচীন গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে ফ্রয়েবেল তাঁর সুস্পষ্ট মতবাদ জানিয়েছেন ও বলেছেন যে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষাকে ঘিরে যদি ক্রমশঃ তাকে বিকাশের পথে এগিয়ে দেওয়া যায় তবে সে আনন্দের সঙ্গেই শিক্ষালাভ করবে। ফুল যেমন ধীরে ধীরে দল মেলতে থাকে তেমনি শিশুর চিত্তশতদলও জ্ঞানের আলোক পেলে আপনা থেকেই উন্মোচিত হবে। নিজেই সে বিপুল আগ্রহ নিয়ে নতুন বিষয় আয়ত্ত করবে। শিশুর প্রতি এই আস্থা পূর্ব্ববর্ত্তী শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে মকই ছিল।

(খ) শিক্ষাক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূরণ বা স্বতঃস্ফূর্ত্ত ক্রিয়ার নীতি—ফ্রয়েবেলের অন্যতম অবদান। শিক্ষা হবে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও আনন্দময়। মানুষের অন্তরের যে ঔৎসুক্য লুকিয়ে আছে তাকে জাগাতে পারলে শিক্ষা স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে ওঠে। এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত আগ্রহের পথে নির্দ্দিষ্ট দিকে শিশুর সমগ্র সত্তার বিকাশ মূর্ত্ত করে তোলাই হবে শিক্ষকের প্রধান কাজ। নূতন সৃষ্টির উন্মাদনা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নিহিত। সে নিজে যা সৃষ্টি করে তার মধ্যেই সে আপন সত্তাকে খুঁজে পায়। এটা জীবনের ধর্ম্ম। তাই শিক্ষার্থীও এই ধর্ম্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। তাকেও এরই সাথে সুর মিলিয়ে চলতে হবে।

যে জ্ঞান শিশু বাহির বিশ্ব থেকে আহরণ করল তার যেমন মূল্য আছে, তার চেয়ে বেশী মূল্য সে কিভাবে নিজেকে প্রকাশ করল, নিজে কি সৃষ্টি করল।

প্রকৃতির সাথে প্রত্যক পরিচয়ের ফলে তার অভিজ্ঞতার ডালি তিলে তিলে পূর্ণ হতে থাকে। একে একে স্বষ্টির মাঝে নিজের স্থানটি কোথায় সে বুঝতে পারে, তারও যে স্বষ্টির দায়িত্ব আছে একথা যখন সে অনুভব করে তখন সে বিশেষ আনন্দ পায়। ফ্রয়েবেল শিশুর অন্তরের এই রহস্যটিকে উদ্ঘাটিত করেছেন।

(গ) **শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতীকের ব্যবহার**—শিশুমন সহজেই ভগবানের স্বষ্টির-বৈচিত্র্যের দিকে আকৃষ্ট হয়। সে যা দেখে তা থেকে তথ্য নিয়ে কল্পনার রং মিশিয়ে সে তার নিজের একটি জগৎ স্বষ্টি করতে চায়। শিশুর জগৎ কল্পনার জগৎ, তার মাঝে সে নিজেকে স্রষ্টার আসনে বসিয়ে লীলা করতে চায়। কখনও সে ছোটখাট ইট-কাঠের টুকরোকে এক একটি বিশেষ সামগ্রী বলে ভেবে নেয় এবং তারই কল্পনা অনুযায়ী তা দিয়ে আপন মনে খেলা করে। কখনও হয়তে একটি কাঠের টুকরো তার কাছে গাড়ীর রূপ নিয়ে আসে, কখনও মাটির ঢেলা দেখা দেয় সজীব প্রাণ নিয়ে। এমনি করে প্রতীকের মধ্য দিয়ে সে আত্মতৃপ্তি পেতে চেষ্টা করে। স্বষ্টির ইতিহাসকে শিশু শ্রদ্ধা করে, তাই শিশুমনের এই ইঙ্গিতের প্রতি শ্রদ্ধাকে ফ্রয়েবেল শিক্ষাক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন নানা খেলার উপকরণের মাধ্যমে।

ফ্রয়েবেলের এই উপকরণের মধ্যে যে-তিনটি সামগ্রী বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তার মধ্যে একটি গোলক (Sphere), একটি ঘনক্ষেত্র (Cube) ও একটি নলাকৃতির (Cylinder) নাম করা যেতে পারে।

(ঘ) **এইগুলিকে ফ্রয়েবেল প্রবর্ত্তিত Gifts বলা হয়।** শিশুর জন্যে তাঁর এই উপহারের মূল্য শিক্ষাক্ষেত্রে স্বীকৃত হয়েছে। এই উপহারগুলি শিশুর কাছে নিতান্ত প্রিয়, কিন্তু এদের ব্যবহার যথেচ্ছ নয়। এক একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে এক একটি উপহারকে ফ্রয়েবেল শিশুর হাতে তুলে দিয়েছেন।

'গোলক' তাঁর প্রথম উপহার এবং শিশুরা নানা বর্ণের নানা রঙের গোলক তৈরী করে খেলা করে। একে একে তাদের মনে আকার, বর্ণ, উপাদান, গতি, দিক সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয় ও তাদের নিয়ে নাড়াচাড়ার ফলে পেশীর সঞ্চালন হয়। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ফ্রয়েবেলের প্রত্যেকটি উপহারের একটি বিশেষ তাৎপর্য্য আছে।

(ঙ) **শিক্ষাক্ষেত্রে হাতের কাজের প্রবর্ত্তন**—শিশু ফ্রয়েবেলের উপহারকে নেড়েচেড়ে যে অভিজ্ঞতা আহরণ করল, তাকে হাতের কাজের মধ্যে

প্রয়োগ করার জন্যে তিনি বিশেষ নির্দ্দেশ দিয়েছেন। ধারণাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার মধ্যে আছে শিক্ষার সার্থকতা, তাই তিনি কাদা, বালি, কাঠ, কাঠের গুঁড়া প্রভৃতি দিয়ে নানা রকম জিনিষ গড়ে তোলবার জন্যে শিশুকে নির্দ্দেশ দিয়েছেন। কখনও কাগজের কাজ, কখনও মাদুর-বোনা, কখনও বাগান-তৈরী, কখনও বা ছোটখাট ঘরবাড়ী-তৈরীর কাজও কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতির বিশেষ অঙ্গ।

ফ্রয়েবেলের মতে শিশু কর্মী—তাই সে কোন না কোন কাজ করতে ভালবাসে এবং নানা কাজের ও খেলার ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশের সুযোগ নেয়।

শিশু প্রকৃতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করে ফ্রয়েবেল তাঁর শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেছেন, যেমন :—

১। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই শিশু নানা বিষয়ে জ্ঞান সংগ্রহ করে।

২। প্রকৃতির সাথে মিতালি পাতিয়ে শিশু থাকতে চায়।

৩। শিশুমন সৃষ্টিপ্রবণ, তাই প্রত্যেক জিনিষই সে হাতেকলমে পরীক্ষা করতে ভালবাসে। ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে সে নূতন কিছু উদ্ভাবন করতে চায়।

৪। অনুকরণপ্রবৃত্তি শিশুর মধ্যে খুব প্রবল, তাই যা কিছু সে দেখে, শোনে, তার পুনরাবৃত্তি করে সে এই অনুকরণপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চায়।

৫। শিশুর সঙ্গপ্রিয়, সমবয়স্কদের সাথে খেলাধূলা ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা তাই একান্ত বাঞ্ছনীয়।

৬। গল্প, গান, শিশুর কাছে বিশেষ প্রিয়। তার মন যে কল্পনাপ্রবণ ও সুন্দরের পূজারী।

৭। শিশু স্বাধীনতা ও আত্মপ্রকাশের জন্যে বিশেষ আকুল। সে স্বাধীন ভাবেই কাজ করতে চায়, তাই শিক্ষককে নেপথ্যে থাকতে হবে দরদী বন্ধু হিসাবে, নির্দ্দেশক হিসাবে নয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে ফ্রয়েবেল যে কয়টি মূলনীতির কথা উল্লেখ করেছেন তাকে ভিত্তি করে তিনি শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করেছেন। লেখা, পড়া ও গণনা শিক্ষা দিতে হলে কিভাবে শিক্ষককে এই কাজে অগ্রসর হতে হবে তা স্পষ্টভাবেই নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। যদিও খেলাধূলা ও সৃজনমূলক ভিন্ন ভিন্ন কাজের মাধ্যমে ফ্রয়েবেল শিক্ষাব্যবস্থাকে নির্দিষ্ট করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে বাস্তব জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি নেই।

যেমন **প্রকৃতিপাঠ** ফ্রয়েবেলেরই প্রবর্তিত। পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে শিশুরা যে জ্ঞান আহরণ করে তা জীবনযাত্রার পথে যে বিশেষ সহায়ক হয় একথা শিশুদরদী ফ্রয়েবেল উপলব্ধি করেছিলেন ; তাই প্রকৃতিপাঠ ও বস্তুপাঠ তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি বিশেষ অঙ্গ।

নৈতিক শিক্ষাদান—ধর্ম্মের ভিত্তিতে শিশুগণকে নীতিশিক্ষা দেবার পক্ষপাতী ছিলেন বলে ফ্রয়েবেল বিদ্যালয়ে কাজ সুরু হবার আগেই কোন সমবেত প্রার্থনা বা ঈশ্বরের বন্দনার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছেন ও সেই অনুযায়ী নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এছাড়াও মহাপুরুষদের জীবনী-আলোচনা বিদ্যালয় জীবনে বিশেষ সার্থক বলে তিনি মনে করেন।

পঠন-শিক্ষাদান—ইন্দ্রিয়গুলির পরিপোষণের পর একে একে বর্ণমালার সাথে পরিচিতি করিয়ে দেবার প্রয়োজন কিন্তু ফ্রয়েবেলের প্রবর্ত্তিত পন্থা একেবারেই স্বতন্ত্র। তিনি গতানুগতিকভাবে অক্ষরগুলির সাথে পরিচয় করিয়ে না দিয়ে ছবির সাহায্যে এই বর্ণপরিচয়ের এক নূতন পন্থা উদ্ভাবন করেছেন। ছবিরনীচে জিনিষের বা প্রাণীর নামের প্রথম অক্ষর উজ্জ্বল রঙে লিখে দেওয়া হয় এবং অক্ষরগুলিকে ছবির নাম হিসাবে ব্যবহার করে বার বার তা উচ্চারণ করতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এইভাবে কয়েকটি বর্ণ শেখা হলে তাদের সাহায্যে শিক্ষক এক একটি শব্দ গঠন করে বোর্ডের ওপর তা লিখে দেন। কয়েকটি বর্ণের সাহায্যে যে বিভিন্ন শব্দ গঠন করা যায় শিক্ষক তা বুঝিয়ে দেবেন। এর পর বিভিন্ন শব্দই যে বাক্যের উপাদান, সে বিষয়ে শিক্ষক প্রয়োগের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। এইভাবে বর্ণ থেকে শব্দে ও শব্দ থেকে বাক্যে শিশুর দৃষ্টি প্রসারিত হবে এবং একে একে তারা নিজেরা শব্দ ও বাক্য-গঠনের চেষ্টা করবে। কেবল তাই নয়, বর্ণ ও পদগুলি দেখে দেখে শিশুরা পড়তেও চেষ্টা করবে এবং পঠনের অভ্যাস গঠন করবে।

লিখন—ফ্রয়েবেলের প্রবর্ত্তিত লিখনপদ্ধতির মধ্যেও বৈশিষ্ট্য আছে। সরাসরি কোনঅক্ষরকে লিখতে না বলে প্রথমে শিশুকে কাঠি বা বিচির সাহায্যে অক্ষর তৈরী করতে দেওয়া হয় এবং তারপর সাজান অক্ষর দেখে ও শিক্ষকের লেখা অনুকরণ করে শিশুকেই শ্লেটে অক্ষরগুলি লিখতে দেওয়া হয়।

গণনা—পড়া ও লেখা শেখার সঙ্গে সঙ্গে যাতে সংখ্যাসম্পর্কে শিশুর বোধ জন্মায় সেদিকেও ফ্রয়েবেল উপায় উদ্ভাবন করেছেন। কতকগুলি জিনিষ ও প্রাণীর নাম ও সংখ্যা উল্লেখ করে গল্প বলা হয় এবং একে একে এই সংখ্যার বোধকে জাগিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়। তারপর নানা খেলার মধ্য দিয়ে কাঠি, বিচি বা অনুরূপ কোন উপকরণের সাহায্যে এক থেকে একশো পর্য্যন্ত গণনা, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। পরে এই কাঠি বা বিচিগুলি সাজিয়ে সংখ্যা বা অক্ষর তৈরী করতেও শিশুকে উৎসাহিত করা হয়। মোটকথা, ফ্রয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতি হল কর্ম্মকেন্দ্রিক ও শিশুকেন্দ্রিক। তিনি হাতের কাজের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বুদ্ধির বিকাশের দিকে সজাগ, তেমনি হৃদয়ের অনুভূতি ও রুচি এবং কৃষ্টির দিকেও তাঁর লক্ষ্য আছে। তাই তাঁর প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে খেলাধূলারও যেমন স্থান আছে, তেমনি স্থান আছে গীত, নৃত্য, অভিনয় ও সৃজন-মূলক কর্ম্মের।

শিক্ষাক্ষেত্রে ফ্রয়েবেলের প্রভাব

ফ্রয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতি এককালে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং অনেক বিদ্যালয়েই তাঁর প্রবর্ত্তিত Gift এবং Occupation-এর সমাদর হয়। কিন্তু এই Gifts বা শিক্ষার উপকরণকেই ফ্রয়েবেলের একমাত্র অবদান বলা চলে না। শিক্ষার মধ্যে যে স্বাধীনতা ও স্বতঃস্ফূর্ত্তির প্রয়োজন তা উপলব্ধি করে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথমে তা প্রবর্ত্তনের নির্দ্দেশ দেন এই মনীষী। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে স্নেহপ্রীতির বন্ধনকে সুদৃঢ় করবার পথ প্রশস্ত করবার জন্যে তিনি শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে সব সময়েই শিশুর প্রয়োজনের প্রতি সজাগ হবার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এই দিক থেকে ফ্রয়েবেলের দান অসামান্য।

মন্তেসরী পদ্ধতি

মেরিয়া মন্তেসরীর জীবন বৈচিত্র্যময়। ইনি ইতালীর একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন এবং এই সময়ে ক্ষীণমেধা শিশুদের বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশসম্পর্কে তাঁর গবেষণার সুযোগ জোটে। পরে সেই গবেষণা সার্থক হ'য়ে উঠল এবং ক্ষীণমেধাদের সাহায্যের জন্যে তিনি

যে নীতির নির্দ্দেশ দিলেন তা সাধারণ শিশুদের প্রকৃষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা বলে বিবেচিত হল।

তিনি শিশুনিকেতন গড়ে তুললেন তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে।

মন্তেসরী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

(ক) **শিশুর প্রতি শ্রদ্ধা**—শিশুর মর্য্যাদাবোধ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি মন্তেসরী পদ্ধতির বিশেষত্ব। তাঁর মতে শিশু যা স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে করতে চায় তার ওপর বিশ্বাস রেখে শিশু-পরিচালনাই বাঞ্ছনীয়। যাতে শিশুর সু-অভ্যাস গঠন স্বাধীন কাজের মাধ্যমে সম্ভবপর হয় সেদিকেও মন্তেসরীর লক্ষ্য ছিল। শিশুর স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও স্বেচ্ছাচারিতাকে তিনি কোন দিন প্রশ্রয় দিতে চান নি।

(খ) **শিশুর প্রচেষ্টা ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত শিক্ষালাভের প্রতি বিশ্বাস**—পরিবেশ-রচনাই এই পদ্ধতির মূল কথা। শিশুর জন্যে অনুকূল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিবেশ রচনা করতে পারলেই শিশু আপনা থেকেই কাজ করবার অনুপ্রেরণা পায়। তাই আয়োজনের মাধ্যমে যাতে শিশু শিখতে পারে সেরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন।

শিশু আপন মনে কাজ করবে এবং পরিচালিকা কেবল পিছন থেকে তা লক্ষ্য করবেন ও প্রয়োজনস্থলে শিশুর তত্ত্বাবধান করবেন। যাতে শিশুর শিক্ষা এই-ভাবে সহজ হয়, সেজন্য তিনি কয়েকটি খেলনার প্রবর্ত্তন করেন। মন্তেসরী একে স্বয়ংশিক্ষা বলেছেন। এগুলির কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এই সব কাজে শিক্ষকের বা পরিচালকের হস্তক্ষেপের কোন অবকাশই থাকবে না। যতদূর সম্ভব পরিচালিকা কাজ পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবেন। যে যে উপকরণ এই শিক্ষার কাজে সহায়তা করে সেগুলি এমনভাবে প্রস্তুত যে কোন ভুলত্রুটি হলে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শিশু নিজেই তা বুঝতে পারবে। এই সব উপকরণের বিবরণ পরে দেওয়া হয়েছে।

(গ) **জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিশুর শিক্ষালাভের সুযোগ**—স্বাধীনভাবে ইন্দ্রিয়-পরিচালনার সাহায্যে শিশু যে অভিজ্ঞতা আহরণ করে সেগুলি শিশুর জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে তীক্ষ্ণ ও সতেজ করে। ফলে শিশুর স্বয়ংশিক্ষা সার্থক হয়। এই স্বয়ংশিক্ষার মধ্যেই সে যথেষ্ট পরিমাণে আনন্দ ও প্রেরণা

পায়। কখনও নিজেকে কর্ম্মের মধ্যে তন্ময় রেখে, কখনও সংযত ও সুষ্ঠু ক্রিয়ার সাহায্যে শিশু যাতে জ্ঞানের পথে ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে পারে মন্তেসরী সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রেখেছেন।

(ঘ) **শিশুর ব্যক্তিগত রুচি ও শক্তি অনুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা**—অল্প বয়সেই একসঙ্গে অথচ ব্যক্তিগতভাবে শিশুকে শিক্ষালাভের সুযোগ দান 'মণ্টেসরী পদ্ধতির' অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মন্তেসরীর মতে শিশুর ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যকে জেনে প্রত্যেকের চাহিদা মেটানো শিক্ষার দায়িত্ব। এইজন্যেই তিনি ব্যক্তিগত শিক্ষার ওপরই বেশী জোর দিয়েছেন ও সেই অনুযায়ী শিক্ষার আয়োজন করেছেন।

(ঙ) **বাস্তব জীবনের ও সমাজ-জীবনের সাথে শিক্ষার সংযোগ-সাধনের প্রয়াস**—জীবনের জন্য প্রস্তুতি করিয়ে দেওয়া ও শিশুকে সমাজ-জীবনের উপযোগী করে তোলা 'মন্তেসরী'-পদ্ধতির লক্ষণ। তাই নানা কাজ ও খেলার প্রবর্ত্তন করে মন্তেসরী তাঁর শিক্ষার বৈশিষ্ট্যকে মূর্ত্ত করেছেন।

মনের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক আছে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, তাই ইন্দ্রিয়ের বিকাশ ও দৈহিক পুষ্টি যাতে একসঙ্গে হতে পারে সেজন্য তিনি কয়েকটি উপকরণের আয়োজন করেছেন। যেমন 'চা' প্রস্তুত করা ও পরিবেশন করা, বিভিন্ন সাংসারিক কাজ করা (যেমন জুতা পালিশ, আসবাবপত্র পরিষ্কার) মন্তেসরী শিক্ষার আয়োজনের মধ্যে ঠাঁই পেয়েছে। শারীরিক পুষ্টির জন্যে শিশুর খেলা, লাফ, ঝাঁপ, সাঁতার প্রভৃতি সব কিছুরই ব্যবস্থা তাঁর পরিকল্পিত।

(চ) প্রথম শৈশব 'মন্তেসরীর' কাছে বিশেষ মূল্যবান, তাই তিনি ইন্দ্রিয়-বৃত্তির চেতনার সাথে সাথেই শিক্ষাব্যবস্থার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে দুবছর বয়স থেকেই শিশুকে নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া যায় যদিও লেখা ও পড়া শিক্ষা অত অল্প বয়সে সম্ভবপর নয়।

(ছ) বাস্তব ও সমাজ-জীবনের প্রস্তুতির সাথে সাথে শিশুর সূক্ষ্ম অনুভূতি, সুন্দরের প্রতি ভালবাসা যাতে ক্রমশঃ জেগে ওঠে সেদিকেও তার আয়োজনের ত্রুটি নেই। তাই কর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ জাগিয়ে দেওয়া যেমন তিনি প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন, তেমনি কর্ম্ম-কোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শিশু যাতে মাঝে মাঝে নীরবতা অভ্যাস করতে পারে সেদিকে তাঁর

দৃষ্টি ছিল। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় যে, তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি স্বয়ংসম্পূর্ণ। কখনও চিত্তের প্রসার, আনন্দের প্রাচুর্য্য,—আবার কখনও আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও সংযম এই মনীষীর শিক্ষা-পরিকল্পনাকে সার্থক ও বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে।

শিক্ষাব্যবস্থা—মন্তেসরী শিক্ষাব্যবস্থার আলোচনা করলে দেখা যায় যে, নিম্নলিখিত কয়েকটি আয়োজন তাঁর পদ্ধতিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে :—

১। বাস্তব জীবনের কাজ শেখানো (Exercises of practical life) যাতে শিশুরা স্বাবলম্বী হতে পারে সেজন্য তিনি বিভিন্ন কাজের ব্যবস্থা করেছেন। যথা—হাতমুখ ধোওয়া, স্নান করা, কাপড় পরা, কাপড় গুছিয়ে রাখা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, আসবাবপত্র সাজিয়ে রাখা, বাসনপত্র পরিষ্কার করা ইত্যাদি।

২। শারীরিক শিক্ষা :

(ক) খেলা ও ব্যায়াম—লাইন বেঁধে যাওয়া, গানের সাথে সাথে নাচা, শ্বাসনিয়ন্ত্রণ ও বিভিন্ন অঙ্গসঞ্চালন ব্যায়াম।

(খ) শরীর পরীক্ষা—প্রতি মাসে শিশুর উচ্চতা লওয়া, কোন রোগের সম্ভাবনা দেখা দিলে তার প্রতিশোধন ব্যবস্থা করা।

৩। শিক্ষামূলক কাজ : জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যবহারে যাতে শিশুর শিক্ষা সম্ভব হয় সেজন্যে নানারূপ কাজের ব্যবস্থা আছে।

(ক) নানা রঙের জিনিষ রঙের পার্থক্য অনুযায়ী সাজিয়ে রাখা।

(খ) বিভিন্ন আকারের জিনিষের সাহায্যে নানারূপ জিনিষ তৈরী করা, কাপড়ে বোতাম আঁটা, ফিতা বাঁধা, ইত্যাদি।

(গ) সৃষ্টিমূলক কাজ—চিত্রাঙ্কন, মাটির জিনিষ তৈরী ও বাগান করা।

(ঘ) লেখা ও পড়া একসঙ্গে শেখা, গণনা শেখা, নাম শেখা ইত্যাদি।

কিণ্ডারগার্ডেন ও মন্তেসরী পদ্ধতির পার্থক্য

কিণ্ডারগার্ডেন	মন্তেসরী
১। কিণ্ডারগার্ডেনের শিক্ষিকা শ্রেণীপরিচালনার কাজে লিপ্ত।	১। মন্তেসরীর স্কুলে পরিচালিকার প্রধানকাজ শিশুদের কাজ লক্ষ্য করা ও প্রয়োজনস্থলে সহায়তা করা।

কিণ্ডারগার্টেন	মন্তেসরী
২। শিশুদের দলগতভাবে নির্দ্দেশিত কর্ম্মে উৎসাহিত করা হয়।	২। খেলনার সাহায্যে শিশুদের ব্যক্তিগতভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ দেওয়া হয়।
৩। সমস্ত গোষ্ঠীকে শিক্ষা ও নির্দ্দেশ দেওয়ার ব্যবস্থা ও আয়োজন করা হয়।	৩। ব্যক্তিগত নির্দ্দেশের অবকাশ ও ব্যবস্থা অনেক বেশী।
৪। শিক্ষিকার নির্দ্দেশ অনুযায়ী শিশুরা খেলায় ও কাজে নিযুক্ত হয়।	৪। শিশুর রুচি ও আগ্রহকে প্রাধান্য দেওয়া হয় ও ফলে শিশুরা স্বাধীনভাবে খেলা ও কাজে লিপ্ত হয়।
৫। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শিশুর খেলা বা কাজ চলতে থাকে।	৫। যতক্ষণ ইচ্ছা শিশুরা কাজে নিযুক্ত থাকতে পারে।
৬। শিশুর কল্পনা ও চিন্তার অবসর আছে।	৬। কল্পনাপ্রসূত কাজের ব্যবস্থা কম।
৭। ছবি, গল্প, গানকে বহুলভাবে শিক্ষার উপকরণ করা হয়েছে।	৭। কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট উপকরণের মাধ্যমে স্বয়ংশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৮। ফ্রয়েবলের প্রবর্ত্তিত খেলনাগুলির মধ্যে রূপক ও ইঙ্গিত নিহিত।	৮। মন্তেসরীর প্রবর্ত্তিত খেলনা অত্যন্ত সরল ও স্বয়ংশিক্ষার উপযোগী।

মন্তেসরী প্রবর্ত্তিত শিক্ষাব্যবস্থার আলোচনা

শিশুর প্রতি দরদী দৃষ্টি মন্তেসরী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য, তাই শিশুর স্বাধীন প্রকাশ ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা শিক্ষাক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করেছে। স্থানে স্থানে ত্রুটিপূর্ণ হলেও শিশুর ব্যক্তিত্বকে মর্য্যাদা দিয়ে ও অল্প বয়স থেকেই তাকে বাস্তব শিক্ষার উপযোগী করে তোলবার আয়োজন সত্যই বৈচিত্র্যময়। শিশুর মধ্যে যে অশেষ সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে তা উভয় মনীষীই স্বীকার করেছেন। আনন্দ ও খেলার মধ্য দিয়ে নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি উদ্ভাবন শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বিশেষ অবদান। মোট কথা, শিশুকে

নূতনভাবে আবিষ্কার করেছেন এই মহামনীষী ও তাঁর অন্তরের প্রবৃত্তি, রুচি ও ব্যক্তিত্বকে যোগ্য মর্য্যাদা দিয়ে গতানুগতিক শিক্ষার মূলে কুঠার আঘাত করেছেন। সে দিক থেকে মন্তেসরীর দান অসামান্য। অসহায় শিশুর পরিত্রাণ ঘটেছে তাঁরই মত দরদী শিক্ষাবিদের প্রবর্ত্তিত নূতন শিক্ষার কল্যাণে।

ভিন্ন ভিন্ন অনুশীলনের ব্যবস্থা তাই প্রবর্ত্তিত হয়েছে।

বাস্তব অনুশীলন পদ্ধতি ঃ—

দেখা যায় যে শিশুরা জল নিয়ে খেলা করতে ভালবাসে। তাই অনেক সময় তাকে একটা জলের ছোট্ট বালতি বা কলসী ও আর-একটি পাত্র দিলে সে জল ঢালাঢালি করে অনেক সময় কাটায়। শিশুর এই প্রবণতা লক্ষ্য করে 'মন্তেসরী' বিশেষ অনুশীলনমূলক কার্য্যের উদ্ভাবন করেছেন।

অনুশীলন ১

উপকরণ—

(ক) শিশুকে কি কি দিতে হবে—

১। একটা জলভর্ত্তি কুঁজো।

২। একটি ছোট্ট বালতি।

৩। একটি অন্য কোন পাত্র।

৪। একখানি সাবান।

৫। একটি তোয়ালে।

শিশুর বয়স—(কোন্ বয়সে এই কাজ দিতে হবে) ঃ প্রায় আড়াই বছর।

কাজের উদ্দেশ্য—মাংসপেশী-সঞ্চালনের সহায়তা করা, পরিচ্ছন্নতার প্রতি রুচি জাগানো এবং ভিতরের আবেগের পরিতৃপ্তি সাধন করা।

উপস্থাপন—

১। কোন টেবিলের ওপরে জিনিষগুলো রাখা।

২। জামার হাতা থাকলে হাত গুটিয়ে নেওয়া।

৩। কুজোটিকে দু'হাতে ধরা।

৪। আস্তে আস্তে অন্য একটি পাত্রে কিছু জল ফেলা (লক্ষ্য করতে হবে যেন কোন জলের ফোঁটা মেঝেয় না পড়ে)।

৫। সাবানটিকে নিয়ে হাতের এপিঠে ওপিঠে লাগানো।

৬। জল দিয়ে হাত আস্তে আস্তে ধুয়ে ফেলা।

৭। তোয়ালে দিয়ে হাত মোছা।

৮। একে একে সব জিনিষ যথাস্থানে পরিপাটি করে নিঃশব্দে রাখা।

এইভাবে সমস্ত কাজটি কিভাবে সুশৃঙ্খলরূপে সমাধা করা যায়, প্রতি ধাপে ধাপে কার পরে কোন্ কাজ করতে হবে তা শিশুকে বিস্তারিতভাবে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। তারপর শিশুকে সেই কাজ করতে উৎসাহ দিতে হবে। কাজের মাঝে ভুল হলেও তাকে সঙ্গে সঙ্গে বাধা না দিয়ে কাজ এগুতে দিতে হবে এবং যতক্ষণ সে সাহায্য না চায় ততক্ষণ তাকে কাজটি করতে দিতে হবে। এখানে শিক্ষকের কাজ হবে পর্য্যবেক্ষণ করা আর শিশুকে সাহায্য করা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—এই রকম অনেক কাজই শিশুকে দেওয়া চলে। কাজগুলোর ব্যবহারিক প্রয়োজনও আছে, আর শিশুকে আত্মনিয়ন্ত্রণের পথেও এরা সাহায্য করে। যেমন—

(ক) টেবিল পালিশ করা।

(খ) বাক্স পালিশ করা ইত্যাদি।

অনুশীলন ২

শিশুর নিজের সাথে পরিবেশের নিয়ন্ত্রণের জন্যে আরও অনেক কাজ করতে পারে। তাকে ঘিরে যে সমাজ রয়েছে সে সমাজে তার আচরণ কেমন হবে তাও তাকে একে একে শিক্ষা দিতে হবে। যেমন কোন অভিভাবককে প্রথমে দেখে হাত তুলে নমস্কার করা বা করমর্দ্দন করা ইত্যাদি। এগুলো তাদের শিখিয়ে দিতে হবে। কখন কি ভাবে অভিবাদন জানাতে হবে, কি ভাবে তার প্রত্যভিবাদন গ্রহণ করতে হবে, কিভাবে কাউকে হাত নেড়ে বিদায় দিতে হয়—এই রকম ছোটখাট সামাজিক কর্ত্তব্যগুলোর সাথে শিশুর পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

অনুশীলন ৩

শিশু স্বভাবতঃ চঞ্চল বলে তাকে এমন কয়েকটি কাজ দিতে হবে যা তার চলাফেরার মধ্যে ছন্দ ও শৃঙ্খলা নিয়ে আসে। এইজন্যে অনেক সময় দেখা যায় ঘরের মেঝের ওপর খড়ি দিয়ে একটা লম্বা রেখা টেনে দিয়ে তার ওপর দিয়ে শিশুকে চলতে বল্লে সে পরম আগ্রহে লাইনের ওপর দিয়ে চলবার চেষ্টা করে।

শিক্ষকের কাজ হবে শিশুকে দেখিয়ে দেওয়া কিভাবে সামনের পা সোজা লাইনের ওপর ফেলতে হবে ও পিছনের পা গুটিয়ে আনতে হবে। এইভাবে সতর্কতা অবলম্বন করে আত্মপ্রত্যয় নিয়ে শিশু যাতে স্বাধীনভাবে চলতে শেখে, যাতে তার চলার ভঙ্গি স্থন্দর হয়, তারজন্যে গোড়া থেকেই শিশুকে সচেতন করে দিতে হবে। দেখা যাবে প্রথম প্রথম সে চলতে চলতে একদিকে ঢলে পড়ছে, নিজের ভারসাম্য রাখতে পারছে না, কিন্তু ধৈর্য্যহারা হয়ে জোর করে শিক্ষক যদি কিছু করতে চান তাহলে ভুল হবে। যতক্ষণ সে নিজে থেকে ঠিকভাবে চলতে না শিখবে ততক্ষণ তাকে সাহায্য করার দৃষ্টি নিয়ে অপেক্ষা করতে হবে।

অনুশীলন ৪

শিশু চঞ্চল হলেও শৃঙ্খলার প্রতি নিষ্ঠা তার স্বভাবগত, তাই অনেক সময় দেখা যায় যে, যদি তাকে নীরবতা পালন করতে বলা হয় তাহলে সে কাজ সুষ্ঠুভাবেই করতে পারে।

প্রথমে ঘর অন্ধকার করে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে শিশু বোঝে যে, সেটা একটা সাধনার পরিবেশ। একে একে তাকে পরিবেশের গাম্ভীর্য্য অভিভূত করবে, আর সে নিজেও ধীর স্থির হয়ে সে পরিবেশকে আরও শান্ত গম্ভীর করে তোলবার চেষ্টা করবে। অনেক শিশু মিলেই এই খেলায় যোগ দেবে, শিক্ষক মাঝে মাঝে বুঝিয়ে দেবেন যে, শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ কত স্থন্দর। সেখানে না আছে কোলাহল, না আছে অর্থহীন ক্ষিপ্ততা।

ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে শিশুর শিক্ষা

শিশুর ইন্দ্রিয়গুলি যাতে সজাগ হয় সেজন্য মন্তেসরী কয়েকটি উপায় উদ্ভাবন করেছেন। ইন্দ্রিয়গুলি চালনার সাহায্যে তাদের পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা, বিশ্লেষণশক্তি ও বুদ্ধির উন্মেষ হবে। খেলাচ্ছলে যাতে শিশু আনন্দের সঙ্গে কাজ করতে শেখে, যাতে তার মানসিক, দৈহিক ও আনুভূতিক বিকাশ হয় তার জন্যই এই ব্যবস্থা। ইংরাজীতে এই সব শিক্ষণের বস্তুগুলিকে বলা হয় Didactic material। এই বস্তুগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এইগুলিকে নিয়ে যখন শিশু নাড়াচাড়া করবে, সাজাবে গোজাবে, দেখবে শুনবে, স্পর্শ করবে তখন তার অনুভূতি ক্রমশঃই বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠবে, ভরে উঠবে তার অভিজ্ঞতার ডালি।

অনুশীলন ১

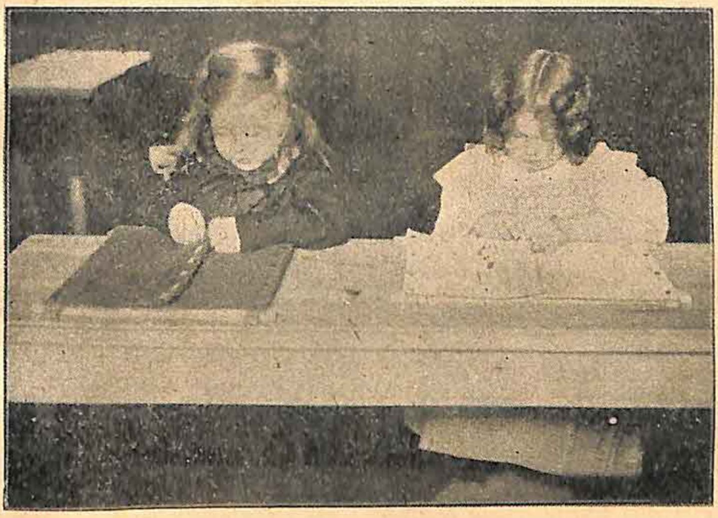
উপকরণ—কিছুদিন ধরে শিশুর বোতাম পরানো প্রভৃতি কাজ আয়ত্ত হবার পর তাকে দশটি কাঠের 'কিউব' দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে কিভাবে সেগুলো একের পর এক সাজিয়ে একটা স্তম্ভ তৈরী করা যায়।

লক্ষ্য—(ক) শিশুকে নানা আকারের জিনিষের পার্থক্য নিরূপণ করবার জন্য তার দৃষ্টির প্রয়োগ।

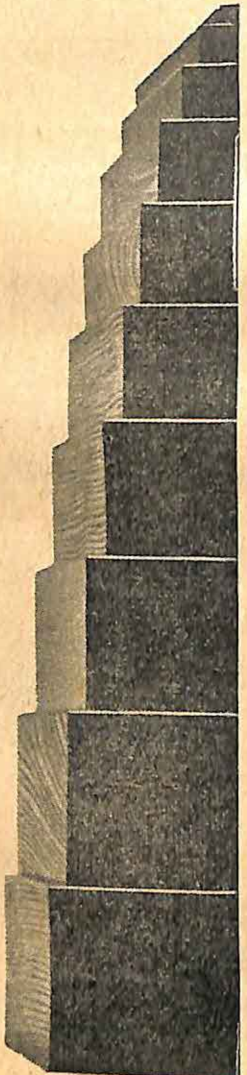
(খ) চোখ এবং মাংসপেশীর মধ্যে সংহতি আনতে সহায়তা করা।

কোন্ বয়সে এই শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয়ঃ আড়াই থেকে তিন পর্য্যন্ত।

উপস্থাপন—শিক্ষার উপকরণগুলো অর্থাৎ কাঠের কিউবগুলোর তিনটি তল (Dimension) আছে এবং একটা উপকরণ থেকে আর একটা উপকরণের এই দলগত তফাৎ আছে। প্রথমে মেঝের ওপর একটা কার্পেট বা আসন বিছিয়ে এই কাঠের 'ব্লক'গুলোকে ছড়িয়ে রাখতে হবে, তারপর আঙ্গুল দিয়ে সযত্নে ধরে সমানভাবে আসনের ওপরে সব চেয়ে বড় কিউবটিকে রাখতে হবে। এমনি করে একের পর এক কিউবগুলোকে উঠিয়ে ঠিক আগের কিউবটির মাঝখানে রাখতে হবে। প্রতিবার এইভাবে রাখবার পর শিশুকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, আগেকার 'কিউবটির' সঙ্গে পরেরটার একটা আয়তনগত তফাৎ রয়েছে এবং বড় থেকে ছোটর দিকে লক্ষ্য রেখে এই সাজানো চলেছে। এইভাবে দশটি 'ব্লক'ই যখন সাজানো হয়ে যাবে তখন শিশু আনন্দের সঙ্গে দেখবে যে, একটা চমৎকার স্তম্ভ গড়ে উঠেছে। তার আগ্রহ হবে নিজে এমনি একটা স্তম্ভ তৈরী করবার জন্যে। ছ'চার বার এমনি ভাবে দেখিয়ে দেবার পর সব থেকে ছোট্ট 'কিউবটির' প্রতি শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। দেখিয়ে দিতে হবে যে, পর পর যে দশটি কিউব সাজানো আছে তাদের একের সাথে আর-একের আয়তনের তফাৎ। আর এই ছোট্টটি দিয়ে ধরা পড়বে এইগুলো ঠিকমত সাজানো কি না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা চলে যে, সবচেয়ে বড় যে কিউব তার সাথে তার পরের বড় কিউবটির আয়তনের তফাৎ এই ছোট্ট কিউবটির আয়তনের মত। কিন্তু সাজানো ঠিক হয়েছে কি-না দেখতে গেলে কিউবগুলোকে সব একধারে সমান করে নিতে হবে, যাতে করে



বোতাম পরানো



কাঠের চওড়া সিঁড়ি

অন্যধারের পার্থক্যগুলো ধরা পড়ে। তারপর ক্রম-অনুসারে একের সঙ্গে আর-একের পার্থক্য এই ছোট্ট কিউবটি দিয়ে দেখে নিতে হবে।

অভিযোজন—শিশুর আগ্রহ যখন জেগে উঠবে তখন সে আপন খুশিমত এগুলোকে নিয়ে সাজাবে, আর অনেক ভুলও করবে। কখনও বা দেখা যায় শিশু খাপছাড়া ভাবে এগুলোকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, কিন্তু এই সব দেখে শিক্ষককে অসহিষ্ণু হলে চলবে না, যতক্ষণ না সেই ব্লকগুলোকে অন্য কাজে লাগাচ্ছে, অর্থাৎ অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত শিক্ষক ধৈর্য্য ও সহানুভূতির সঙ্গে শিশুর কার্য্য লক্ষ্য করবেন ও তার প্রয়োজনমত তাকে সাহায্য করবেন।

এই কাজ করবার সময় শিশু যে কেবল আয়তনের তফাৎই লক্ষ্য করে তা নয়—ওজনের তফাৎ এবং সংখ্যার ধারণাও তাহার অজ্ঞাতভাবে জন্মাবে।

মন্তব্য—বেশ কিছুক্ষণ এই ব্লকগুলো নিয়ে অনুশীলনের পর এগুলো সাজাতে আর কোন অসুবিধা হবে না এবং সে একে একে বুঝতে আরম্ভ করে কিভাবে এই ছোট্ট কিউবটির সাহায্য নিয়ে সে তার ভ্রম সংশোধন করে নিতে পারে। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, এই ছোট্ট কিউবটি ভ্রমসংশোধক হিসাবে কাজ করছে।

অনুশীলন ২

উপকরণ—(**কাঠের সিঁড়ি**) আগে যেমন 'কিউব'গুলোর মধ্যে তিনটি তলের আয়তনের পার্থক্য দেখা গিয়েছে, এই কাঠের সিঁড়িগুলোর মধ্যে দুইটি তলের আয়তনগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। একই দৈর্ঘ্যের দশটি কাঠের টুকরো যেগুলো দেখতে আয়তক্ষেত্রের মত। দৈর্ঘ্য এক হলেও প্রস্থ ও ঘনত্বে এদের তফাৎ আছে।

লক্ষ্য—(ক) হাত ও চোখের মধ্যে সংহতি আনতে সাহায্য করা।

(খ) গণিত বা জ্যামিতির সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মে দেবার চেষ্টা করা।

কোন্ বয়সে এই শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয়ঃ আড়াই থেকে তিন পর্য্যন্ত।

উপস্থাপন—একই প্রকারের কাঠের টুকরোগুলোকে কোন একটা কার্পেট কিংবা মাদুরের ওপর ছড়িয়ে রাখতে হবে, তার পর সযত্নে কাঠের টুকরোগুলোকে ধরে একে একে সমানভাবে পাশাপাশি রাখতে হবে। টুকরোগুলোকে ধরবার সময় এদের যে ওজনের তফাৎ আছে, সে দিকেও শিশুর দৃষ্টি

আকর্ষণ করতে হবে, সব থেকে যেটি চওড়া সেইটিকে আগে রাখতে হবে এবং তারপর একে একে প্রস্থের তারতম্য অনুযায়ী এগুলোকে পাশাপাশি সাজিয়ে যেতে হবে। কয়েকবার এই রকমভাবে শিশুর সামনে সাজানোর প্রণালীটা শেখালে সে নিজে থেকেই এই কাজ করতে চাইবে। যখন সে দেখবে যে কাঠের টুকরোগুলোকে নিয়ে ঠিক ভাবে সাজাতে পারলে চমৎকার একটা সিঁড়ির মত জিনিষ তৈরী হয়, তখন সে আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠবে।

অভিযোজন—শিশু যখন মনের দিক থেকে তৈরী হবে তখনি সে পরম আগ্রহে এই কাজ সুরু করবে এবং কোন আয়াস বোধ না করেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক কাজ করে যাবে। ভুল, ত্রুটি যে তার হবে না একথা আশা করাই ভুল, তাই আগের মত শিশুকে ঠিকভাবে উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করাই হবে শিক্ষকের প্রধান কাজ।

মন্তব্য—এই কাজটির মধ্যেও সব চেয়ে সরু যে কাঠের টুকরোটি আছে তার দিকে শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটা যে ভ্রম-সংশোধনের কাজে লাগতে পারে এটা বুঝিয়ে দিতে হবে।

অনুশীলন ৩

উপকরণ—আগের মত এখানেও দশটি আয়তক্ষেত্রের মাপের কাঠের টুকরো আছে, তবে এখানে একটির দৈর্ঘ্যের সাথে আর-একটির দৈর্ঘ্যের তফাৎ আছে। সাধারণতঃ কাঠের টুকরোগুলো 'লাল রঙের'। কেবলমাত্র দৈর্ঘ্যের দিক থেকেই এদের তফাৎ। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, এই ধরণের প্রথম অনুশীলনীতে ছিল তিনটি আয়তনের তফাৎ, দ্বিতীয়টিতে ছিল দুইটি আর এইটিতে একটি আয়তনের তফাত।

লক্ষ্য—(ক) শিশুর আয়তনগত পার্থক্যবোধ জাগিয়ে তোলা।

(খ) গণিতবিষয়ে ধারণার জন্যে শিশুমনে প্রস্তুতি।

কোন্ বয়সে এই শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয়ঃ তিন বছর থেকে চার পর্য্যন্ত।

উপস্থাপন—পূর্ব্বের মত এই কাঠের টুকরোগুলোকে কোন কার্পেট বা আসনের ওপর ছড়িয়ে রাখতে হবে, তারপর একই উপায়ে সেগুলোকে সযত্নে ধরে পর পর সাজিয়ে যেতে হবে। সাজানোর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সেগুলো

যেন একটা লাইন থেকেই স্বরু হয়। অর্থাৎ সাজাবার আগে যদি উপর-নীচে vertical একটা লাইন টেনে দেওয়া যায় এবং সবগুলো টুকরোর গোড়াটাকে সেই লাইনে ফেলা যায়, তবে দেখা যাবে যে, যখন সবগুলো টুকরো সাজানো হবে তখন তাদের একদিক সব এক লাইনের উপর পড়বে। আর তফাৎটা অন্য দিকে জেগে উঠবে।

এইভাবে বার কয়েক সাজানোর পর একইভাবে শিশুকে দেখিয়ে দিতে হবে যে, ছোট্ট কাঠের টুকরোটা ভ্রম-সংশোধনের পথে সহায়তা করে।

শিশু একটি টুকরোর সাথে আর-একটি টুকরোর সম্পর্কবোধের মধ্য দিয়ে এগুলো সাজাতে শিখবে। সঙ্গে সঙ্গে তার দৈর্ঘ্য ও অন্যান্য আয়তনসম্পর্কে ধারণা জন্মাবে।

অনুশীলন ৪

উপকরণ—তিন রকমের সিলিণ্ডার আছে। প্রত্যেক রকমের সিলিণ্ডারের সংখ্যা দশটি করে।

(ক) প্রথম রকম সিলিণ্ডারগুলো দৈর্ঘ্যতে সমান কিন্তু পরিধিতে অসমান, অর্থাৎ সিলিণ্ডারের পরিধি ক্রমশঃ ছোট হয়ে এসেছে। প্রথমটির পরিধি যদি ৩ ইঞ্চি হয় তবে শেষটির পরিধি হবে ১ ইঞ্চির মত।

(খ) এখানে সিলিণ্ডারগুলোর পরিধি ও দৈর্ঘ্য দুই অসমান; ফলে যথাস্থানে এগুলোকে রাখা অপেক্ষাকৃত কঠিন।

(গ) এখানে সিলিণ্ডারগুলোর পরিধি সমান কিন্তু দৈর্ঘ্য অসমান; ক্রমশঃ ছোট থেকে বড় হয়েছে, ফলে এই জাতীয় সিলিণ্ডার নিয়ে কাজ করা ছেলেদের পক্ষে সব চেয়ে কঠিন।

লক্ষ্য—(ক) শিশুকে নানান আয়তনের মধ্যে পার্থক্যসম্পর্কে সচেতন করিয়ে দেওয়া।

(খ) শরীর, মাংসপেশী ও মনের মধ্যে সংহতি স্থাপন করা।

কোন্ বয়সে এই শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয়ঃ তিন থেকে চার বছর পর্য্যন্ত।

উপস্থাপন—সিলিণ্ডারগুলোকে একটা আসনের কিংবা কার্পেটের ওপর ছড়িয়ে রাখতে হবে। সর্ব্বসমেত ৩০টি সিলিণ্ডার এমন ভাবে মিশিয়ে রাখতে

হবে যে, শিশুর পক্ষে সেগুলো ঠিক ঠিক জায়গায় রাখা সহজ হবে। এবার একে একে কিভাবে সেগুলি যথাস্থানে রাখতে হবে তা দেখিয়ে দিতে হবে। তারপর যথাস্থানে রাখবার আগে প্রত্যেকটা সিলিণ্ডারের কাণায় হাত বুলিয়ে দেখতে হবে যে সেগুলোর সঙ্গে ছিদ্রগুলোর আকারের মিল আছে। অর্থাৎ স্পর্শ করে অনুভূতি দিয়ে প্রত্যেক জিনিষটার আকারের পার্থক্য উপলব্ধি করবার জন্য সহায়তা করাই হবে এই অনুশীলনীটির উদ্দেশ্য।

অভিযোজন—শিশু লক্ষ্য করবে যখন এই সব সিলিণ্ডারগুলো নিয়ে শিক্ষক যথাস্থানে রাখবেন। বার বার এমনি করে যদি এই কাজ কিভাবে করতে হয় তা শিশুকে দেখিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সেও চেষ্টা করবে।

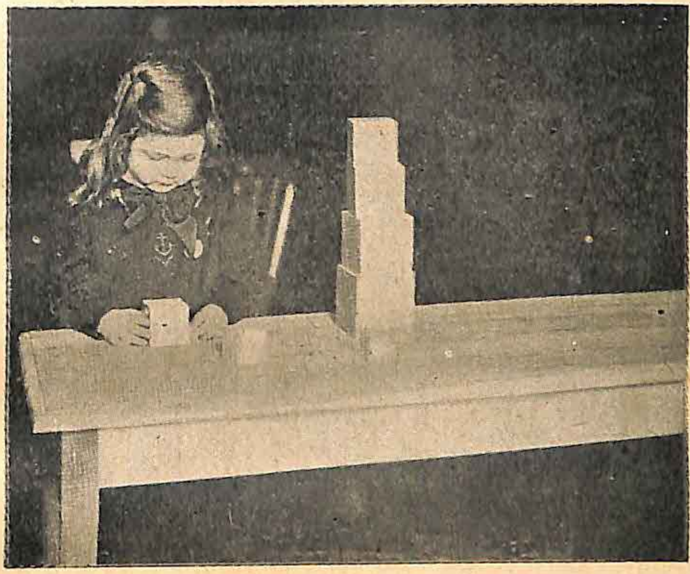
দেখা যাবে যে প্রথম শ্রেণীর সিলিণ্ডারগুলোকে ঠিকভাবে সাজান শিশুর পক্ষে সবচেয়ে সোজা হবে। কারণ প্রথম শ্রেণীর সিলিণ্ডারগুলোর মধ্যে পরিধিতে তফাৎ আছে এবং সেই তফাৎটা ওপর থেকেই বুঝতে পারা যায় অর্থাৎ কাঠের ব্লকগুলোর ওপরই লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ছিদ্রগুলোর আকারের পার্থক্য আছে। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর সিলিণ্ডারগুলোর ক্ষেত্রে শিশুর কাজ সবচেয়ে কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ ছিদ্রগুলোর দৈর্ঘ্যের তফাৎ বাইরে থেকে বোঝা যায় না।

মন্তব্য—শিশুর পক্ষে এই কাজ খুব আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে এই কাজ করতে আনন্দ পায়। কাজের মধ্যদিয়ে এই শিক্ষা শিশুকে এগিয়ে দেয় তার অভিজ্ঞতা আহরণের পথে। কাজটি কঠিন হয়ে পড়লে বা সে ভুল করলেও শিক্ষককে সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে কাজটির সমাধার পথে সাহায্য করতে হবে।

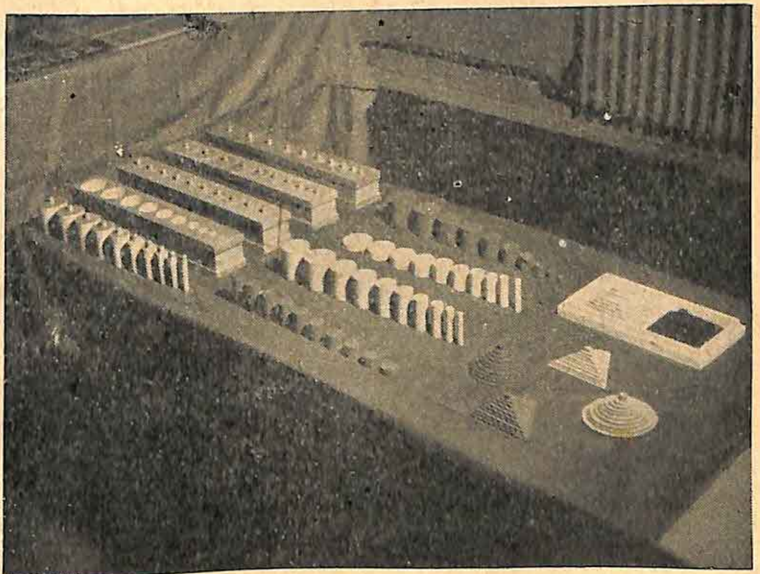
অনুশীলন ৫

উপকরণ—নানা রকম রং-এর বাক্স, বাক্সটিতে আট রকম মূল রং আছে এবং প্রত্যেক রকমের আবার আটটি করে সেড্ (Shade) আছে, ফলে সবশুদ্ধ ৬৪ রকমের রঙের বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যাবে।

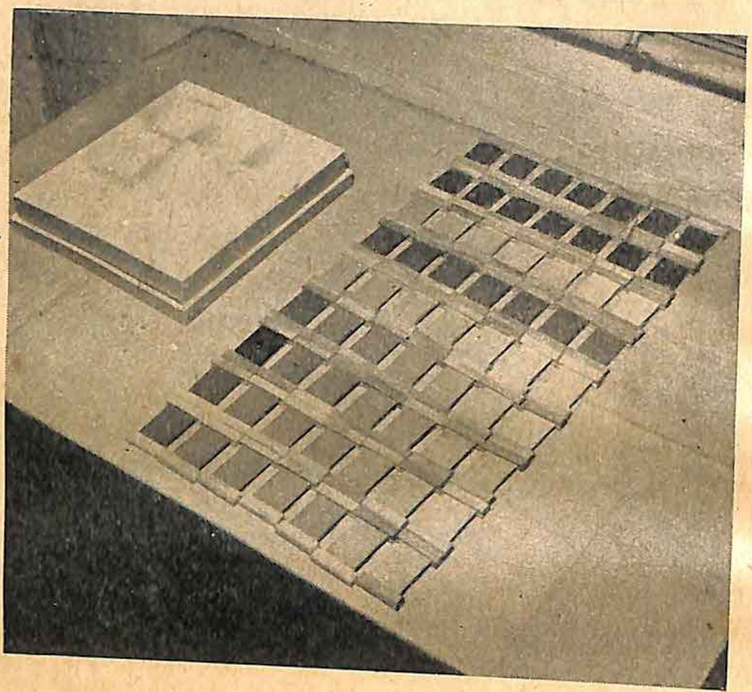
লক্ষ্য—(ক) রং-এর বৈচিত্র্য সম্পর্কে শিশুকে সচেতন করা। (খ) একটি রং থেকে আর একটি রং যে তফাৎ, সেটা সম্পর্কে শিশুর দর্শন-ইন্দ্রিয়কে সজাগ করা।



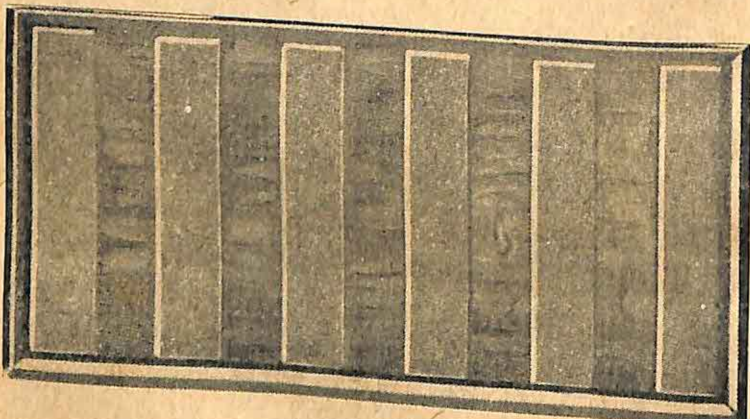
কাঠের স্তম্ভ তৈরী করা



সিলিণ্ডার (Cylinder)



রং-এর বাক্স



খস্‌খসে ও মসৃণ কাগজ

কোন্ বয়সে এই অনুশীলন শিশুর উপযোগী ঃ সাড়ে তিন হইতে সাড়ে চার পর্য্যন্ত।

উপস্থাপন—কয়েকটি উজ্জ্বল রং শিশুর সামনে দিতে হবে এবং তাদের নামের সঙ্গে শিশুকে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। যেমন লাল, নীল, ইত্যাদি। একদিনেই সমস্ত রংগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে না দিয়ে আরও ছু'একদিন একই অনুশীলন তাদের শিক্ষা দেওয়া দরকার। এইভাবে প্রথমে শিশুর যখন ছুটো প্রধান প্রধান রং-এর সঙ্গে পরিচয় হবে তখন তাদের অন্যান্য বৈচিত্র্যগুলোর সাথেও পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। এমনিভাবে একে একে মূল আটটি রং-এর সঙ্গে শিশুর পরিচয় হবে।

জোড়ায় জোড়ায় রংগুলিকে শিশুর সামনে তুলে ধরতে হবে, তারপর যখন প্রত্যেক রংটির সঙ্গে শিশুর পরিচয় নিবিড় হবে তখন সবগুলোকে একসঙ্গে মিশিয়ে এক একটি রং বেছে নেবার জন্য শিশুকে নির্দ্দেশ দিতে হবে। যেমন শিশুকে বলতে হবে "আচ্ছা, আমায় এর থেকে লাল রংটি দাও তো।" আর শিশু তা নানা রং-এর মাঝখান থেকে বেছে নিতে চেষ্টা করবে। কিছুদিন বাদে এক একটি রং-এর যতরকম ঘোর আছে সেগুলোকে পর পর রং-এর ঘনত্ব অনুযায়ী সাজাতে বলতে হবে। তার পর এই কাজে শিশুর ভুল হলেও, তাকে প্রয়োজন মত সাহায্য করতে হবে। অবশ্য ফিকে রং থেকে ঘন রং-এর দিকে যাবার সময় শিশু যে কিছু অসুবিধায় পড়বে তা ধরে রাখতেই হবে। এই সব ক্ষেত্রে একমাত্র দর্শনেন্দ্রিয়ই সহায়।

অভিযোজন—এই খেলাটিকে খুবই মজার করে তোলা যায় যদি শিক্ষক একটু সচেষ্ট হন। কয়েকটি রং-এর বাক্স একই সঙ্গে নিয়ে তার থেকে সব রংগুলি মিলিয়ে মিলিয়ে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখতে হবে; তারপর একটি শিশুকে বলতে হবে একটি কোন নির্দ্দিষ্ট রং বেছে নিতে এবং আর-একটি শিশুকে সেই একই রং টেবিল থেকে বেছে আনতে বলতে হবে। রং-এর বাক্সের সংখ্যা যত বেশী হবে ততই এই খেলাটিকে মজার করে তোলা যাবে।

মন্তব্য—দেখা যাবে অনেকে এই রং-এর ব্যাপারে খুব সচেতন নয়। ইংরাজীতে তাদের বলা হয় Colour blind. তাদের শৈশব

থেকে যদি এই দুর্ব্বলতা ধরা পড়ে তবে কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

অনুশীলন ৬

উপকরণ—কয়েকটি ছোট ছোট কাঠের খণ্ড, যার একপাশে আছে খসখসে সিরিশ কাগজ আর এক পাশে মসৃণ কাঠ।

লক্ষ্য—(ক) শিশুর স্পর্শেন্দ্রিয়কে সজাগ করা। (খ) হাতের মাংসপেশী-গুলোকে লেখবার জন্য প্রস্তুত করা।

কোন্ বয়সে এই শিক্ষা দেওয়া উচিত ঃ তিন হইতে চার বছর পর্য্যন্ত।

উপস্থাপন—প্রথমেই হাত জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে ও শুকিয়ে নিতে হবে স্পর্শানুভূতিকে বাড়াবার জন্যে। তারপর শিশুকে দেখিয়ে দিতে হবে কি ভাবে আঙ্গুলের প্রান্ত দিয়ে (আগায়) যে-কোন জিনিষের স্পর্শ অনুভব করা সহজ।

কাঠের বোর্ডটি নিয়ে শিশুর ছোট্ট টেবিলের উপর রাখতে হবে। পরে শিশুর হাতটিকে টেনে নিয়ে তার আঙ্গুলের প্রান্ত দিয়ে মসৃণ জায়গাটির ওপর কি ভাবে স্পর্শ নিতে হবে তা দেখিয়ে দিতে হবে। মসৃণ জায়গায় যখন শিশু আঙ্গুল বুলাবে, যখন সে তার স্পর্শ নিবিড় ভাবে পাবে তখন সঙ্গে সঙ্গে বলবে "মসৃণ"। এই অনুভূতির সঙ্গে মসৃণ পদার্থের একটি যোগাযোগ করিয়ে দেওয়াই শিক্ষকের প্রধান লক্ষ্য থাকবে। এমনি করে খসখসে জিনিষের স্পর্শবোধও শিশুর মনে জাগিয়ে দিতে হবে।

যখন এই স্পর্শবোধ শিশুর মনে রেখাপাত করবে, যখন সে মসৃণ ও খসখসের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে শিখবে তখন একে একে তার মনে মসৃণ ও খসখসের স্বতন্ত্র ধারণা জন্মে দেবার চেষ্টা করতে হবে। এজন্যে তার চোখ বেঁধে পরীক্ষা করতে হবে সে কোন্‌টা মসৃণ ও কোন্‌টা খসখসে, স্পর্শ করে বলতে পারে কিনা। অনেকদিন ধরে এই অনুভূতি জাগিয়ে দেবার চেষ্টা করতে হবে। যখন দুয়ের মধ্যে পার্থক্যবোধ শিশুর মনে তীব্র হয়ে উঠবে তখন তাকে আরও কঠিন কাজ দিতে হবে। যেমন অনেক রকম কাপড় দিয়ে সেগুলোকে মসৃণতার তারতম্য অনুসারে সাজাতে বলা।

অভিযোজন—সূক্ষ্ম স্পর্শবোধ জন্মাতে শিশুর অনেক দিন দেরী হয় বলে

শিক্ষকের ধৈর্য্য হারালে চলবে না, শিশুকে প্রচুর সময় দিতে হবে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক্ষমতা জন্মাবার জন্যে। সব সময় যাতে শিশু বাঁ-দিক্ থেকে ডানদিকে অঙ্গুলী চালনা করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আর লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সে ওপর ওপর স্পর্শ অনুভব করে অর্থাৎ আলগা ভাবে সে যেন স্পর্শটি নিতে পারে।

মন্তব্য—এই মসৃণতার পার্থক্য বুঝতে গেলে শিশুর দৃষ্টি ও স্পর্শবোধ দুই একসঙ্গে সাহায্য করে। বাস্তব জীবনে এই স্পর্শবোধের যে বিশেষ মূল্য আছে একথা বলাই বাহুল্য।

অনুশীলন ৭

উপকরণ—নানারকমের অর্থাৎ খসখসে, মসৃণ সব রকমের কাপড়ের টুকরো। এর মধ্যে থাকবে সিল্ক, ভেলভেট, সাটিন, সার্জ, পশম ও এমনি আরও অনেক রকম কাপড়ের টুকরো। প্রত্যেক রকম অন্ততঃ দু'খণ্ড করে থাকবে।

লক্ষ্য—(ক) সূক্ষ্ম স্পর্শানুভূতি জাগিয়ে দেওয়া। (খ) কোমল, কর্কশ, মসৃণ, খসখসে ইত্যাদি বিপরীতধর্মী পদার্থের মধ্যে পার্থক্যবোধের পথে শিশুকে সহায়তা করা।

কোন্ বয়সে এই শিক্ষা দেওয়া উচিত : সাড়ে তিন হইতে চার পর্য্যন্ত।

উপস্থাপন—নানারকম কাপড়ের টুকরো একে একে আলাদা করে ফেলতে হবে ও আলাদা জায়গায় রাখতে হবে। তারপর একে একে এইভাবে প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই হবে শিক্ষকের প্রথম কর্ত্তব্য। প্রত্যেকটি খণ্ড আলাদা আলাদা আলগাভাবে ছুঁয়ে শিশু তাকে অনুভব করবে ও তার নামের সঙ্গে পরিচিত হবে। এইভাবে প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচয় ঘটলে তাকে একের বেশী জিনিষ অনুভব করে পার্থক্য বোঝবার পথে সহায়তা করতে হবে।

এর পরে কাপড়ের টুকরোগুলোর মসৃণতার তারতম্য অনুসারে দুই সারিতে সাজিয়ে ফেলতে হবে। পরে শিশুকে জিজ্ঞাসা করতে হবে একটি নির্দ্দিষ্ট কাপড়ের টুকরো বেছে নিতে এবং অন্য সারি থেকে তার জোড়া বার করতে হবে। প্রত্যেক সারিতেই সমান সংখ্যক কাপড়ের টুকরো চাই। একে একে কাপড়ের সংখ্যা বাড়িয়ে যেতে হবে এবং নতুন নতুন কাপড়ের আমদানি করতে হবে। এক দিনে বেশী কাপড়ের আমদানি করা যুক্তিযুক্ত নয় কারণ তাহলে

শিশুর গোলমাল বাধতে পারে। এই কাজ বেশ কিছুদিন চলতে থাকলে শিশুর চোখ বেঁধে দিয়ে তাকে পরীক্ষা করতে হবে সে কাপড়ের তারতম্য অনুভব করতে পারে কিনা।

অভিযোজন—শিক্ষক মহাশয় শিশুকে সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে এই কঠিন কাজে সহায়তা করবার চেষ্টা করবেন এবং ধৈর্য্য সহকারে তার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করে প্রয়োজন হলে তাকে সাহায্য করবেন।

মন্তব্য—এই অনুশীলনটিকে বেশ মজার করে তোলা যায়। ঘরের চারি পাশে কিছু কিছু কাপড়ের টুকরো ছড়িয়ে রাখলে ও তারপর শিশুকে একটি জোড়া খুঁজে নিতে বললে এই কাজটি বোধ হয় আরও মজার হয়ে ওঠে।

অনুশীলন ৮

উপকরণ—অনেকগুলি নানান ওজনের কাঠের টুকরো, সবগুলির আকার ও আয়তন সমান। কিন্তু কাঠের তারতম্য অনুসারে ভারের তারতম্য ঘটে। সাধারণতঃ কাঠের টুকরোগুলো বার্ণিশ করা এবং মসৃণ। মোটামুটি ৩ রকমের কাঠের টুকরো আছে,—ভারী, হাল্কা ও মাঝামাঝি। সবক্ষেত্রেই এই রকম টুকরোর সংখ্যা নয়টি করে। কাঠের টুকরোগুলোর আকৃতি ও আয়তন সমান হলেও প্রত্যেকেরই এক একটা বিশিষ্ট রং আছে।

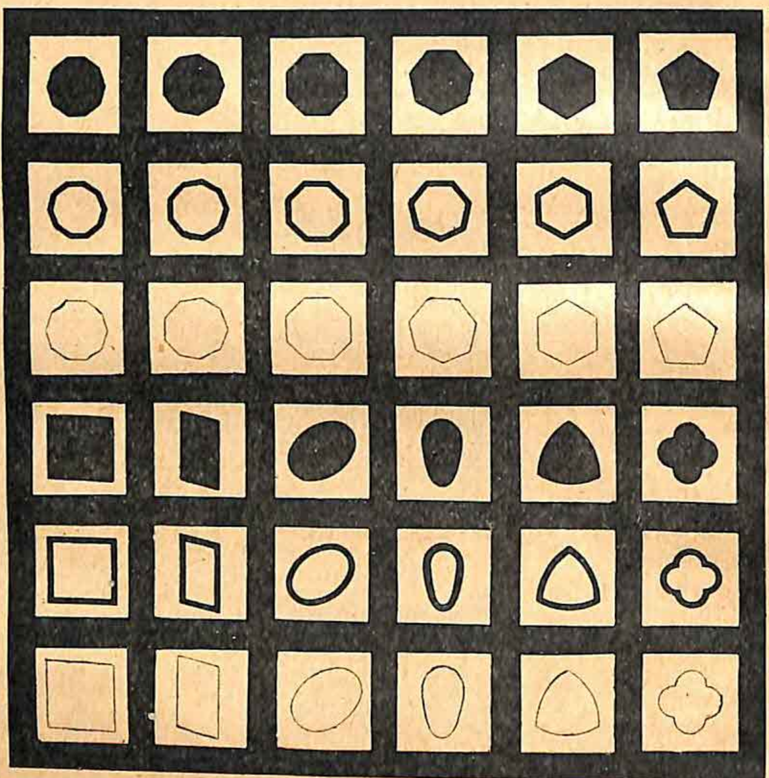
লক্ষ্য—(ক) শিশুর মনে ওজনের তারতম্য বোধ জাগিয়ে দেওয়া।

কোন্ বয়সে এই শিক্ষা দেওয়া উচিত: তিন হইতে চার বছর পর্য্যন্ত।

উপস্থাপন—প্রত্যেক রকম কাঠের টুকরো শিশুর হাতে আলগাভাবে রেখে দিতে হবে। শিশু তাতে বুঝতে পারবে কোন্টা ভারী কোন্টা হাল্কা। কিছুক্ষণ পরে শিশুকে চোখ বন্ধ করতে বলতে হবে আর ওজনের তারতম্য অনুসারে কোন্টা ভারী ও কোন্টা হাল্কা জিজ্ঞাসা করতে হবে। অনেক সময় হাত পাল্টে দিয়ে ওজনের তারতম্য বুঝতে দিতে হয়, কারণ একহাতে বেশীক্ষণ অনুভূতি বোধ তীব্র থাকে না। প্রথমেই যেটি সবচেয়ে হাল্কা ও যেটি সবচেয়ে ভারী—এই দুইটি কাঠের টুকরোর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে দিতে হবে; তারপর একে একে আরও কয়েকটি কাঠের টুকরোর আমদানি করতে হবে। এমনি করে শিশুর ভার বা ওজন সম্পর্কে চেতনার উন্মেষ হবে আর প্রথমে এই কাঠের টুকরোর



শব্দের বাক্স



জ্যামিতিক আকৃতি

সংখ্যা অল্প থাকলেও শেষের দিকে তার সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে চোখ বেঁধে এই তারতম্য বোধ পরীক্ষা করতে হবে।

অভিযোজন—এইভাবে ক্রমশঃ শিশুর ভারানুভূতি জেগে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষককে কাঠের টুকরোগুলো তিনটি সারিতে ফেলতে বলতে হবে। অবশ্য চোখ বেঁধে দেওয়াতে যদি শিশুর বিশেষ আপত্তি থাকে তবে জোর করে তা করতে যাওয়া নিবুদ্ধিতার পরিচয় হবে। যখন শিশু নিজেই আগ্রহ নিয়ে এই কাজ করতে চাইবে তখনই তাকে উৎসাহ দিতে হবে।

মন্তব্য—কাঠের টুকরোগুলোর মধ্যে মসৃণতার দিক থেকে কোন তফাৎ না থাকার জন্যে টুকরোগুলোকে যথাস্থানে সাজাতে তার ভাবানুভূতির সহায়তা নিতে হয়। চোখ বাঁধা অবস্থায় যখন সে এই কাজ করতে থাকে, তখন আর কোন উপায় থাকে না। এই শ্রেণী বিভাগ অর্থাৎ কাঠের টুকরোগুলোকে ঠিক ঠিক ভাবে ফেলা হয়েছে কি না তা বুঝতে হলে শিশুকে দেখে ঠিক করতে হবে। কারণ প্রত্যেক রকমের কাঠের এক একটা বিশিষ্ট রং থাকে; এই কাজে কয়টি ভুল হলো তা জানতে চাইলে শিশু নিজেই চোখ খুলে তা জানতে পারে। অবশ্য শিক্ষককে সচেতন থাকতে হবে যাতে শিশু রুমালের ফাঁক দিয়ে টুকরোগুলোর রং দেখে নিতে না পারে।

অনুশীলন ৯

উপকরণ—কতকগুলো ছোট ছোট নানারকম জিনিষে ভর্ত্তি কৌটো যেগুলো নাড়লে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ হয়। সাধারণতঃ ছয়টি কাঠের লাল রংএর আর ছয়টি নীল রংএর কৌটো, বালি, পাথরের কুচি ইত্যাদি টুকরো টুকরো উপাদান দিয়ে ভর্ত্তি করা হয়।

লক্ষ্য—শিশুর শ্রবণশক্তি বাড়ান ও নানা রকম শব্দের তারতম্য বুঝতে সহায়তা করা।

কোন্ বয়সে এই শিক্ষা দেওয়া উচিত ঃ আড়াই হইতে তিন বছর পর্য্যন্ত।

উপস্থাপন—কাঠের কৌটোগুলো টেবিলে বা কার্পেটের ওপর রাখতে হবে। এবার কৌটোগুলো নেড়ে কোন্টা থেকে কি শব্দ পাওয়া যায় তা শুনতে হবে। তারপর যে কৌটোটায় সবচেয়ে মিহি শব্দ আর যেটাতে মোটা শব্দ—এ দুটোর

মধ্যে পার্থক্য বোঝান আগেই দরকার, কারণ এ তুটোর পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। তারপর একে একে অন্য কয়েকটি কৌটো নেড়ে প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের পার্থক্য লক্ষ্য করতে হবে। এইভাবে লাল ও নীল তুই রকমের কৌটোর মধ্যে যে মিল আছে তা নজরে আনতে হবে। অর্থাৎ একটি লাল ও একটি নীল কৌটোর যাতে একই রকম শব্দ হয় সেইভাবে ওগুলোকে তৈরী করা হয়েছে। ক্রমশঃ কার জোড়া কোন্‌টা—এটা বেছে নেবার পক্ষে কাণ সজাগ হবে। অবশ্য প্রথমে শব্দের তারতম্য অনুসারে কৌটোগুলোকে একটা ক্রম বজায় রেখে সাজাতে হবে ও তারপর এই জোড়া বাছবার চেষ্টা করতে হবে।

যখন এই শিশু এই বিষয়ে আগ্রহ দেখাবে ও নিজেই সেগুলো সাজাবার চেষ্টা করবে, তখন শিশুর চোখ বেঁধে দিয়ে তাকে এই কাজে উৎসাহিত করতে হবে। ক্রম অনুসারে সাজানর চেয়ে জোড়া বাছার কাজ বোধহয় কঠিন, সেজন্যে খুব ধীরে ধীরে এই কাজে শিশুকে সহায়তা করতে হবে।

অভিযোজন—এই কাজের সঙ্গে সঙ্গে যাতে শিশু মন দিয়ে তারতম্যের কথা বুঝতে পারে ও অনুভব করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাড়াহুড়া করে অযথা শিশুর কাজের মধ্যে হস্তক্ষেপ করলে কাজের উদ্দেশ্যটি পণ্ড করে দেওয়া হবে। তাই শিক্ষককে সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য নিয়ে নির্দ্দিষ্ট পথে শিশুকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

মন্তব্য—এই কাজটিকে মজার করে তুলতে হলে আরও নানারকম খেলার আমদানী করা যায়। যেমন চোখ বেঁধে দিয়ে ঘরের এক কোণ থেকে একটা শব্দ করে শিশুকে আর এক কোণ থেকে অনুরূপ একটি শব্দের বাক্স খুঁজে নিয়ে আসতে বলতে হবে। এইভাবে নিত্যনূতন খেলার মাধ্যমে অনুশীলনটিকে বৈচিত্র্যময় করে তোলা যায়।

অনুশীলন ১০

উপকরণ—ছত্রিশ রকমের নানা আকারের টিনের চাকতি কিংবা কাঠের টুকরো। এই উপাদানগুলোকে রাখবার জন্যে কয়েকটি "ড্রয়ার" আছে। চাকতি বা কাঠের টুকরোগুলোর উপরে একটা করে ধরবার হাতল আছে। আর সেগুলোকে রাখবার জন্যে ঠিক ঠিক মাপের অল্প গর্ত্ত আছে। এই গর্ত্তগুলিতে ঠিকভাবে রাখতে পারলে এই জিনিষগুলো ঠিক খাপ খেয়ে যায়। সাধারণতঃ

ছয়টি ড্রয়ার আছে। প্রথম ড্রয়ারে নানা আকারের ছয়টি টিনের চাকতি বা কাঠের টুকরো রাখা হয়। দ্বিতীয় ড্রয়ারে ছয়টি নানা আকারের পলিগান (Polygones, পঞ্চভুজ), তৃতীয়টিতে ছয়টি নানা আকারের বৃত্ত, চতুর্থটিতে ছয়টি চতুর্ভুজ, পঞ্চমটিতে ছয়টি ত্রিভুজ এবং ষষ্ঠটিতে ডিম্বাকৃতি ফুলের মত আকার বিশিষ্ট ও এমনি আরও নানা আকারের টিনের চাকতি আছে।

লক্ষ্য—(ক) আকারের বৈচিত্র্যের দিকে শিশুর দৃষ্টিকে সজাগ করা।
(খ) শিশুকে ক্রমশঃ লিপিশিক্ষার উপযোগী করে তোলা।

কোন্ বয়সে এই শিক্ষা দেওয়া উচিত : সাড়ে তিন হইতে ছয় বছর পর্য্যন্ত।

উপস্থাপন—প্রথমে শিশুর সামনে একটি ত্রিভুজ, একটি বৃত্ত ও আর একটি বর্গাকৃতি চাকতি রাখতে হবে। একে একে প্রত্যেকের হাতল বাঁ হাতে ধরে ডান হাত দিয়ে চাকতিটির চারিপাশে হাত বুলাতে হবে ও তার আকৃতিটিকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

যখন শিশুর নানা আকৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হবে তখন গর্ত্তের বদলে নীল কাগজের তৈরী জিনিষ ও কালি দিয়ে আঁকা কয়েকটি ঘরের ওপর চাকতিগুলি রাখতে হবে। আগের মত মাত্র তিনটি বিশিষ্ট আকারের ওপর শিশুর ধারণা স্পষ্ট করবার চেষ্টা করতে হবে। তারপর এই রকম জিনিষের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়ে দিয়ে শিশুকে সপ্রতিভ করে তুলতে হবে। যখন শিশু চাকতিগুলো নীল কাগজগুলোর ওপর ঠিকভাবে রাখতে পারবে তখন তাকে কালি দিয়ে আঁকা ঘরগুলোর উপর চাকতিগুলো রাখতে বলতে হবে। যখন এই কাজেও দক্ষতা অর্জ্জন করবে, তখন আরও সরু লাইন দিয়ে ঘেরা ঘরগুলোর ওপর তাকে চাকতিগুলো রাখতে বলতে হবে। ক্রমশঃই সহজ থেকে কঠিনের দিকে শিশুর এই অভিযানকে উৎসাহিত করতে হবে। প্রথমে যখন শিশু চাকতিগুলোকে গর্ত্তের ওপর রাখছিল, তখন সে তার দুটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্য পাচ্ছিল। একটা দৃষ্টি ও আর একটা স্পর্শ। কিন্তু শেষে সে কেবল দর্শনেন্দ্রিয় দিয়ে স্থান ও জিনিষটির আকার মিলিয়ে রাখছিল। ঘন পদার্থ থেকে রেখার ধারণা শিশুকে নূতন উৎসাহ যোগায় ও তাকে লিখবার পথে সাহায্য করে।

অভিযোজন—প্রত্যেকটি স্তরের মধ্যে বেশ খানিকটা সময় শিশুকে দেবার দরকার। স্বভাবতঃই শিশু কঠিন কাজে নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে কিন্তু তা

বলে শিক্ষকের উদ্দীপনার অভাব থাকলে চলবে না। একে একে তাকে সমস্যা সমাধানের পথে সহায়তা করাই হবে শিক্ষকের প্রধান কাজ। রেখা সম্পর্কে ধারণা শিশুর কাছে সহজ না হলে রেখাকে এক একটি "প্রতীক" দিয়ে বুঝতে শিশুর মজাই লাগে।

মন্তব্য—এখানে যা কিছু ভুলভ্রান্তি ঘটবে তা ধরা পড়বে তার দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে। অবশ্য প্রথম দিকে দর্শনেন্দ্রিয় ছাড়াও স্পর্শেন্দ্রিয় সাহায্য করেছিল কিন্তু ক্রমশঃই তার অনুভূতি ও দৃষ্টি তাকে শিক্ষার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে।

অনুশীলন ১১

উপকরণ—তিনটি ড্রয়ারওয়ালা বাক্স এবং এক একটি ড্রয়ারে এক এক আকৃতির কার্ড বা কাগজের টুকরো। এই কাগজের টুকরোগুলো তিন রকমের। যেগুলো প্রথম রকমের সেগুলোর চারপাশ সূক্ষ্ম রেখার দ্বারা অঙ্কিত। যেগুলো দ্বিতীয় রকমের সেগুলো মোটা রেখা দিয়ে ঘেরা। আর যেগুলো তৃতীয় রকমের সেগুলো সমস্তটাই কালি দিয়ে রং করা। সাধারণতঃ নানান পাতার আকারের সঙ্গে শিশুকে পরিচিত করে দেবার জন্য ড্রয়ার-গুলোতে পত্রাকৃতি কাগজের টুকরো রাখা হয়।

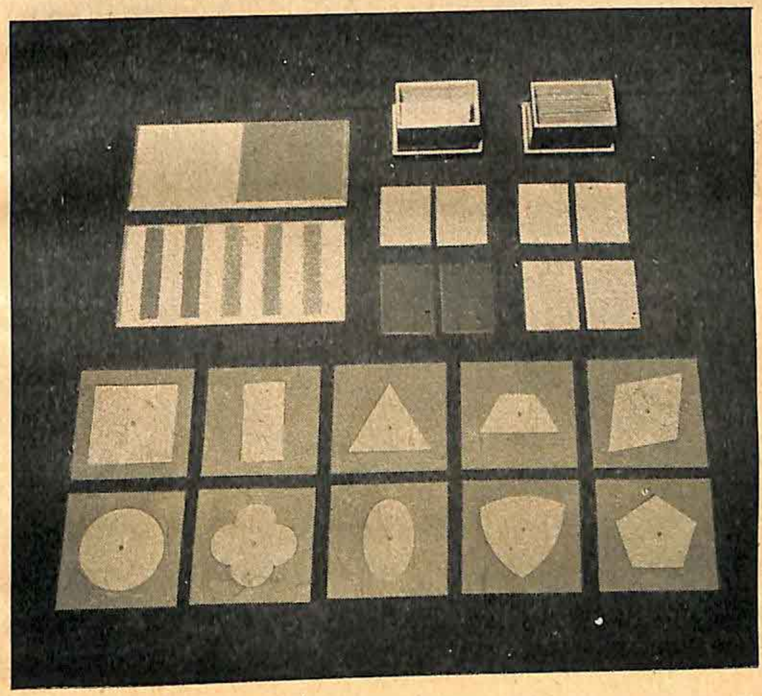
লক্ষ্য—(ক) শিশুকে হস্তলিপির জন্যে প্রস্তুত করা।

(খ) পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

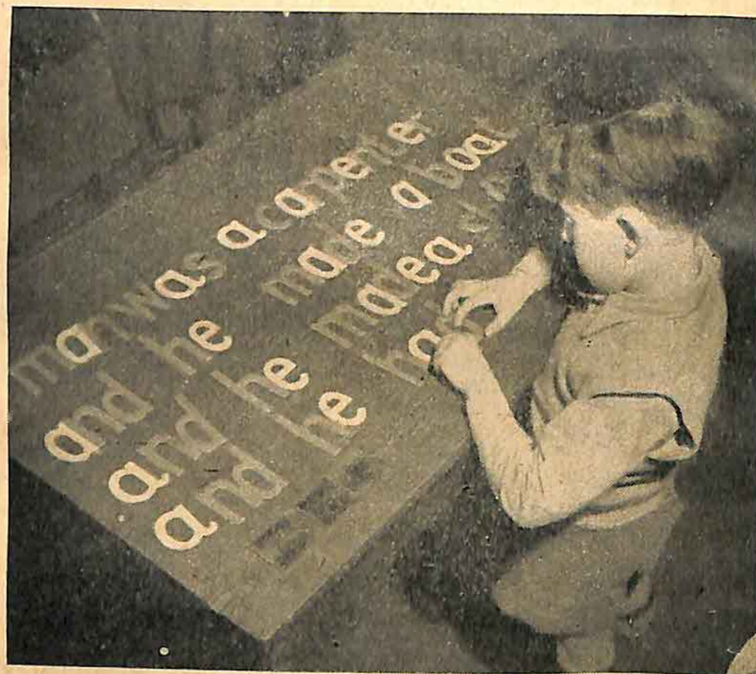
কোন্ বয়সে এই শিক্ষা দেওয়া হবে ঃ তিন থেকে পাঁচ বছর পর্য্যন্ত।

উপস্থাপন ড্রয়ার থেকে একে একে পত্রাকৃতি জিনিষগুলো বার করে শিশুর সামনে দিতে হবে। তারপর টুকরোগুলোকে হাত দিয়ে একে একে ধরে সাদা কাগজের ওপর রেখে পেন্সিল দিয়ে তার চারপাশে দাগ দিতে হবে। তারপর এই প্রক্রিয়া কিছুদিন চলতে থাকবে এবং কিভাবে ঠিকভাবে পেন্সিল ধরে শিশু চাকতি বা কাগজের টুকরোর চারপাশে সূক্ষ্ম ভাবে দাগ দিতে শিখবে তার জন্য প্রস্তুতি চলবে।

অভিযোজন—বহুদিন ধরে শিশুকে এই প্রস্তুতি চালাতে হবে। শিক্ষক যদি ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেন তবে তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা বেশী। কিভাবে আঙ্গুল দিয়ে পেন্সিল ধরে বাঁ দিক থেকে ডানদিকে তা চালনা



জ্যামিতিক আকৃতি



বোর্ডের টুক্‌রো দিয়ে তৈরীকরা অক্ষরের সঙ্গে পরিচয়

করতে হবে শিক্ষক তা শিক্ষা দেবেন। কারণ এর ওপর শিশুর হাতের লেখা নির্ভর করছে।

মন্তব্য—এই অনুশীলনটি যে শিশুকে লেখা শিখতেই সহায়তা করে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে শিশু পরিবেশের সঙ্গেও পরিচিত হয়। যে আকৃতির কাগজের টুকরো নিয়ে সে তার পাশে দাগ দিতে সুরু করে, সেই আকৃতির পাতা প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করতে শিশুকে সহায়তা করতে হবে। ফলে প্রকৃতি পরিবেশ ক্রমশই শিশুর কাছে পরিচিত হয়ে উঠবে।

অনুশীলন ১২

উপকরণ—সিরিশ কাগজ দিয়ে তৈরী অক্ষর। সব অক্ষরগুলো একটা ঝুড়িতে থাকবে।

লক্ষ্য—(ক) অক্ষরগুলোর আকৃতির সঙ্গে অক্ষরগুলোর নামের যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া।

(খ) অক্ষর পরিচয়ের পথে শিশুকে সাহায্য করা।

কোন্ বয়সে এই শিক্ষা দেওয়া উচিত ঃ তিন থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত।

উপস্থাপন—শিশুর ডানপাশে বসে দুটি বিশিষ্ট আকারের অক্ষর তুলে নিয়ে দিতে হবে। সে এই অক্ষরগুলোর ওপর দুটো আঙ্গুল দিয়ে হাত বুলোতে থাকবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের নামও উচ্চারণ করবে। দুটো অক্ষরের নাম ও আকৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার পর তাকে অন্যান্য অক্ষর দিতে হবে। কিন্তু দেবার সময় দুটো দুটো করে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। যখন দুটো অক্ষর শিশুকে দেওয়া হবে, তখন শিশুকে বার বার বাঁ-দিক থেকে ডানদিকে অক্ষরগুলোর ওপর অঙ্গুলি চালনা করতে বলতে হবে ও স্পর্শ করতে বলতে হবে। কয়েকবার স্পর্শ করবার পর শিশুকে জিজ্ঞাসা করতে হবে দুটো অক্ষরের মধ্যে কোন্‌টি কি? তারপর শিশু তা বলতে পারলে তাকে আবার জিজ্ঞাসা করতে হবে কোন্ অক্ষরটির নাম কি? উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে শিশুকে প্রথমে হয়তো "অ" ও "ই" এই দুটি অক্ষর দেওয়া হলো।

খানিকক্ষণ স্পর্শ করতে দেওয়ার পর তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো কোন্‌টি "অ" আর কোন্‌টি 'ই"; তারপর তার হাতে একটি অক্ষরকে তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করা হলো—এটি কোন্ অক্ষর। এইভাবে প্রশ্নোত্তরের

মধ্য দিয়ে শিশু ক্রমশঃ সব অক্ষরগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠবে ও বাঁ-দিক থেকে ডানদিকে অঙ্গুলি চালনা করবার অভ্যাসের দরুণ লিপিশিক্ষার দিকেও এগিয়ে যাবে।

অভিযোজন—শিশু অক্ষরগুলো নিয়ে ঘরের চারিদিকে ছড়িয়ে রাখবে। তারপর তাকে এক একটি অক্ষরের নাম করে খুঁজে আনতে বলতে হবে। এইভাবে সে কৌতূহলের সঙ্গে সঙ্গেই একে একে সব অক্ষরই সাজিতে ভরবার চেষ্টা করবে। যখন নাম ধরে অক্ষরগুলোকে শিক্ষক উচ্চারণ করবেন, তখন সেই নামগুলো মনে রেখে ঘরের কোণ থেকে বা এদিক্ ওদিক্ থেকে ঐ নামের অক্ষরগুলি খুঁজে আনতে থাকবে। ফলে তার স্মৃতিশক্তিরও চালনা হবে। শিশু যখন এই কাজ করতে থাকবে তখন শিক্ষককে দেখতে হবে সে যেন কোন ভুল না করে বসে।

মন্তব্য—শিশু কোন ভুল করল কিনা তা ধরা পড়বে দুই ভাবে। প্রথমতঃ সিরিশ কাগজের ওপর যখন সে হাত বুলাতে থাকবে, তখন স্পর্শেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আকৃতি ও নামের মধ্যে যোগাযোগটি শিশুর মনে বদ্ধমূল ধারণাই শিশুর ভুল সংশোধনে সহায়তা করবে। একে ইংরাজীতে বলা হয় Muscular memory.

পঠন

কয়েকটি সাঙ্কেতিক চিহ্নকে কেন্দ্র করে ও সেগুলোকে উচ্চারণ করে যখন একটি ভাব আহরণের চেষ্টা করা হয়, তখন পঠনই হয় একমাত্র সহায়। চিহ্ন থেকে ভাবের রাজ্যে পৌছান এই পাঠের কল্যাণেই সাধিত হয়। অনেকের ধারণা যে লেখার থেকে পড়া বোধ হয় সহজ, কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। কারণ লিখবার মধ্যে কেবল শিশুকে নামের সঙ্গে আকারের যোগাযোগ সাধন করতে হয়। কিন্তু পঠনের ব্যাপারে আকার, নাম ও বিশিষ্ট উচ্চারণ এই তিনটির মধ্যে যোগাযোগ সাধন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেজন্য পাঠের আগেই লেখার পালা স্থুরু হওয়া উচিত। এর তিনটি ক্রম আছে, সেগুলো যথাক্রমে—১। বিন্যাস ; ২। শব্দ-পরিচিতি ; ৩। বাক্যগঠন।

যখন শিশু একে একে এই তিনটি পর্য্যায় বা স্তর অতিক্রম করে তখনি স্থুরু হয় তার সত্যকারের পড়াশুনা।

বিন্যাস—অক্ষরগুলো ছড়ানো থাকলে সেগুলো কি ভাবে এক একটি শব্দ গঠনের কাজে লাগে এই বোধ হ'ল বিন্যাসের কাজ। এই বিন্যাস শিশুর পক্ষে প্রথম স্তরে কঠিন হলেও পরে সে এতে আনন্দ পায়।

শব্দ-পরিচিতি—অক্ষর বিন্যাসের পালা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয় শব্দ গঠনের পালা। এই শব্দ গঠন করবার জন্যে শিশুর অপরিসীম আগ্রহ দেখা যায়।

বাক্য গঠন—অক্ষর থেকে শব্দে ও শব্দ থেকে বাক্যে যাবার মধ্যে শিশু বেশ কৌতূহল অনুভব করে। এই কৌতূহলই তাকে নিত্য নূতন পরিচয়ের পথে সহায়তা করে। মসীলিপির মধ্যে যে অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার লুকিয়ে আছে তা যখন শিশুর সামনে উদ্ঘাটিত হয়, তখন সে একে একে জগতের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে।

অনুশীলন ১৩

ভুমিকা—শিশুর পঠন নানাভাবে সুরু হতে পারে, এবং সেই কাজের সহায়তা করবার জন্যে নানা প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন হয়েছে। আগেই বলেছি, শিশুর পক্ষে পড়া থেকে লেখা সহজ। সেজন্য পঠন একটু দেরীতেই সুরু করা উচিত। যাতে শিশুর এই কাজ সহজ হতে পারে সেজন্যে খেলার ছলে শিশুর অক্ষর-পরিচিতি হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

উপকরণ—একটি ঢাকনা দেওয়া কাঠের বাক্স। বাক্সটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে প্রত্যেকটি ঘরে এক একটি অক্ষর অনেকগুলো করে রাখা আছে। সাধারণতঃ স্বরবর্ণগুলো নীল রং-এর এবং ব্যঞ্জনবর্ণগুলো লাল রং-এর।

লক্ষ্য—(ক) লিখিবার জন্যে শিশুকে প্রস্তুত করা। (খ) পঠনের পথে শিশুকে সহায়তা করা।

কোন্ বয়সে এই শিক্ষা দেওয়া উচিতঃ সাধারণতঃ তিন থেকে পাঁচ বছর পর্য্যন্ত।

উপস্থাপন—বাক্সটি কার্পেট বা মাদুরের ওপর রেখে প্রথমেই শিশুকে খুলতে বলতে হবে। তারপর তাকে নাম করে এক একটি অক্ষর বাক্স থেকে দিতে বলতে হবে। যেমন—"আচ্ছা 'ঙ' অক্ষরটি দাও তো!" এমনি করে শিশুর কৌতূহল বাড়িয়ে দিতে হবে। শিশুকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে

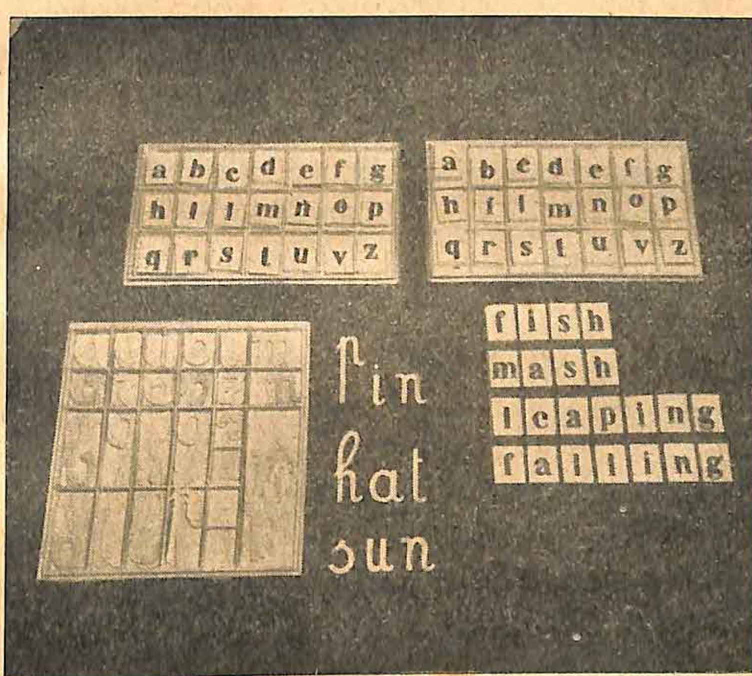
অক্ষরগুলি বাক্সটির বিভিন্ন ঘরে ছড়ান আছে। একে একে তার নজরে পড়বে যে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলোর মধ্যে রং-এর তফাৎ আছে। যখন সে বুঝতে পারবে, তখন তাকে নানা ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে। যেমন, আচ্ছা বলতো চপল কথাটির প্রথম অক্ষর কি? শিশু যদি ঠিকমত বলতে পারে, তবে সেই অক্ষরটি তাকে বাক্স থেকে বার করে নিতে বলতে হবে। তারপর "চপল" কথাটির মধ্যে আর কি অক্ষর আছে অর্থাৎ আর কি কি অক্ষর যোগ করলে "চপল" কথাটি পূর্ণ হয়, শিশুর কাছ থেকে তা জেনে নিতে হবে ও সেই সেই অক্ষর তার কাছ থেকে আদায় করে নিতে হবে। তারপর যখন সে অক্ষরগুলো তুলে কার্পেটের ওপর সাজাবে তখন গোড়াতেই তাকে অক্ষর সমষ্টির মধ্যে প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা করে উচ্চারণ করতে বলতে হবে। এমনি আরও অনেক শব্দ শিশুকে দিয়ে তার কাছ থেকে তার উত্তর আদায় করে নিতে হবে। হাতে-কলমে শিশুর এই শিক্ষা তাকে কেবল অক্ষর বিন্যাসই শেখাবে না, তাকে নতুন নতুন শব্দের সঙ্গে পরিচিত করে তুলবে। এই সঙ্গে সে পড়বার প্রথম স্তরে এসে পৌঁছাবে।

শিশুর যাতে আগ্রহ বেড়ে ওঠে সেজন্যে আরও নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করা যায়। যেমন একটি বাক্সের মধ্যে অনেক রকম ছোট ছোট খেলনা বা ছবি থাকবে ও আর একটি বাক্সের মধ্যে অক্ষরগুলো থাকবে। সেই এক একটি খেলনা তুলে নিয়ে সেগুলো দেখে তাদের নাম অনুযায়ী অক্ষর সাজাবে। অক্ষর দিয়ে এমনি ভাবে সে শব্দ গঠন করতে শিখবে এবং অক্ষরগুলোর আলাদা আলাদা উচ্চারণ করতে শিখবে। ছবির সাহায্যেও এই কাজ শিশুর পক্ষে আনন্দের হয়ে উঠতে পারে।

ক্রমশঃ অক্ষরগুলোর সঙ্গে ও শব্দ গঠনের লিপির সঙ্গে যখন শিশুর মোটামুটি পরিচয় হবে তখন সে লেখার জন্যে আগ্রহ জানাবে।

অভিযোজন—স্বভাবতঃই শিশুর অনেক ভুলভ্রান্তি ঘটবে। অনেক সময় তাকে অক্ষরগুলো নিয়ে এলোমেলোভাবে খেলা করতে দেখা যাবে। কিন্তু তবুও শিক্ষকের ধৈর্য্য অবলম্বন করে শিশুকে ঠিক পথের নির্দ্দেশ দিতে হবে। একটি জিনিষ ভুল হলে বার বার অনুশীলনের দ্বারা তাকে সংশোধন করবার সুযোগ দিতে হবে।

মন্তব্য—পঠন ও লিখন না হলে শিশুর জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করা একেবারেই অসম্ভব। তাই বেশ কিছু সময় না দিলে ভিত্তি অনেক সময় কাঁচা হয়ে যায়।



বোর্ডের তৈরী অক্ষর দিয়ে শব্দ বানান

ভাষা শিক্ষা :—পঠন ও লিখন খানিকটা আয়ত্ত হবার পর সুরু হয় শিশুর ভাষা শিক্ষা। বহু দিন কেটে যায় শিশুকে বর্ণমালা শেখাতে। একে একে বর্ণ থেকে বাক্যের দিকে অগ্রগতিই ছিল আগেকার শিক্ষা-পদ্ধতি। কিন্তু আজ দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টে গেছে। তাই শিশুর আগ্রহকে কেন্দ্র করেই ভাষা শিক্ষা দেবার পথ প্রশস্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। শৈশবে ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে আত্মপ্রকাশের সময় বৃদ্ধি করা। সহজ ও সরলভাষায় কথা বলতে উৎসাহিত করা, তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে গল্প বলতে বলা বা ছোট ছোট ছড়া আবৃত্তি করার মধ্যে দিয়ে শিশুর ভাষা শিক্ষা সার্থক হয়ে ওঠে। শিশুর বাস্তব জীবনের সঙ্গে পরিচিতিকে ঘিরে কল্পনা রাজ্যের সন্ধান দেওয়া ভাষা শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

মন্তেসরী পদ্ধতির কয়েকটি ত্রুটি :

১। আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও নির্দ্দিষ্ট উপকরণের বৈচিত্র্য খুব বেশী না থাকার জন্যে বিভিন্ন রূপের কর্ম্মসম্ভাবনা কম।

২। উপকরণকে বাদ দিলে শিশুর স্বাধীন কাজের অবকাশ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে। কারণ এগুলি ছাড়া তার কাজ বা খেলার বিশেষ সুযোগ নেই বললেই হয়।

৩। যে সব উপকরণ স্বয়ংশিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছে সেগুলিও সম্পূর্ণ ত্রুটি-মুক্ত নয়। কারণ এই উপকরণগুলি বেশীক্ষণ শিশুর মনকে আকর্ষণ করতে পারে না।

৪। ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে শিক্ষা সহজ হলেও তার ওপর বেশী জোর দেওয়ার ফলে শিক্ষাপদ্ধতি শিশুর কল্পনা-শক্তি বিকাশের সুযোগকে কমিয়ে দিয়েছে।

৫। শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে উপকরণগুলি এত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী যেন গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৬। শিশুদের লেখাপড়া শেখবার সময়টিকে মণ্টেসরি অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছেন। ফলে শৈশবের সাধ ও খেয়াল অনেকখানি অপূর্ণই থেকে যায়। বাঁধা খাতে শিশুর সব কিছুকে নিয়ন্ত্রিত করতে গিয়ে তিনি হয়তো অজ্ঞাতসারে শিশুর প্রতি খানিকটা অবিচারই করেছেন।

সপ্তম অধ্যায়

নার্সারী স্কুলে শিশুর জীবন

নার্সারি কথাটির মধ্যেই পালনের অর্থ লুকিয়ে আছে। তাই নার্সারী স্কুল ও তার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও ইঙ্গিত কথাটির মাঝে থেকেই খুঁজে পাওয়া যায়। মায়ের কোলে গৃহ-পরিবেশে শিশু প্রথম-শৈশব কাটায়; হঠাৎ গৃহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে বিদ্যা-শিক্ষার জন্যে কোথাও পাঠাতে হলে তার কষ্টই হয়। তাই আগের দিনে শিশুর এই মনের দিকে না তাকিয়ে তাকে গুরুগৃহে পাঠান হত। পাঠশালায় গিয়ে সে বড় অর্থহীন নীরস শব্দের তালিকা মুখস্ত করত। অনেক সময় শিশুমন ঘর ছাড়া হয়ে দূরান্তের আঁকা-বাঁকা পথে চলে যেত। শিশুর প্রতি এই অবিচারের দিকে যখন শিক্ষাবিদ্‌দের দৃষ্টি ফিরল, তখনি প্রতিষ্ঠা হল বিভিন্ন শিশুতীর্থের, নার্সারি স্কুল যার মধ্যে অন্যতম। এই সব শিশু-নিকেতনে গৃহ-পরিবেশ খানিকটা বজায় রেখে শিশুকে এক সঙ্গে পালন করা ও শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, তাই নার্সারি স্কুলের দায়িত্ব কেবল শিক্ষাদানের মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট নয়; শিশুর পরিপোষণ ও পালন এর অন্যতম দায়িত্ব। ভাবী জীবনের পথে শিশুকে একে একে এগিয়ে দেওয়াই তার কর্ত্তব্য।

নার্সারী স্কুলের উদ্দেশ্য

শিশুকে ঘিরেই এই বিদ্যালয়, তাই তার দেহ, মন, অভ্যাস, চরিত্র সবকিছুকেই সুষ্ঠু সবল করে তোলার ব্রত নিয়ে এই বাণী মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। তাই নার্সারি স্কুলে শিশুকে তার সবরকম প্রয়োজন বুঝে বিকাশের পথে সহায়তা করা হয়। শিশুর নিরাপত্তা বোধ, সাফল্য, আত্মপ্রত্যয় যাতে ব্যাহত না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। সাধারণতঃ তিনবছর থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিশুদের নার্সারি স্কুলে ভর্ত্তি করা হয়।

তিন-চার বছরের শিশু—এই বয়সে শিশুরা সাধারণতঃ আড়াই ফুট থেকে তিন ফুট লম্বা হয়, তাদের ওজন পঁচিশ থেকে চল্লিশ পাউণ্ড হয়। শিশুর দুধে দাঁতগুলি ঝক্ ঝক্ করতে থাকে, তাদের মাংসপেশীর ওপর খানিকটা দখল আসে, নিজেরাই ছুটাছুটি করতে পারে ও অন্য কারও সাহায্য না নিয়ে লাফ

ঝাঁপ করতে পারে, এমন কি একটু সাহায্য নিলেই জামা পরতে বা খুলতে পারে ও পেন্সিল ধরে ঢেঁড়া কাটতে বা গোল আঁকতে পারে।

শিশুর মনের বিকাশ তিন বছর বয়সেই স্পষ্টরূপে ধরা দেয়। ছবি দেখে সে আনন্দ পায়, গল্প ও ছড়া শুনতে ভালবাসে, নানা রকম কৌতূহল তাদের জাগে। নানারূপ খেলা, অভিনয় তাদের প্রিয় হয়ে ওঠে। অনেক সময় তাদের কল্পনাপ্রবণ মন অনেক কিছু অনুকরণ করতে শেখে, মনে নানাভাবের উদয় হয়; কখনও অকারণ ভয়, কখনও বিরক্তি, কখনও হাসি, কখনও কান্না, তাদের আচরণকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে।

পাঁচ বছরের শিশু—দেহের ও মনের বিকাশ এই বয়সে আরও স্পষ্ট ধরা দেয়। কয়েকটি মানসিক বৈশিষ্ট্য এই বয়সে বিশেষ লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

কর্ম্মপ্রবণতা ও চাঞ্চল্য—শিশু সব সময়েই কিছু না কিছু করতে চায়। অন্তর থেকে একটা প্রাণের তাগিদ তার দিনটিকে কর্ম্মমুখর করে তুলতে চায়। কল্পনাপ্রিয়তা শিশুর এই বয়সেই একটা নিজস্ব জগৎ গড়ে তুলতে চায়। সে জগৎ স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা ও কল্পনার রঙে রঙ্গিন। এই কল্পনাই ক্রমশঃ শিশুকে পরবর্ত্তী জীবনে শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব—শিশু এই বয়সে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর হয়। সব কিছুকেই আঁকড়ে রাখার এক তুর্দ্দম প্রবৃত্তি তাকে পেয়ে বসে; তাই শিশুরা প্রায়ই এই বয়সে একলা খেলা করতে ভালবাসে ও অপরকে নিজের খেলনায় বা অন্য কোন জিনিষে হাত দিতে দেয় না।

অনুকরণপ্রিয়তা—শিশুর মন এই সময় এতই অনুকরণপ্রিয় হয় যে সে যা দেখে যা শুনে তাকেই অনুকরণ করতে চায়। এই অনুকরণপ্রিয়তা অনেক সময় তাকে শিক্ষার পথেও এগিয়ে দেয়।

তিন থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্য্যন্ত শিশুর দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে ছোট ছোট শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই নার্সারি স্কুলে যাতে শিক্ষা ব্যবস্থার সাফল্য আসে, সেজন্যে কয়েকটি জিনিষের উপর নির্ভর করতে হয়।

১। প্রত্যেক শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ।

২। শিক্ষার গতি।

৩। শিক্ষা ধারায় অবিচ্ছিন্নতা।

৪। শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ সম্বন্ধে জ্ঞান।

নার্সারী স্কুলে শিশুর শিক্ষা

নার্সারি স্কুলে শিশুর জিনিষ-পত্র সবই শিশুর জন্যে বিশেষভাবে তৈরী, একটি আনন্দময় পরিবেশ এই বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য। যতক্ষণ শিশু এই স্কুলে থাকে ততক্ষণ সে এমন একটি পরিবেশ পায় যেখানে স্বার্থের সংঘাত নেই ; শিশু বসে মাটীতে আসন পাতে, ইচ্ছামত নড়াচড়া করে। হাতে নাগালের মধ্যে যেসব খেলার জিনিষপত্র থাকে তা নিয়ে সে খেলতে সুরু করে। তার খেলার সাথী হন শিক্ষয়িত্রী। প্রয়োজন হলে শিক্ষয়িত্রী শিশুকে সাহায্য করেন। এই সব স্কুলে সে খেলার জিনিষ পায় প্রচুর—মাটি, বালি, রং তুলি এই সব নিয়ে সে কখনও খেয়াল মত ছবি আঁকে, কখনও বা কোন কিছু গড়তে চেষ্টা করে। এইভাবে তার অন্তর্নিহিত সৃজনী শক্তি ফুটে উঠে। নার্সারি স্কুলে শিশুদের জন্যে আলাদা আলাদা ছোট আলমারি থাকে, তার মধ্যে তার নিজস্ব অনেক জিনিষ সে গুছিয়ে রাখতে পারে। এইভাবে দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষমতা জাগিয়ে দেবার সুযোগ দেওয়া হয়। স্কুলের সব শিশুরাই তার সঙ্গী হয়। সবাই মিলেমিশে খেলা করতে পারে। মোট কথা একটি নার্সারি স্কুলে শিশুর স্বাধীনতা ও অবকাশ যথেষ্ট। স্কুলের চারিপাশে শ্রেণীতে নানা ছবি, মডেল ও খেলনার প্রাচুর্য্য, অনেক সময় এক একটি ছবির ফ্রেমে রোজই ছবি পালিশ হয় এবং রোজই সেই ছবির সাহায্যে নানা বিষয়ের গল্প ও আলোচনার অবতারণা করা হয়। কাজ ও খেলাকে কেন্দ্র করে শিক্ষয়িত্রী নানারকম হাতের কাজ ও খেলা দেন। খেলার জিনিষগুলি আগে থাকতেই সাজান থাকে।

হাতের কাজ ও খেলাই এই শিশুশিক্ষার প্রধান মাধ্যম।

শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধান ও সযত্ন দৃষ্টি শিশুকে সর্ব্বদাই পরিপুষ্টির পথে সহায়তা করে। কখনও শিক্ষয়িত্রী তাকে আদর করেন, কোলে নেন, কখনও ঘুম পাড়ান, শিশুর অসংখ্য আবদার সহ্য করেন। মোট কথা এই স্কুলের শিক্ষয়িত্রী একধারে পরিচারিকা ও জননীর স্থান অধিকার করেন। এককথায় বলতে গেলে এক একটি নার্সারি বিদ্যালয় যেন শৈশবের লীলাভূমি।

অষ্টম অধ্যায়

পিছিয়ে পড়া শিশু

অনেক অভিভাবক ও শিক্ষকের কাছেই পিছিয়ে পড়া শিশু এক সমস্যা। কেবল লেখাপড়াতেই নয়, জীবনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেও অনেককে পিছিয়ে পড়তে দেখা যায়। কেউ বা সমাজে, কেউ বা বুদ্ধিবৃত্তিতে, কেউ বা কোন বিষয়ে পিছিয়ে পড়ে।

এই পিছিয়ে-পড়া তা হ'লে নানা রকমের হতে পারে—আর এর কারণও একটি নয়। বার্টের মতে, এটি একটি জটিল অবস্থার প্রকাশ ও ফলে তার কারণও বিভিন্ন।

ব্যক্তিগত পার্থক্য শৈশব থেকেই লক্ষ্য করা যায়। কেউ অধ্যবসায়ী, কেউ নয়, কেউ সাহসী, কেউ ভীরু, কেউ উৎসাহী, কেউ বা উদাসীন। শিশুদের মধ্যে এই বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেলেও মোটামুটি সকলেই পরিবেশ অনুযায়ী খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করে। কয়েকজন বা চঞ্চল ও স্থৈর্য্যহীন। এই পিছিয়ে পড়া শিশুর দল অনুপাতে সংখ্যায় কিছু কম হলেও এদের নিয়ে সমস্যা বড় প্রবল।

তবে সাধারণতঃ যে সব ছেলেমেয়ে লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়েছে, তাদের মধ্যে নীচের কয়েকটি লক্ষণ দেখা যায়ঃ—

(ক) মনোনিবেশ করার শক্তির দৈন্য।
(খ) কোন বিশেষ পরিবেশে ঠিকমত সাড়া দিতে বিলম্ব।
(গ) কোন কিছু বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধ শক্তি।
(ঘ) বিশেষ থেকে সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌছাবার অক্ষমতা।
(ঙ) ভাব ও ভাষার মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তুলবার ক্ষমতার অভাব।
(চ) নূতন পরিবেশে পরিচিতকে হারিয়ে ফেলবার প্রকৃতি।
(ছ) কোন কিছু শিখতে অসম্ভব দেরী করা ও তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়া ইত্যাদি।

এছাড়াও শিশুর পর পর কয়েকটি পরীক্ষার ফল দেখলেও বোঝা যায় শিশু কোন্ বিষয়ে পিছিয়ে আছে। যদি দেখা যায় যে কোন শিশু সব বিষয়েই

পিছিয়ে পড়েছে, তাহলে তার বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এ ছাড়াও বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার সার্থকতা আছে। পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েকে সাহায্য করতে হলে কি কারণে সে পিছিয়ে পড়েছে তার কারণ বিশ্লেষণের প্রয়োজন। নানা কারণে এই সমস্যার উদ্ভব হতে পারে—

(১) বুদ্ধিহীনতা।

(২) বিষয়ানুরাগের অভাব।

(৩) কোন বিশেষ ব্যক্তিত্বের উপাদানের অভাব—যথা, অধ্যবসায়হীনতা, আত্মপ্রত্যয়ের অভাব।

(৪) বিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি।

(৫) শারীরিক অসুস্থতা ও বৈক্লব্য।

তাই কোন সমাধান খুঁজবার আগে মূল কারণগুলি বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে ও যথাসম্ভব তার প্রতীকার করতে হবে।

যদি দেখা যায় যে কোন জন্মগত বুদ্ধিহীনতা বা মানসিক ও দৈহিক বৈক্লব্য এর জন্যে দায়ী, তবে এর সমাধান সাধারণ বিদ্যালয়ে সাধারণভাবে সম্ভবপর নয়। বিশেষ কোন বিদ্যালয়ে যেখানে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা আছে সেখানে এই সমস্যার আংশিক সমাধান হতে পারে। তবে সুখের বিষয় পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়ের মধ্যে এদের সংখ্যা খুবই কম।

তবে পিছিয়ে পড়ার সংখ্যা ক্রমশঃই যেন বেড়ে চ'লেছে। এর জন্যে পিতা-মাতা অভিভাবকও কম দায়ী নন। অনেক সময় তাঁরা প্রথম ভর্ত্তির সময়ে তাঁদের সন্তানদের যোগ্যতা বিবেচনা না করেই উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্ত্তি করবার জন্যে উপরোধ ও অনুরোধ করেন। ফলে ক্রমশঃ ভিত্তি দুর্ব্বল হয়ে পড়ে ও ক্রমশঃ শিশু পেছিয়ে পড়ে। তাই অভিভাবকদের কর্ত্তব্য শিশুর যোগ্যতা বুঝে অনুরূপ শ্রেণীতে ভর্ত্তি করা। তারপর বৎসরান্তে উঁচু শ্রেণীতে উঠবার সময়ও অনেক অযোগ্য শিশুকে অভিভাবকদের অনুরোধে উঠিয়ে দিতে হয়। এতে এই সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে।

আজ বিদ্যালয়ে এই সমস্যা যে প্রবল হয়ে উঠছে তার অন্যতম কারণ প্রতিকূল পরিবেশ। চারিদিকে প্রলোভন চিত্তবিক্ষেপের কারণ হয়ে উঠে। ফলে শিক্ষার্থীর পাঠানুরাগ ক্রমশঃই কমে আসে। সমাজে উজ্জ্বল আদর্শের অভাব এই বিক্ষেপের অন্যতম কারন।

কি ভাবে এর সমাধান হ'তে পারে ?

অভিভাবক ও পিতামাতার কর্ত্তব্য

বাড়ীতে শিশু যাতে পিতামাতার কাছ থেকে আদর-যত্ন পায়, তার ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশুর আবেগ উচ্ছ্বাস, কৌতুক কৌতূহলকে মর্য্যাদা না দিলে অনেক সময় তার মানসিক বৈক্লব্য দেখা দিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, শিশুকে যদি আত্মপ্রকাশের পথে বাধা দেওয়া হয় ও তার কৌতূহলী মনকে দমিয়ে দেওয়া হয়, তবে ভাবীজীবনে তার আত্মপ্রত্যয়ের অভাব দেখা দিতে পারে বা অন্য কোন বৈক্লব্য দেখা দিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, অভিভাবকদের আর একটি কাজ হবে শিশুর চাওয়া পাওয়া ও আগ্রহ আকাঙ্ক্ষার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। শিশু কোন্ কাজ করতে ভাল বাসে, কোন্‌দিকে তার স্বাভাবিক প্রবণতা, কোন কাজে সে লেগে থাকতে পারে কিনা—এসব দিকে লক্ষ্য রেখে সেই অনুযায়ী উপদেশ নির্দ্দেশ দেবারও প্রয়োজন। শিশুর সামনে সব সময়ে একটি উজ্জ্বল আদর্শ তুলে ধরতে হবে এবং তার যেদিকে প্রবণতা সেদিকে তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে হবে।

তৃতীয়তঃ শিশুকে, ছোট বলে অসম্মান করলে চলবে না। তার ব্যক্তিত্বের যোগ্য সম্মান দেওয়া প্রয়োজন। তাই প্রত্যেক অভিভাবকের কাজ হল তাকে কাজে উৎসাহ দেওয়া, নিজে তার সঙ্গে কাজে ও খেলায় যোগ দেওয়া। আর শিশু-কিশোরকে কেন্দ্র করে যে-সব সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে, তার মূল কারণ হল অভিভাবকদের উপেক্ষা।

শিশু কিশোরের সবচেয়ে বড় কাম্য হ'ল পিতামাতা অভিভাবকদের সঙ্গ ও সান্নিধ্য। তাই সেই অভাব যে কোন ভাবেই পূরণ করা দরকার। যদি অভিভাবক ও সন্তানদের মধ্যে সম্পর্ক মধুর হয় অর্থাৎ যদি মাতাপিতা ও সন্তানের মধ্যে একটি বোঝাপড়া থাকে, তবে শিশুর ব্যক্তিত্ব কখনও খর্ব্ব হতে পারে না। তাই বাড়ীতে শিশু যদি প্রসন্ন মনে অনুকূল পরিবেশে আনন্দের সঙ্গে প'ড়তে পায়, তবে তার পাঠের প্রতি অনুরাগ বেড়ে উঠবে; পাঠের বিষয়বস্তুকে গল্প, খেলা ও শিশুর রুচি অনুযায়ী উপকরণের সাহায্যে সরস ক'রে তুলবার চেষ্টা করা তাই অভিভাবক ও শিক্ষক উভয়েরই প্রয়োজন।

বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের কর্ত্তব্য

(ক) কোন শিশুকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী ভর্তি করা ও শ্রেণীতে উঠবার সময় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রধান শিক্ষকের প্রধান কর্ত্তব্য।

(খ) যারা তা সত্ত্বেও পেছিয়ে প'ড়েছে তাদের নানাভাবে পরীক্ষা করা ও কারণ নির্দ্ধারণ করা। অবশ্য এর জন্যে অভীক্ষার প্রয়োজন।

(গ) যে যে বিষয়ে পেছিয়ে আছে সে বিষয়ে শিক্ষকের বিশেষ যত্ন নেওয়া এবং বিষয়-ভেদে ছোট ছোট দলে ভাগ ক'রে প্রত্যেকের রুচি ও শক্তি অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া।

এই সব দলে বিশেষজ্ঞ শিক্ষককে প্রচুর সময় নিয়ে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে হবে। এই সব শ্রেণীতে দলগত চেষ্টার মূল্য দিতে হবে ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শ্রেণীর পাঠনকেও বৈচিত্র্যময় ও আনন্দপূর্ণ ক'রে তুলতে হবে।

শিক্ষকের সাথে অভিভাবকদের যোগাযোগ রাখা আর একটি বিশেষ প্রয়োজন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর গতিবিধি, সুবিধা অসুবিধা ও উন্নতি সম্পর্কে পাক্ষিক আলোচনা এই সমস্যার সমাধানের পথে সহায়তা করে।

এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অভীক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি ও ব্যক্তিত্বের সঠিক খবর পেতে হ'লে অভীক্ষার প্রয়োজন। তাছাড়া কোন্ শিক্ষার্থী কোন্ বিষয়ের কোন্ অংশে দুর্ব্বল তা জানতে হলেও এই উদ্দেশ্যে প্রণীত অভিক্ষার (Diagnostic Tests) প্রয়োজন। যেমন কোন শিক্ষার্থী যদি ইংরাজীতে দুর্ব্বল হয়, তবে তার দুর্ব্বলতা কি কি কারণে হ'তে পারে তা এই অভীক্ষার সাহায্যে নিরূপণ করা যায়। কারও হয়ত বর্ণাশুদ্ধি বেশী হয় ব'লেই ইংরাজীতে দুর্ব্বলতা, কারও বা বাক্যবিন্যাসে অক্ষমতার জন্যে বিষয়বস্তুর জ্ঞান কাজে লাগে না।

পরিশিষ্ট অংশে অভীক্ষা দ্রষ্টব্য।

নবম অধ্যায়

সন্তানের শিক্ষায় পিতামাতার ভুলত্রুটি

আধুনিক মনস্তত্ত্বের আলোচনা হ'তে জানা যায় যে, সন্তান পালনের নানা ত্রুটির জন্যই পরবর্ত্তী জীবনে মানুষের বহু সমস্যা, চারিত্রিক অপকর্ষ, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও মানসিক সাহসের অভাব দেখা যায়। শিশুর জীবনে পিতামাতাই প্রধান অবলম্বন, শিশুর ভবিষ্যতের জন্য তাঁরাই দায়ী। শিশুর গায়ে সামান্য আঘাত লাগলে আমরা বিচলিত হই, অথচ আমাদের সামান্য ব্যবহার শিশুর জীবনে বৃহৎ ক্ষতির কারণ হ'য়ে থাকে। পিতামাতাকে স্নেহশীল এবং সাবধান হলেই চলবে না, তাঁরা যদি মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সামান্য কয়টি সূত্র মনে না রাখেন তবে শিশু-মনের সমূহ ক্ষতিসাধন হতে পারে।

পিতামাতার বোঝা উচিত যে শিশু বয়স্ক না হলেও তার মেজাজ, অনুভূতি, আশা, ভালবাসা এবং ঘৃণার মনোভাব সব কিছুই আছে। শিশু বয়স্কের মতই সচেতন। সে বয়স্কের মত সৃষ্টি করতে চায়। কৃতকার্য্যের জন্য সে প্রশংসা চায় ও সফলতায় বেশ আনন্দ পায়। বড়দের মত সেও তার কাজের স্বীকৃতি চায়, চায় নিরাপত্তা। পিতামাতার মতন সেও আরাম চায়। বয়স্কের চোখে অনেক জিনিষ নগণ্য হ'লেও সে ঐগুলিকে খুবই মূল্যবান মনে করে। সে অকৃত-কার্য্যতাকে অপছন্দ করে। মাতাপিতা ক্রোধ দেখালে কেউ মন্দ বলে না অথচ শিশু রাগ করলে তাকে খারাপ বলা হয়। শিশুকে নিজের পছন্দমত কাজ করতে না দিলে তার কাজে পিতামাতার হস্তক্ষেপের সে প্রতিরোধ করবে। কারণ শিশু আদর্শ মানবের প্রতীক নয়, সে সাধারণ মানুষের একজন। তাই সময় সময় সে হয়ত নিষ্কর্ম্মতা, অলসতা, চিন্তাহীনতা দেখায় ও উত্তেজিত হয়।

এই কথাগুলি স্মরণ রেখে পিতামাতাকে বিবেচক, উদারহৃদয়, ক্ষমাপরায়ণ হতে হবে। তাঁরা সন্তানকে সাধারণ মানুষের মত জ্ঞান করবেন। মানুষের অনেক ভুলচুক হয়। তার ওপর এই শিশু বয়সে খুবই ছোট, দুর্ব্বল এবং অজ্ঞ। তার কতই অক্ষমতা। এই জন্যই পিতামাতার শিশুর নিকট হতে বেশী কিছু প্রত্যাশা করা ভুল।

শিশু তার হাত-পা সঞ্চালনের সামঞ্জস্য করতে শেখে নি, এজন্য সে হয়ত মন্থর-

গতি, অসাবধান। কিন্তু সে আত্মবিশ্বাসী। পিতামাতা এই আত্মবিশ্বাসকে উৎসাহ দিতে পারেন। তার এই আত্মবিশ্বাসকে ঠাট্টা, নিন্দাদ্বারা বা অন্যান্য উপায়ে দমিত করা যায়, কিন্তু এরূপ করা কখনও উচিত নয়। চলাফেরার কাজে শিশু যাতে সামঞ্জস্য বিধানে সফল হয় সেই বিষয়ে পিতামাতার সকল প্রকার খেলাধূলার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া ও অভ্যাসের সুব্যবস্থা করা উচিত। শিশু নিজের মনের আনন্দে যে খেলা বা দৌড়ঝাঁপ করে তাতে তার শরীরের শক্তির সদ্ব্যবহার হয়।

শিশুর এই সকল কাজের জন্য পিতামাতার বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়, যদিও তাদের কাছে এই কাজগুলি অর্থহীন, এমন কি কখনো কখনো ক্ষতিকর মনে হবে। এই খেলাধূলার মাধ্যমে শিরা ও পেশীতে শক্তি সঞ্চারিত হয়। সে আরও অনেক কিছু আয়ত্ত করে দেহ-মনকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। সামাজিক গুণাবলী স্ফুরণের জন্য শিশুকে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীনভাবে কাজ করতে না দিলে তার শৈশব আনন্দময় হতে পারে না। শিশু-জীবনে খেলার আবশ্যকতা স্মরণ রাখতে হবে। ছেলের কাজই খেলাধূলা। এতে তার অভিজ্ঞতা বাড়ে ও মানসিক উন্মেষের সুযোগ হয়। সে ক্রমশঃ ঠেকে শেখে। ভবিষ্যতে জগতের বাস্তবতার সম্মুখীন হওয়ার শক্তি এইখানেই সে অর্জ্জন করে। সুতরাং খেলায় পিতামাতার উৎসাহ দেওয়া উচিত। এজন্য নানা সাজসরঞ্জাম শিশুকে দিতে হবে ; যথা বালি, জল, কাঠ, কার্ডবোর্ডের বাক্স ইত্যাদি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শিশু কেবল আমোদই পাবে না। নানা অবস্থার সম্মুখীন হয়ে ব্যস্ত-সমস্ত শিশু ভবিষ্যতে সুস্থ-সুখী মানুষে পরিণত হবে।

পিতামাতার উৎসাহদানে কার্পণ্য করলে চলবে না। ঠিক সময়ে উৎসাহ দিলে হয়ত শিশুর আত্মবিশ্বাস আসবে ; আবার নিরুৎসাহ করলে চিরজীবনের মত তার মন দুর্ব্বল ও ভীরু হ'য়ে পড়বে। বার বার তুলনা করে কোন শিশুকে হেয় প্রমাণ করলে সে যে কেবল অপমানিত বোধ করে তা নয়, তার ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হয় এবং ভবিষ্যৎ জীবনের বিকাশ ব্যাহত হয়। কতটা সময়ের মধ্যে সে কি পরিমাণ উন্নতি করছে, বিশেষ করে তার উন্নতির গতি নির্ণীত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পিতামাতা যেরূপ নিজেদের কাজের সফলতার জন্য অপরের প্রশংসায় খুশী হন, শিশুও সেরূপ চায়। শিশুকে জামা পরিয়ে দিলে সে তাতে আপত্তি করে। অথচ পরতে গিয়ে সে হয়ত বার বার অকৃতকার্য্য হয়। দোকানের মূল্যবান

খেলনা ফেলে সে অনেক সময় কয়েক টুকরা কার্ডবোর্ড জুড়ে মোটর গাড়ী তৈয়ার করে আনন্দ পায়। কাজের মধ্যেই যেন শিশুর আনন্দ! কোন লোক কোন কাজ ভালভাবে না করতে পারলে সে নিরুৎসাহ এবং নিষ্ক্রিয় হ'য়ে পড়ে। হয়ত সে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হ'তে বিদায় নেয় আর কাজে উৎসাহ থাকে না। তার জীবনের বিকাশ ও স্ফুরণ বন্ধ হ'য়ে যায়। শিশুমনের বিকাশ হতে সময় লাগে। যখনই এই বিকাশে কোন বাধা আসে, তখনই তার ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ব্যাহত হয়। সকল সময়ই পিতামাতা শিশুর সকল কাজে আগ্রহ দেখাবেন ও উৎসাহ দেবেন। যখন শিশুকে নিজের প্রতি বিশ্বাস হারাতে দেখা যাবে পিতামাতা তখন তাকে নানারূপে সাহায্য করে দেখাবেন যে, সে কাজ করতে সক্ষম। শিশুর প্রত্যেক কাজে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে সে কতটা সফল হয়েছে ও আবশ্যক মত প্রশংসা করতে হবে। অবশ্য প্রশংসার বাড়াবাড়িতে যে কুফল হয় না তাও নয়।

অনেক মাতাপিতা কোন কোন মুহূর্ত্তে চরম নিষ্ঠুরতা দেখান। সকল সময়েই পিতামাতা সন্তানের প্রতি বন্ধুর মত ব্যবহার করবেন। শিশুকে হুমকি বা ভয় না দেখিয়ে আদর করেই বলা উচিত। যদি কখনও আদেশ দিতে হয় বা জোর করে কথা শোনাবার আবশ্যক হয় তখন তাকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। শিশুকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে সাবধানতার সঙ্গে রাস্তা পার হওয়া উচিত, এবং কেন তাকে বেশী পয়সা দেওয়া হয় না তাও বুঝিয়ে বলতে হবে। শিশু একটু বড় হ'লে কোন্ কোন্ কাজ করা উচিত বা অনুচিত এসব বিষয় যুক্তিদ্বারা বুঝান যেতে পারে। কিন্তু এই সকল যুক্তিতর্ক খুবই সংক্ষিপ্ত ও সহজ হওয়া প্রয়োজন। পিতামাতা যে সবসময় শিশুকে নীতিবাক্য শুনাবেন তা নয়, তবে তাঁদের একাধারে শিশুর পরিচালক, বন্ধু ও সহকর্ম্মী হতে হবে। শিশু যদি যুক্তি মেনে চলে তাকে প্রশংসা করতে হবে, আর না মানলে আব্দার পূরণ করা উচিত নয়। পিতামাতার বোঝা উচিত যে তাঁরা এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততি এক কালের লোক নয়। ভিন্ন কালের লোকেরা একভাবে চিন্তা করে না। সাময়িক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত পিতামাতা এবং শিশু উভয়ের মনের উপরই সমভাবে কার্য্যকরী। শিশুকে সকল বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে উৎসাহ দিতে হবে। তা না করতে দিলে ছেলে-মেয়েরা পিতামাতার সান্নিধ্য হতে দূরে চলে যাবে। তাঁদেরও শৈশবের কথা স্মরণ করা প্রয়োজন।

শিশুকে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে উৎসাহ দিতে হবে। জোর করে শিশুর উপর কোন ধারণা চাপাবার চেষ্টা করা ঠিক নয়। যদি সে কোন কিছু অযৌক্তিক বলে মনে করে এবং গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হয় তা হলে তাকে জোর করা উচিত নহে। স্বাধীন ভাবে চিন্তা করবার শক্তি এবং মানসিক সম্পদ এই ভাবেই বিকশিত হবে।

শিশুরা সময় সময় খুব অসুবিধায় পড়ে। ফলে স্নেহশীল মাতাপিতা সাহায্য করতে ছুটে যান। পিতামাতা কি আশা করেন যে সকল আপদে-বিপদে সন্তানেরা চিরদিন তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকবে? তাঁরা কি চান না যে তাঁদের ছেলেমেয়েরা সুস্থ সবল পরিণত মানুষ হয়? যদি পরবর্তী জীবনে তাঁরা সন্তানকে ভবিষ্যৎ আপদ-বিপদে শক্ত-সমর্থ দেখতে চান, তবে তাঁদের অতিরিক্ত সাবধানতা বর্জ্জন করতে হবে। শিশু নিজের চেষ্টায় বিপদ এড়িয়ে চলবে। এতে তার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। যখন সে বিপদ অতিক্রম করতে অসমর্থ দেখা যাবে, তখন সফলতার পথ বলে দিতে হবে। একটু সাহায্য পাবার পর যাতে সে নিজের ক্ষমতায় চলতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। কোন কোন গৃহস্থ মনে করেন যে, ছেলেমেয়েকে যথেষ্ট খেলাধূলার স্বাধীনতা দিলে ফুলের বাগান এবং বাসগৃহের সৌন্দর্য্য নষ্ট হবে। তাঁকে দেখতে হবে যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাড়ী ও বাগান এবং আত্মবিশ্বাসী ছেলেমেয়ে এই দুইটির কোন্‌টি তাঁহার কাম্য।

'এটা করবে না' 'ওটা করবে না'—এরূপ ঘন ঘন নির্দ্দেশ দিলে শিশুরা এরূপ আদেশের কোন গুরুত্বই দেয় না। কি 'করবে না'র বদলে 'কি করবে' তা বলাই সঙ্গত। ক্বচিৎ কখনোও দুই একটি 'না' বললে তার অবশ্য মূল্য আছে।

অনুকরণ করে শিশুরা শেখে। তাই পিতামাতার দেখতে হবে তাদের নিকট থেকে যেন মন্দ অভ্যাস, অসঙ্গত ব্যবহার এবং খারাপ কথা না শেখে। পিতামাতা কথা বলে কথা রাখেন না, পিতামাতা শিশুকে ভূতের ভয় দেখান—, এই সকল মিথ্যা কথা, মিথ্যা ব্যবহার দেখে শিশুরা মিথ্যা শেখে। শিশুর স্বাভাবিক অনুকরণ প্রবৃত্তিকে পিতামাতা সন্তানের মঙ্গলের জন্যই কাজে লাগাবেন, অন্যথায় কুফল ফলতে পারে।

পিতামাতাই শিশুর চরিত্র, ব্যক্তিত্ব এবং ভবিষ্যৎ গঠনে প্রধান অবলম্বন। শিশু

ভবিষ্যতে সৎপ্রকৃতির, আত্মবিশ্বাসী, সুখী, ভীরু, অসুখী, ভীতিগ্রস্ত বা অন্যকিছু যা হবে তার জন্যে পিতামাতাই মূলতঃ দায়ী।

শিশুর প্রশ্নকে কখনও মিথ্যা গল্প বলে এড়ান উচিত নয়। কারণ শিশু একদিন প্রকৃত সত্য ঘটনা জানতে পারলে পিতামাতার উপর আস্থা হারাবে। শিশু তার জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করে, আঙুল চুসে এবং অন্যান্য শিশুর সঙ্গে এতৎসংক্রান্ত খেলা খেলে আনন্দ পায়। এই সকল খুব স্বাভাবিক ভাবেই হয়। এইরূপে তার শারীরিক এবং মানসিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। যদি আরও বহু ভাবে শিশু খেলাধূলায় আত্মবিকাশের সুযোগ পায়, তবে এরূপ স্বাভাবিক যৌন-অভিজ্ঞতা ক্ষতিকারক হয় না। এই সকল অভ্যাস অবাঞ্ছিত হলেও অপরাধ নয় মনে রাখতে হবে। পিতামাতার মনে রাখতে হইবে যে, শিশু একদিন বয়স্ক হবেই। আজ সঙ্কোচ বশতঃ তার যৌন সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর না দিলে, তার সরল যৌন ব্যবহারের প্রতি ঘৃণা ও লজ্জা প্রকাশ করলে, শিশুর এই সকলের প্রতি এরূপ এক মিথ্যা ধারণা জন্মাবে যা ভবিষ্যতে আর দূর হবে না। যতই পিতামাতা এই সব বিষয়ের প্রতি লজ্জা দেখাবেন ও গোপনীয়তা রক্ষা করবেন, মানুষের চরিত্রের স্বাভাবিক নিয়মে ততই শিশুর আগ্রহ বাড়বে এবং তার মনে পরস্পর-বিরোধী চিন্তাধারায় কুফল ফলবে। যৌন-সম্পর্কিত জ্ঞান এড়াতে গিয়ে ঐ বিষয়ে কু-জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে মাত্র। পিতামাতা শিশুকে যৌনবিষয় সম্বন্ধে কথাবার্তা কিম্বা এই বিষয়ে অন্যভাবে আগ্রহ দেখাতে বারণ করেন। শিশু এরূপ কিছু বলা বা করাকে অপরাধ মনে করে, ফলে তার ভাবপ্রবণতা রুদ্ধ হয়। যৌনবিষয়ে শৈশবকালের শিক্ষা পরবর্ত্তী জীবনের সুফল বা কুফলের জন্য দায়ী।

বালক-বালিকার যৌবন লাভ করবার পূর্ব্বেই জীবনের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন সম্পর্কে শিক্ষাদান করা উচিত। যদি পিতামাতা নিজেরা এইরূপ উপদেশ দিতে সক্ষম না হন, তা হলে বালক-বালিকাকে এই বিষয়ে সৎসাহিত্যের গ্রন্থাদি পাঠ করতে দিলে সুফল হয়।

পিতা এবং মাতা উভয়ের মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব—শিশুর নিরাপত্তার জন্য খুবই প্রয়োজন। যদি তাঁরা ঝগড়াও করেন, তা পুত্র-কন্যার সম্মুখে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আর সন্তানেরা জানবার পূর্ব্বেই মিটমাট হওয়া উচিত। যখন পিতামাতা কলহ করতে থাকেন, তখন সন্তান কার পক্ষে যাবে? পিতা এবং মাতা কখনও একজন অপরকে সন্তানের নিকটে হেয় প্রতিপন্ন করবেন না।

যখন পিতা ও মাতা উভয়েই তাকে ভালবাসে তখনই শিশু নিজেকে নিরাপদ মনে করে। যখন পিতামাতা তার প্রতি যথেষ্ট সময় ও মনোযোগ দেন, তার খাওয়া-পরার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন ও মনোযোগ দেন, তখন সে সুখী। যখনই ক্ষুধার সময় শিশুকে খাদ্য দেওয়া হয়, তখন সে খাদ্য অপেক্ষা আরও বেশী কিছু পায়। ক্ষুধার সময় সে অন্ন যে পাবেই এই বিশ্বাস তার মনে জাগে—সমস্ত পৃথিবীর উপর তার আস্থা আসে। মৌলিক নিরাপত্তা ও বিশ্বাস যখন তার মনে স্থান পায়, তখন পরবর্ত্তীকালে যে সকল অসুবিধা আসে তা সে সহজেই উত্তীর্ণ হয় এবং জটিল সামাজিক পরিবেশের মধ্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। আবার শিশুর যখন অন্নের বা খাদ্যের অভাব হয়, অথবা অসময়ে অনিয়মে খাদ্য পায় তখনই সন্দেহে ও সভয়ে সে ভবিষ্যতে অনিশ্চিত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হ'তে শেখে। দুর্ব্বলতা এবং অক্ষমতা সত্ত্বেও শিশুর আস্থা বা বিশ্বাস থাকা খুবই প্রয়োজন। শিশুর এইরূপ বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন যে তার কার্য্য যাই হউক, পিতামাতা তার পেছন আছেন। এই চলমান জগতে শিশুর এরূপ আত্মবিশ্বাস থাকা প্রয়োজন যে, সে যে-কোন কার্য্য করতে সক্ষম। সে যেন বিপদ উত্তীর্ণ হবার ক্ষমতা রাখে এবং নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। শিশুর এই বিশ্বাস, এই শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক শক্তিবর্দ্ধনের সুযোগ সুবিধা বয়স্কদের কোনরূপেই ব্যাহত করা উচিত নয়।

অনেক পিতামাতাই চান শিশুর চরিত্র সুগঠিত হউক। অতিরিক্ত উৎসাহে তাঁরা ছেলেমেয়েদের দোষত্রুটি আলোচনা করতে থাকেন। অথচ এই উপায়ে চরিত্র গঠিত হ'তে পারে না। স্বতঃপ্রবৃত্ত সৎ-অভ্যাসে সৎ-চরিত্রের সৃষ্টি হয়। সৎ-অভ্যাস আনন্দের অভিজ্ঞতা হতেই আসে। সুতরাং পিতামাতার প্রশংসা এখানে খুব কার্য্যকরী। অনেক পিতামাতা চান যে রাতারাতি সন্তান নীতি-বিশারদ হ'ক। তাঁদের জানা উচিত যে শরীর বা মনের উৎকর্ষ রাতারাতি হয় না—বেশ কিছু সময় লাগে। নৈতিক উৎকর্ষ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে হয়। বয়স্কদের নৈতিক মানদণ্ড দ্বারা শিশুকে বিচার করা হয় ব'লে পিতামাতা এরূপ ভুল করেন। তাঁরা চান শিশু এরূপ কিছু করুক যা বড়রা করে, অথচ শিশুর মানসিক অবস্থা তখন অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তরে। ছোট শিশুকে নৈতিক জীবে পরিণত করবার অপচেষ্টা অপেক্ষা নীতি-বিগর্হিত কাজ আর কিছু হতে পারে না। বাইরের চাপে নৈতিক উন্নতি হয় না।

শারীরিক বা মানসিক যে কোন উন্নতিই হ'ক না কেন তা একটি নির্দিষ্ট স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী হবে। যদি কোন শিশুকে তাড়াহুড়া করে কোন উন্নতির পথে ঠেলে দেবার চেষ্টা করা হয় তা হলে তার উন্নতি স্বাভাবিক ভাবে এবং স্বাস্থ্যপূর্ণ ভাবে হতে পারে না। শিশুকে পূর্ণ মানুষে পরিণত হওয়ার পথে কতকগুলি ক্রমবিকাশের স্তর অতিক্রম ক'রতে হয়, জোর করে পূর্ণতা আনবার চেষ্টা করলে মনের স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশ অসম্ভব হয়ে প'ড়ে। এই যে শিশুর পূর্ণতা আনবার চেষ্টা তা অপরিণত মনের ওপর উৎপীড়ন ছাড়া কিছুই নয়।

দশম অধ্যায়

বিদ্যালয়ে মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা ও নির্দ্দেশ

ব্যক্তিগত পার্থক্যের দিকে আজ লক্ষ্য প'ড়েছে। কিন্তু এই ব্যক্তিগত পার্থক্যকে কিভাবে ধরা যায়—এই হ'ল প্রশ্ন। ব্যক্তিত্বকে খণ্ডছিন্ন ক'রে দেখা না গেলেও তার কয়েকটি উপাদান বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে। একে একে দৃষ্টি ফিরল বুদ্ধির তারতম্যের দিকে। ফলে বুদ্ধি নিয়ে অনেক গবেষণা চ'লল। ফ্রান্সের বিনে (Binet) পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর শক্তিকেই বুদ্ধি ব'লে মনে করেন। তাঁরমতে এটি একটি জন্মগত সম্পদ। মনের রাজা এই বুদ্ধি—কারণ মনই অন্যান্য চিত্তবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে। বুদ্ধি সকলেরই আছে, কারও বেশী কারও কম।

তাই বুদ্ধির এই তারতম্যকে পরিমাপ করার জন্যে প্রচেষ্টা চ'লতে থাকে। বিনে সাহেব নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর লক্ষ্য ক'রলেন যে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিও বাড়তে থাকে কিন্তু, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত; তখন তিনি সাইমন (Simon) সাহেবের সহযোগিতায় প্রশ্নমূলক পরীক্ষার উদ্ভাবন ক'রলেন। বয়সের অনুপাতে প্রশ্নগুলির গুরুত্ব লঘুত্ব স্থির করা হ'ল ও বয়স অনুযায়ী প্রশ্নের মাপকাঠি ঠিক করা হ'ল। এই বুদ্ধির মাপকাঠির নাম দেওয়া হ'ল "বিনে-সাইমন মাপকাঠি"। এই মাপকাঠির নানা পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সাধিত হ'ল। এরপর টারমান্ সাহেবের চেষ্টায় বুদ্ধি-পরিমাপের প্রণালীটি আরও সমৃদ্ধ হ'ল ও অভীক্ষাটি পরিমার্জ্জিত হ'ল। ৩ বছর থেকে ১০ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার জন্যে ৬ প্রকার, ১২ বছরের জন্য ৮ প্রকার, ১৪ বছরের জন্যে ৬ প্রকার পরীক্ষা-প্রণালী অনুসৃত হ'ল।

এই তথ্যের অনেক খুঁটিনাটি আছে। মনস্তাত্ত্বিকদের মতে প্রত্যেকের সত্যিকারের বয়স অনুযায়ী তার মনের বিকাশ হয় না। তাই তাঁরা মানসিক বা 'মানস বয়স' গণনার পক্ষপাতী। একটি সত্যিকারের বয়স, অন্যটি মানসিক-শক্তি উন্মেষের নির্দ্দেশক বয়স (Mental age)। একটি ছেলের বা মেয়ের প্রকৃত বয়স যদি ১০ বছর হয় তবে তার মানস বয়স তার থেকে বেশী বা কম হ'তে পারে। বুদ্ধির এই মান পরীক্ষার জন্যে নানা অভীক্ষা উদ্ভাবিত হ'য়েছে। যথা—

বিনে স্কেল ঃ

১। তিন বছর বয়সের শিশুদের জন্যে—

(ক) নাক, চোখ, মুখ দেখানো

(খ) সংখ্যার হিসাব

(গ) ছবি থেকে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য গুণে দেখানো

(ঘ) কোন একটি ছোট বাক্যের পুনরাবৃত্তি করা ইত্যাদি

টারম্যান স্কেল ঃ

১। তিন বছর বয়সের শিশুদের জন্যে—

(ক) শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখানো

(খ) পরিচিত বস্তুর নাম করা

(গ) ছবিতে আঁকা জিনিষের নাম করা, সংখ্যা বলা, ইত্যাদি

এইরূপ বিভিন্ন বয়সের জন্যে পরীক্ষার স্কেল আছে।

মানুষের বুদ্ধির মান নির্ণয় করার জন্যে প্রকৃত বয়সকে মানস বয়স দিয়ে ভাগ করে তাকে ১০০ দিয়ে গুণ ক'রে দেখানো হয়। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রকৃত বয়স ১৬ বছরের বেশী ধরা হয় না, কারণ বহু পরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তে পৌছান গেছে যে ১৬ বছর বয়সের পর কোন ব্যক্তির জন্মগত বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ বা বৃদ্ধি হয় না। উদাহরণ—কোন ছেলের যদি প্রকৃত বয়স ১২ বছর ও মানস বয়স ১৫ বছর তবে তার বুদ্ধি অঙ্ক হবে $\frac{১৫}{১২} \times ১০০ = ১২৫$

মানুষের বুদ্ধির এই অঙ্ক অনুসারে টারম্যান কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ ক'রেছেন। যদি বুদ্ধির অঙ্ক (I. Q) ১৪০ ও তদূর্দ্ধে হয় তবে সে অসাধারণ প্রতিভাবান বুঝতে হবে। সেইরূপ—

১২০-১৪০	প্রতিভাবান্
১১০-১২০	সাধারণের উর্দ্ধে
৯০-১১০	সাধারণ
৮০-৯০	অল্পবুদ্ধি
৭০-৮০	জড়বুদ্ধি
৭০এর নীচে	বুদ্ধিহীন

শিক্ষার্থীদের জন্যে এই বুদ্ধি-পরীক্ষার বিশেষ সার্থকতা আছে। প্রথমে যখন

তারা বিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ ক'রতে চায় তাদের জন্যে ও পিতামাতার অবগতির জন্যেও এই অভীক্ষার প্রয়োজন।

কেবল বুদ্ধির পরীক্ষাই নয়, শিশুকে জানতে হ'লে, শিশুর অনুরাগ, ব্যক্তিত্ব ও প্রবণতা জানার প্রয়োজন। তাই তার জন্যেও অভীক্ষা নিরীক্ষার সার্থকতা আছে। নানাভাবে শিশুর বিষয়ানুরাগ পরীক্ষা করা যায়—

(ক) প্রশ্নাবলীর সাহায্যে শিশু কি ক'রতে ভালোবাসে বা বাড়ীতে কি ক'রতে ভালোবাসে সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ক'রে।

(খ) শিশুকে নানা কাজ দিয়ে দেখতে হয় সে কোন্ কাজ নির্দিষ্ট সময়ে নির্ব্বাচন ক'রে। এজন্যে কয়েকটি অভীক্ষার নমুনা পরিশিষ্টে দেওয়া হ'ল।

মাধ্যমিক শিক্ষায় নির্দ্দেশ

শিক্ষাই জীবন—জীবনই শিক্ষা। তাই শিক্ষার সঙ্গে নির্দ্দেশের প্রশ্ন নিবিড়ভাবে জড়িত, কারণ উভয়ের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থী জীবনের বিকাশে সহায়তা করা।

যার মাঝে যেটুকু সম্ভাবনা আছে তার পূর্ণ রূপায়ণ যাতে সম্ভবপর হয় এইদিকেই শিক্ষাবিদদের দৃষ্টি। একই রকম বৈচিত্র্যহীন শিক্ষার আয়োজন হয়ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পক্ষে অনুকূল নয়, কারণ মানুষের রুচি ভিন্ন, শক্তি ও হৃদয়ের বৃত্তি পৃথক। তাছাড়া নানাকারণে শিক্ষার্থীর বিকাশের পথ রুদ্ধ হ'তে পারে। তাই শিক্ষায় নির্দ্দেশের একান্ত প্রয়োজন। জগতে প্রত্যেকের নিজস্ব স্থান আছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এই হ'ল মূলমন্ত্র।

নির্দ্দেশের অর্থ ঃ—শিক্ষায় নির্দ্দেশের দুটি অর্থ আছে। একটি ব্যাপক আর একটি সংকীর্ণ। ব্যাপক অর্থে শিক্ষার্থীকে তার জ্ঞান আহরণের পথে যে কোন সহায়তাকেই নির্দ্দেশ বলা চলে। কে কোন বিষয়ে কেন পিছিয়ে প'ড়ছে, কে শ্রেণী-পাঠনকে কেন অনুসরণ ক'রতে পারছেনা এই সব সমস্যার সমাধানের প্রয়াসকেই ব্যাপক অর্থে নির্দ্দেশ বলা চলে।

আর কোন্ শিক্ষার্থী কোন্ পাঠ্যবিষয় ও শিক্ষাধারা অনুসরণ ক'রলে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সবচেয়ে বেশী হবে ও তার জীবনে সাফল্য আসবে সেই বিষয়বস্তু বা শিক্ষাধারা নির্ব্বাচনে সহায়তা করাই শিক্ষায় নির্দ্দেশের সংকীর্ণ অর্থ।

নির্দ্দেশের প্রকারভেদ :—নির্দ্দেশের বিভিন্ন প্রকার থাকলেও শিক্ষায় নির্দ্দেশ আজ শিক্ষা-বিদদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

কিন্তু এই নির্দ্দেশের সঙ্গে অন্যপ্রকার নির্দ্দেশের কিছু যোগাযোগ আছে। যেমন বৃত্তিমূলক নির্দ্দেশ। ভাবী জীবনে যার যে বৃত্তি হবে গোড়া থেকেই সেই অনুযায়ী প্রস্তুতির সার্থকতা আছে। তাই শিক্ষায় নির্দ্দেশ ও বৃত্তিমূলক নির্দ্দেশের মাঝে বিশেষ যোগাযোগ ও সংহতির প্রয়োজন। এ ছাড়া সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি নানা নির্দ্দেশের ব্যবস্থা হ'তে পারে। কিন্তু সর্বনির্দ্দেশের সুরুতে আছে শিক্ষায় নির্দ্দেশ।

শিক্ষায় নির্দ্দেশের লক্ষ্য :—

(ক) শিক্ষার্থীকে আত্মবিশ্লেষণের পথে সহায়তা করা।

(খ) পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চ'লতে সাহায্য করা।

(গ) নিজের রুচি, যোগ্যতা ও পরিবেশ অনুযায়ী বিষয় ও শিক্ষাধারা নির্ব্বাচন করা।

নির্দ্দেশের বিশেষ অর্থ :—আজ আমাদের দেশে বিবিধার্থ-সাধক বিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কৈশোর থেকেই রুচি, শক্তি ও পার্থক্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে নির্দ্দেশ দেবার প্রশ্ন উঠেছে। নবম শ্রেণী থেকেই শিক্ষার্থীকে একটি নির্দ্দিষ্ট ধারায়—শিক্ষালাভ ক'রতে হবে, যদিও কয়েকটি বিষয়ে সকলকেই জ্ঞানলাভ ক'রতে হবে। যেকয়টি ধারার কথা উল্লেখ করা হ'য়েছে, কয়েকটি কারণে এ পর্য্যন্ত তাদের মধ্যে Science, Technical, ও Humanities-এর প্রবর্ত্তন বেশী ক'রে সম্ভব হয়েছে। এই বিভিন্ন ধারার প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের মনে জেগেছে আশা ও উদ্দীপনা; কারণ যদি সব শিক্ষার্থীই তার রুচি ও শক্তি অনুযায়ী শিক্ষালাভ ও ব্যক্তিত্বের সুযোগ পায় সেটি কম আনন্দের কথা নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি সমস্যারও উদ্ভব হ'য়েছে। প্রথম সমস্যা হ'ল নির্দ্দিষ্ট ধারায় নির্দ্দেশের ব্যবস্থাকে কেন্দ্র ক'রে।

(১) কিভাবে শিক্ষার্থীর রুচি, প্রবণতা ও যোগ্যতার পরিমাপ হবে?

(২) কি কি গুণ বা বৃত্তিকে কেন্দ্র করে এই নির্দ্দেশের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয় হবে?

দুটি প্রশ্নই নির্দ্দেশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

কি কি গুণ বা বৃত্তি নির্দ্দেশক হবে ?

আজও অনেকের মনে ধারণা, যে বোধ হয় বুদ্ধিই (Intelligence) পরিচালনার পথে প্রধান নির্দ্দেশক। অবশ্য বুদ্ধিকেই পরিচালনা বা নির্ব্বাচনের সময়ে প্রধান নির্দ্দেশক বলে ধরে নেওয়া অনেক ক্ষেত্রেই রীতি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল নির্ব্বাচন ও নির্দ্দেশ এক নয়। তাছাড়া যখনই নির্দ্দেশের কথা ওঠে, তখনই ভাবতে হবে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকলকেই কোন একটি ধারার মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা করাই প্রধান লক্ষ্য। ভাবতে হবে আমাদের দেশের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত এবং পল্লীবাসী। তাই এমন কয়েকটি মূল বৃত্তিকে নিয়ে এই নির্দ্দেশের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয় যেখানে অধিকাংশের প্রতি অবিচার না হয়, অথচ নির্দ্দেশ সার্থক হয়ে ওঠে।

বুদ্ধিকে প্রধান নির্দ্দেশক বলে স্বীকার ক'রে নেওয়া বোধ হয় সমীচীন হবে না। কারণ বুদ্ধি সম্পর্কে বহু মতবাদ বর্ত্তমান। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এখন সামগ্রিক বুদ্ধির চেয়ে বুদ্ধির বিশেষ উপাদানের দিকে অনেকের দৃষ্টি গিয়ে প'ড়েছে। ফলে বুদ্ধির পরিমাপের নামে অনেক সময় বিশেষ বিশেষ শক্তিরই পরিমাপ করা হয়। তাছাড়া যে বয়সের ভিত্তিতে বুদ্ধি পরিমাপ হয় আমাদের দেশে সে ভিত্তিই নির্ভরযোগ্য নয়।

তৃতীয়তঃ, সংখ্যা-বিজ্ঞান অনুযায়ী সাধারণ বুদ্ধির লোকই বেশী। এখন বুদ্ধি পরিমাপের পর যদি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামান্য বুদ্ধিগত পার্থক্য দেখা যায়, তবে সে পার্থক্য কি যথার্থ নির্দ্দেশের পথে বিশেষ সহায়ক হবে ? তাহ'লেই দেখা যায় কোন বুদ্ধি অঙ্ক কোন ধারায় শিক্ষার নির্দ্দেশক হবে গবেষণা ছাড়া সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌছান কঠিন।

অন্য কি কি বৃত্তি শক্তি ও যোগ্যতা নির্দ্দেশের মাপকাঠির কাজে লাগতে পারে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ব্যক্তিত্বের কয়েকটি উপাদানের সঙ্গে বিভিন্ন সাফল্য অসাফল্যের সম্পর্ক আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে বিষয়ানুরাগ ও প্রবণতার সঙ্গে মানুষের ক্রিয়া কলাপের সম্পর্ক আছে। তাই বিষয়ানুরাগ (Interest) ও প্রবণতাকে নির্দ্দেশের মাপকাঠি হিসেবে না নিলে বোধ হয় ভুল হবে।

বিষয়ানুরাগ ঃ—প্রবণতার সঙ্গে অনুরাগকে এক ক'রে দেখলে ভুল হবে।

কারণ প্রবণতার সঙ্গে শক্তি ও পরিবেশের সম্পর্ক আছে। যে দীন পল্লীবাসী, তার যান্ত্রিক প্রবণতা (Technical Aptitude) শিল্পাঞ্চলের অবস্থাপন্ন থাকের শিক্ষার্থীর প্রবণতার সঙ্গে এক হবে না, তাই ভারতের বৈচিত্র্যময় পরিবেশে ও জনসাধারণের বিভিন্ন অবস্থায় প্রবণতাকে নির্দ্দেশের মাপকাঠি করলে দরিদ্র পল্লীবাসীর প্রতি অবিচার করা হবে। এইজন্যে এমন কোন মূল উপাদান ভিত্তি ক'রতে হবে যা অধিক অবস্থা-নিরপেক্ষ।

বিষয়ানুরাগ পরীক্ষার সার্থকতা

জীবনের সাফল্যের সঙ্গে বুদ্ধির যতটকু সম্পর্ক আছে তারচেয়ে বেশী সম্পর্ক বোধহয় ব্যক্তিত্বের।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে অনেকে সাধারণ বুদ্ধি নিয়েও অধ্যবসায় বা আত্ম-প্রত্যয়ের বা অন্য কোন ব্যক্তিত্বের গুণে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে যতই শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার দিকে এগিয়ে যায় ততই কৃতিত্ব দেখায়। তার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ সেই বিশেষ বিষয়ে শিখবার সুযোগ না পাবার জন্যে হয়ত বিশেষ সাফল্য দেখা যায় নি। কিন্তু বিশেষ দিকে শিক্ষালাভের সুযোগ পাবার সঙ্গে সঙ্গে সাফল্য দেখা দিয়েছে। ফলে যখনই শিক্ষায় পরিচালনা বা নির্দ্দেশের প্রশ্ন ওঠে তখনই বিষয়ানুরাগের কথা মনে জাগে। তাই ব্যক্তিত্ব অভ্যাস বিষয়ানুরাগ পরীক্ষার যথেষ্ট সার্থকতা আছে।

বিষয়ানুরাগ পরীক্ষার নূতন পদ্ধতি

এ পর্য্যন্ত যত বিষয়ানুরাগের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে তার অধিকাংশই বিভিন্ন প্রশ্নাবলীর সাহায্যে। কিন্তু এই পদ্ধতি অপরিণত শিশুদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয়। কারণ যে প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে শিশু কিশোরের মনোভাব রুচি শক্তি ও প্রবণতার সন্ধান পাবার চেষ্টা করা হবে তার উত্তর দিতে হ'লে শিশু কিশোরগণের আত্মবিশ্লেষণের ক্ষমতা ও সততার প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দুইটি গুণের অভাব দেখা যায়। তাই বিষয়ানুরাগ পরীক্ষায় এই নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা। কোন একটি পদ্ধতিই নির্দ্দেশের পক্ষে যথেষ্ট নয় যতক্ষণ না তার কার্যকারিতা প্রমানিত হচ্ছে। তাই এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে

অগ্রসর হতে গেলে কয়েকটি পদ্ধতিই একসাথে প্রয়োগ করা আবশ্যক ও পরীক্ষামূলক ভাবে অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। নীচে কয়েকটি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

অভীক্ষা ১—ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষার্থীর বিষয়ানুরাগ নির্দ্ধারণের চেষ্টা করা হ'য়েছে। প্রশ্নগুলি প'ড়ে শিক্ষার্থীর কোনটি পছন্দ কোনটি অপছন্দ বা কোন্ কাজ সে করবে, কোন্ কাজ না ক'রবে তার উত্তর দেবে।

অভীক্ষা ২—এই অভীক্ষাটি একটি অনুমানের ওপর প্রণীত হয়েছে। যে বিষয়ে যার বিশেষ অনুরাগ সে বিষয়ে সে বেশী খবর রাখে বা তথ্য জানে এই অনুমান করা হয়েছে। তাই এমণ অনেকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন এর মধ্যে আছে যার উত্তর করতে হলে ও বিশেষ পর্যবেক্ষণ ও ক্ষেত্রে বিশেষ অনুরাগের প্রয়োজন।

অভীক্ষা ৩—এই অভীক্ষাটির মধ্যে কয়েক রকমের কাজ দেওয়া হয়। সাধারণত ছয় রকমের কাজ আছে। কোনটি রঙ দেওয়া, বা বিন্দুযোগ ক'রে কোন কিছু আঁকা। আবার কোনটি বা বিভিন্ন যন্ত্রের ছড়ান অংশগুলি কোথায় কোনটি লাগবে তা লিখে দেওয়া। মোটকথা অভীক্ষাটি কাগজে কলমে নেওয়া চলে ও এর মধ্যে শিক্ষার্থী রুচি অনুযায়ী কাগজে কলমে যে কোন প্রকার কাজ করতে পারে।

অভীক্ষা ৪—এই অভীক্ষায় থাকবে কয়েকটি নানা টুকরো টুকরো সংবাদ। যে যার রুচি অনুযায়ী সংবাদগুলির শীর্ষ পড়ে বিস্তারিত বিবরণী পড়বে ও পঠিত অংশকে রেখাঙ্কিত করবে। অবশ্য সংবাদগুলির কোনটি যন্ত্র, কোনটি কৃষি, কোনটি চারুকলা, কোনটি বা বিজ্ঞানের বিষয়কে কেন্দ্র করে। মোটকথা ছয় রকমের অনুরাগকে কেন্দ্র করেই এই সংবাদগুলি রচিত হয়েছে ও যে যার বিষয়ানুরাগ অনুযায়ী পড়তে পারবে।

অভীক্ষা ৫—(**ফ্লাস কার্ড**) এই অভীক্ষাটি কয়েকটি কার্ডের সমষ্টি। প্রত্যেকটি কার্ডে নানা বিষয়ের জিনিষ আঁকা থাকবে। কার্ডটি মুহূর্তের জন্য দেখানর সঙ্গে সঙ্গেই তাকে লিখতে বলা হবে সে কি কি দেখেছে। প্রত্যেক কার্ডে অনেকগুলি ক'রে জিনিষ থাকবে। যদি ৮খানি কার্ড দেখানর শেষে দেখা যায় যে একটি বিষয়ের জিনিষই শিক্ষার্থীর বেশী মনে আছে অর্থাৎ বেশী লিখেছে, তবে সে বিষয়েই তার বেশী অনুরাগ ধরা হবে।

এই হল বিষয়ানুরাগ পরীক্ষার জন্য উদ্ভাবিত কয়েকটি পদ্ধতির কথা। তবে বিষয়ানুরাগ যাচাই করতে হ'লে অভিভাবক ও শিক্ষকের মন্তব্য ও মতামত জেনে নেওয়া প্রয়োজন ও যাতে মতামতগুলি যথাসম্ভব নির্ভুল হয় তার জন্যে উপদেশ নির্দ্দেশের প্রয়োজন।

নির্দ্দেশের পদ্ধতি

নির্দ্দেশের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। কিন্তু সব পদ্ধতিই শিক্ষার্থী সম্পর্কে বিবিধ তথ্যের ওপর নির্ভরশীল। এই তথ্য সংগ্রহের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করা যায়। যেমন ঃ—

(ক) বিদ্যালয়ে, শ্রেণীতে ও অন্যান্য পরিবেশে শিক্ষার্থীর আচরণ ও ক্রিয়া-কলাপ পর্যবেক্ষণ।

(খ) শিক্ষার্থীর শ্রেণীর কাজ, বিভিন্ন পরীক্ষায় ফলাফল ও বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণের দিকে দৃষ্টি রাখা ও তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ করে পরে তা থেকে নির্দ্দেশের উপাদান সংগ্রহ করা।

(গ) অভীক্ষা পত্রের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মনের খবর নেওয়া।

(ঘ) নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ও অভীক্ষার প্রয়োগ।

(ঙ) শিক্ষার্থীর সাথে একান্তে আলাপ আলোচনা ও তার মনঃসমীক্ষণ—

(চ) অভিভাবকদের মতামত সংগ্রহ।

নানা উপায়ে শিক্ষার্থীর রুচি, অনুরাগ, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার ওপর ভিত্তি ক'রে নির্দ্দেশ দিতে হবে।

কোন্ গুন ও বৃত্তি কতটুকু থাকলে কোন্ ধারায় শিক্ষা সবচেয়ে বেশী উপযোগী ও সার্থক হবে তাও নির্দ্দেশকের জানা থাকার দরকার। যেখানে তা জানা নেই সেখানে নির্দ্দেশ ক্রটীপূর্ণ হতে পারে।

অনুমিত নির্দ্দেশের সমস্যা

বর্ত্তমান ভারতীয় পরিস্থিতিতে সুষ্ঠু নির্দ্দেশের পথ সমস্যা সমাকীর্ণ। যে সমস্যা এইক্ষেত্রে দেখা দেবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল অভিভাবক ও শিক্ষককে কেন্দ্র ক'রে।

প্রথমতঃ—সুষ্ঠু নির্দ্দেশের জন্যে বিদ্যালয়ে নানা কার্য্যকরী অভীক্ষার আয়োজনের

অভাব। এই আয়োজন সময়-সাপেক্ষ, ফলে—বিজ্ঞান সম্মত নির্দ্দেশ বর্ত্তমানে সম্ভবপর নয়।

দ্বিতীয়তঃ—অভিভাবকদের ইচ্ছা ও শিক্ষক নির্দ্দেশকের (Teacher Counsellor) নির্দ্দেশের মধ্যে সংঘাতের প্রশ্ন। অনেক সময় অভিভাবক অবস্থাপন্ন হ'লে এই সংঘাত আরও তীব্রতর ও জটিল হ'য়ে উঠবে। কারণ যোগ্যতা না থাকলেও কাঞ্চন-কৌলীন্য দিয়ে সে অভাব পূর্ণ করবার প্রয়াস চ'লবে। ফলে যে বিজ্ঞান শাখার যোগ্য নয় তাকেও অভিভাবকের পক্ষ থেকে বিজ্ঞান শাখায় ভর্ত্তি করবার একটি দুর্দ্দম প্রয়াস চ'লবে।

তৃতীয়তঃ—ভাবী জীবনের সম্ভাবনার কথা চিন্তা ক'রে অধিকাংশ অভিভাবকই বিজ্ঞান শাখায় শিক্ষার্থীকে ভর্ত্তি ক'রতে চাইবেন। ফলে একই শাখায় অসম্ভব ভিড় হবে ও অন্য শাখাগুলিতে প্রবেশ-প্রার্থীর সংখ্যা তদনুপাতে কম হবে।

চতুর্থতঃ—যে যে বিভাগে বা শাখায় ভর্ত্তি হবে পরে সে শাখা তার ভালো না লাগলে বা যোগ্যতার পরিচয় না দিলে এক শাখা থেকে অন্য শাখায় স্থানান্তরের অবকাশ বস্তুতঃ খুবই অল্প।

উচ্চতর স্তরেও এই সমস্যা দেখা দেবে। কারণ কেউ যদি কৃষ্টি-মূলক বিষয় নিয়ে পরে বিজ্ঞানে বা যন্ত্র-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শিক্ষালাভ করতে চায় বর্ত্তমান অবস্থায় তার পথ তখন রুদ্ধই থাকবে।

তাছাড়া এই শিক্ষাধারা সত্যই কতদূর বৈচিত্র্যময় হবে সে বিষয়ে আজও সংশয়ের অবকাশ আছে। কারণ দেখা যায় যে, সাধারণ বিষয়বস্তুর বোঝা প্রায় সকলকেই টানতে হ'চ্ছে—শুধু পার্থক্য হ'ল তার নির্ব্বাচনী বিষয়ের বেলায় (Elective Subject)। তবে কি সাধারণ পাঠ্যবিষয়ের সাথে সাথে নির্ব্বাচনী বিষয় (Elective Subject) সংযোজিত হ'লেই তা বিবিধার্থ-সাধক বিদ্যালয়ের উপাদান হয়ে উঠবে।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আজ উঠেছে এই বিবিধার্থ-সাধক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর ভাবী জীবনের সাথে সংহতির সমস্যাকে কেন্দ্র ক'রে। কারণ যারা হয়ত যান্ত্রিক শাখায় বিশেষ শিক্ষালাভ ক'রবে তারা কর্ম্মজীবনে যদি সে জ্ঞান প্রয়োগ ক'রবার সুযোগ না পায় তবে তাদের এই অর্জ্জিত জ্ঞান সম্পূর্ণ সার্থক বলা যায় না।

আলোচনা ঃ—অনেকে বিবিধার্থ সাধক বিদ্যালয়কে শিক্ষা-সংকোচক বলে

মনে করেন। কিন্তু এই পরিকল্পনার মূলে শিক্ষাকে সংকোচিত করবার কোন ইঙ্গিতই নাই বরঞ্চ শিক্ষাকে সকলের রুচি ও শক্তি অনুযায়ী পরিবেশন করার আয়োজনই এর উদ্দেশ্য। তবে এই আয়োজনের যা কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ক্রমশঃ ধরা পড়বে সেগুলির দিকে দৃষ্টি রেখে পরিবর্ত্তন ও পরিমার্জ্জনও করার প্রয়োজন হবে। অনেকের ধারণা যে সব বিদ্যালয় বর্ত্তমানে বিবিধার্থ সাধক নয় তাদের অবস্থা শোচনীয় হবে; কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যতদূর শোচনীয় হবে ব'লে মনে হ'চ্ছে ততদূর হবার কোন কারণ নেই। কোন অভিভাবকই তাঁদের সন্তানকে অলস রাখতে চাইবেন না ফলে যে স্থানীয় বিদ্যালয়গুলি আছে তা বিবিধার্থ সাধক না হ'লেও তাতে সাময়িকভাবে ভর্ত্তি করবেন। ইতিমধ্যে বিবিধার্থ সাধক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বেড়ে যাবে ও বহু বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণী ও ভিন্ন শাখা সংশ্লিষ্ট হবে। সুতরাং এ সমস্যার আংশিক সমাধান হবেই। তারপর যদি এক বিদ্যালয় থেকে অন্য বিদ্যালয়ে, এক শাখা থেকে অন্য শাখায় বদলি সুগম হয় তাহলেও এই সমাধান আরও সহজ হবে। তারপর যারা Humanities নেবে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে এটিও সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ সকলেরই বিজ্ঞান বা যান্ত্রিক শাখায় যোগ্যতা নেই—ফলে প্রত্যেকেই সে শাখায় অগ্রসর হলেই যে তারা দেশের উপযুক্ত নাগরিক হ'তে পারবে ও তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে, তার কোন অর্থ নেই। তাছাড়া দেশের কৃষ্টিমূলক শিক্ষার (Liberal Education) প্রয়োজন চিরকালই থাকবে। সমাজে সাহিত্যিক, শিল্পী, ঐতিহাসিকের মূল্য চিরদিনই স্বীকৃত হবে। তবে অভিভাবকদের মধ্যে কৃষ্টিমূলক বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে সংশয় তার মূলে এই নূতন শিক্ষা পরিকল্পনা দায়ী নয়, এর জন্য মূলতঃ দায়ী আমাদের দেশের বেকার সমস্যা। যাইহোক যদি ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন শাখায় অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় শিক্ষাশেষে একটি পরীক্ষা নিয়ে ইচ্ছামত শাখায় যাবার সুযোগ দেওয়া হয় তা হলে বোধ হয় অভিভাবকদের কিছু সান্ত্বনা মেলে।

ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা (১)

[পরিষ্কার ক'রে লিখে দাও]

নাম...বয়স...

শ্রেণী..........................বিদ্যালয়...

নির্দ্দেশ :—সব কয়টি প্রশ্নের ঠিক উত্তর দাও। প্রশ্নগুলির উত্তর জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেই দিতে হবে। ভুল ঠিক, ভাল মন্দ, বলে কোনও উত্তর নেই, কারণ উত্তর গুলির বিচার কোন ঠিক; ভুল, সত্যমিথ্যার মাপকাঠিতে করা হবে না। পরীক্ষার এমন কোনও উদ্দেশ্য নেই। সত্যিকারের তোমার নিজের সম্বন্ধে যে ধারণা, সেই ধারণা অনুযায়ী সততার সঙ্গে সত্যকথা বলতে পার কিনা পার তাই দেখা হবে। নীচে অনেকগুলি প্রশ্ন আছে এবং প্রত্যেক প্রশ্নের পাশে পাশে হ্যাঁ, না ও জিজ্ঞাসার চিহ্ন আছে। যেখানে প্রশ্নের কোনও নির্দ্দিষ্ট উত্তর দিতে পার না অর্থাৎ যেখানে সন্দেহ আছে, সেখানে কেবল জিজ্ঞাসার চিহ্নের নীচে দাগ দেবে। কোন প্রশ্ন ছাড়বে না।

১। যে কাজ করতে অনেক সময় লাগে সে সব কাজ তুমি পছন্দ কর কি না? — হ্যাঁ ? না

২। তুমি যখন কাজ কর তখন তুমি কি কাজের মধ্যে এমনি ভাবে ডুবে থাক যে আশেপাশে যা ঘটছে তার দিকে কোনও লক্ষ্য থাকে না? — হ্যাঁ ? না

৩। তুমি যখন খেলা কর তখন কি সে খেলায় কৃতিত্ব না দেখান পর্য্যন্ত তাতে লেগে থাক? — হ্যাঁ ? না

৪। কোন কাজে বিফলতা কি তোমাকে নূতন উদ্যম এনে দেয়? — হ্যাঁ ? না

৫। কোন কাজ শেষ করতে না পারলে তুমি কি মনে মনে অসুখী হও? — হ্যাঁ ? না

৬। অনিল কাজ ক'রতে ক'রতে যদি কাজটাকে কঠিন মনে করে তবে সে কাজ না ক'রে অন্য কাজে চলে যায়; সে কি তোমার মত? — হ্যাঁ ? না

৭। কোন কাজকে শেষ পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে তোমার কি খুব কষ্ট হয়? হ্যাঁ ? না

৮। অরুণ জানে যে তার যে বিষয়ে ধারণা ভাল, অন্য লোক তার ধারণাকে আঘাত করে উল্টো কথা বললেও সে মত পাল্টাতে না-রাজ। তুমি কি তার মত? হ্যাঁ ? না

৯। কোন কাজ একঘেয়ে ও নীরস লাগলেও তাতে লেগে থাকবার সঙ্কল্প নাও কি না? হ্যাঁ ? না

১০। তোমার বন্ধু বান্ধব, শিক্ষক ও অভিভাবক কি অনেক সময় তোমাকে একগুঁয়ে বলে থাকেন? হ্যাঁ ? না

১১। কোন কাজ কোন কারণে শেষ করতে না পারলে, অন্য কোন এক সময়ে তুমি কি সে কাজে আবার ফিরে যাও? হ্যাঁ ? না

১২। কোন কাজ স্থুরু করার পর যদি কোন নূতন কাজ মাঝখানে এসে পড়ে, তবে তুমি কি স্থুরু-করা কাজ ছেড়ে দিয়ে নূতন কাজে লেগে পড়? হ্যাঁ ? না

১৩। যখন কোন জীবন-সমস্যা তোমার সামনে আসে তখন তুমি কি সঙ্কল্প নিয়ে তার সমাধান করার চেষ্টা কর? হ্যাঁ ? না

১৪। যে কাজ শেষ করতে হয়ত তোমার কয়েকটা বছর লেগে যাবে সে কাজ কি তোমার খারাপ লাগে? হ্যাঁ ? না

১৫। অপরের উৎসাহ উদ্দীপনা ছাড়াও কি তুমি কোন ক্লান্তিকর কাজে অনেকক্ষণ লেগে থাকতে পার? হ্যাঁ ? না

১৬। মনের ভাল লাগা না লাগার ব্যাপারটা কি তোমার খুব তাড়াতাড়ি বদলে যায়? হ্যাঁ ? না

১৭। যখন যে কাজ ধর তখন সে কাজ শেষ না ক'রে তুমি কি সহজে অন্য কাজে হাত দাও? হ্যাঁ ? না

১৮। তুমি কি অনেক কাজ এক সঙ্গে না ধরে এক এক ক'রে প্রত্যেক কাজ সম্পূর্ণ কর? হ্যাঁ ? না

বিষয়ানুরাগ পরীক্ষা (১)

	১	২	৩	৪	৫	৬		

[পরিষ্কার ক'রে লিখে দাও]

নাম..**বয়স**..

শ্রেণী..................**বিদ্যালয়**..

তুমি তোমার ভাবী জীবনের কোন্ কোন্ বৃত্তি বা উপজীবিকা সবচেয়ে বেশী পছন্দ করবে একথা এখন জানতে পারলে তোমার পরবর্তী শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োজন মত কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আনা যেতে পারে।

সঙ্গে যে প্রশ্নপত্রটি দেওয়া হয়েছে তার মধ্য দিয়ে তোমার পছন্দ অপছন্দ যাচাই করা যা'বে যদি তুমি খোলা মনে প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা কর। কোন প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় কেবল তোমার নিজের যা ভাল লাগে বা না লাগে, বা নিজে যা কর না কর সেই কথাই ভাববে—আর সেইমত উত্তর দিয়ে যাবে। প্রত্যেক প্রশ্নের পাশে হ্যাঁ, না ও প্রশ্নসূচক চিহ্ন (?) দেওয়া রয়েছে।

এখন নীচের প্রশ্নগুলি বুঝে উত্তর দিয়ে যাও অর্থাৎ হাঁ বা না এর চারিপাশে এইরূপ O চিহ্ন এঁকে দেবে। যদি কোন প্রশ্নের উত্তর ঠিক করতে না পার, তখনই প্রশ্নসূচক চিহ্নের চারিপাশে এইরূপ O চিহ্ন এঁকে দেবে। সব প্রশ্নগুলিরই উত্তর দিতে হবে, একটিও ছেড়ে দেবে না।

স্কুল থেকে আসার পর তুমি সাধারণতঃ কি কর বা ক'রতে চাও?

১। বাড়ী বসে ছবি আঁক? হ্যাঁ ? না

২। আবিষ্কারের গল্প পড়? হ্যাঁ ? না

৩।	বাড়ীর বাজারের হিসাব-নিকাশ কর ?	হ্যাঁ	?	না
৪।	কোন ভাঙ্গা ঘড়ি নিয়ে সারাবার চেষ্টা কর ?	হ্যাঁ	?	না
৫।	বাড়ীর বাগানের কাজ কর ?	হ্যাঁ	?	না
৬।	বসেঁ বসে কোন প্রবন্ধ লেখ ?	হ্যাঁ	?	না

কোন ছুটীর দিনে তুমি কি করে সময় কাটাবে ?

৭।	বাড়ীর বাগানটিতে শাকসব্জী চাষ করতে চেষ্টা করবে ?	হ্যাঁ	?	না
৮।	ব্যাকরণের প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাবে ?	হ্যাঁ	?	না
৯।	উপরের ঘরে গিয়ে কবিতা লিখবে ?	হ্যাঁ	?	না
১০।	কাগজের শেয়ারের বাজারের দর-দাম নিয়ে হিসাব করবে ?	হ্যাঁ	?	না
১১।	টুকিটাকি যন্ত্রপাতি নিয়ে সময় কাটাবে ?	হ্যাঁ	?	না
১২।	উদ্ভিদের জন্মকথা পড়বে ?	হ্যাঁ	?	না

যদি কোন দিন ছুটী পাও তবে তুমি কি কি কাজ করে সেই দিনটির সদ্ব্যবহার করবে ?

১৩।	বসে বসে গান গাইবে ?	হ্যাঁ	?	না
১৪।	অঙ্কের কোন জটিল প্রশ্নের উত্তর ক'রবে ?	হ্যাঁ	?	না
১৫।	কোথাও কলকারখানা ও যন্ত্রপাতি দেখতে যাবে ?	হ্যাঁ	?	না
১৬।	কোন ব্যাঙ্কের হিসাব নিকাশ লক্ষ্য করবে ?	হ্যাঁ	?	না
১৭।	কাছাকাছি কোন ল্যবরেটারীতে গিয়ে কাজকর্ম লক্ষ্য করবে ?	হ্যাঁ	?	না
১৮।	কোন কলের ক্লাশ সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে পড়াশুনা করবে ?	হ্যাঁ	?	না

হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে যদি দেখ যে গাড়ী ছাড়বার তখনও প্রায় এক ঘণ্টা বাকী তখন তুমি কি করবে ?

১৯।	গ্লোব নার্শারীর দোকানে গিয়ে বীজ বা গাছের খোঁজ খবর নেবে ?	হ্যাঁ	?	না
২০।	কোন ওয়েটিং রুমে বসে গল্প লেখা সুরু করে দেবে ?	হ্যাঁ	?	না

২১। কোন দোকানে গিয়ে তাদের মাসিক আয়ব্যয়ের কথা জিজ্ঞেস করবে? হ্যাঁ ? না

২২। বুকষ্টল থেকে ইতিহাসের বই কিনে পড়তে সুরু করে দেবে? হ্যাঁ ? না

২৩। প্লাটফর্মের ভিতরে গিয়ে কোন ইঞ্জিনের ড্রাইভারের সঙ্গে ভাব করে ইঞ্জিনের খুঁটিনাটি কথা জেনে নেবার চেষ্টা করবে? হ্যাঁ ? না

২৪। কোনও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকার পাতা উল্টাতে থাকবে? হ্যাঁ ? না

বর্ষার দিনে যখন বাইরের কোন কাজ করা সম্ভব হয় না, তখন ঘরে বসে তুমি কি ধরণের কাজ করবে?

২৫। ছবি দিয়ে ঘর সাজাবে? হ্যাঁ ? না

২৬। কোন বিজ্ঞানের কাহিনী পড়বে? হ্যাঁ ? না

২৭। গাছের যে সব বীজ সঞ্চয় করেছ তাদের বেছে ফেলবার চেষ্টা করবে? হ্যাঁ ? না

২৮। ঘরে বসে কোন তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পড়বে? হ্যাঁ ? না

২৯। কোন ভাঙ্গা টর্চলাইট ঠিক করবার চেষ্টা করবে? হ্যাঁ ? না

৩০। বসে বসে দেশ বিদেশের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী মন দিয়ে পড়বে? হ্যাঁ ? না

স্কুলে গিয়ে মাষ্টার মশাই না আসার জন্য হঠাৎ যদি কিছুক্ষণের ছুটি পেয়ে যাও, তবে সে সময়টা কি ভাবে কাটাবে?

৩১। স্কুলের লাইব্রেরীতে গিয়ে কোন অঙ্কের বই নিয়ে শুভঙ্করী শিখবার চেষ্টা করবে? হ্যাঁ ? না

৩২। স্কুলের যে ক্লাসে কাঠের কাজ শেখান হয়, সেই ক্লাসে গিয়ে নিজের জন্য ছোট্ট একটি কলমদানি তৈরী করবার চেষ্টা করবে? হ্যাঁ ? না

৩৩। সরস্বতী পূজার জন্য যে আয়ব্যয় হয়ে গেছে তার একটি হিসাব করে ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা নিরূপণ করবে? হ্যাঁ ? না

৩৪। স্কুলের কোনও নির্জ্জন জায়গায় গিয়ে কোন ছবি আঁকবার চেষ্টা করবে? হ্যাঁ ? না

৩৫। ল্যাবরেটারীর শিশিবোতল নিয়ে এ্যাসিড ঢালাঢালি করবে? হ্যাঁ ? না

৩৬। কোন পড়ে-থাকা জমিকে ঘিরে কোন ফুলের গাছ করার চেষ্টা করবে? হ্যাঁ ? না

তোমার বেশীর ভাগ সময় কি ক'রে কাটে?

৩৭। বাড়ীতে ব'সে টাইপ বা হিসাব-পত্র ক'রে? হ্যাঁ ? না

৩৮। বিজ্ঞানের বই প'ড়ে? হ্যাঁ ? না

৩৯। কোন কিছু এঁকে? হ্যাঁ ? না

৪০। যন্ত্রপাতির কাজ ক'রে? হ্যাঁ ? না

৪১। ইতিহাস প'ড়ে? হ্যাঁ ? না

৪২। ফুল ফলের চাষ ক'রে? হ্যাঁ ? না

তোমার সামনে, ধর নীচের কয়েকটি জিনিষ আছে, তুমি কোন্ কাজটি প্রথমে সুরু ক'রবে ও তাতে সবচেয়ে বেশী সময় দেবে?

৪৩। একটি অঙ্কের সমাধান করা? হ্যাঁ ? না

৪৪। একটি সুন্দর সাহিত্যের বই পড়া? হ্যাঁ ? না

৪৫। যন্ত্রপাতির নক্সা আঁকা? হ্যাঁ ? না

৪৬। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী পড়া? হ্যাঁ ? না

৪৭। একটি বীজের বাক্স নিয়ে নাড়াচাড়া করা? হ্যাঁ ? না

৪৮। চরকায় সূতা কাটা? হ্যাঁ ? না

তোমার হাতে কিছু টাকা পেলে তুমি তা দিয়ে কি কিনবে?

৪৯। ছবি? হ্যাঁ ? না

৫০। যন্ত্রপাতি? হ্যাঁ ? না

৫১। ফুলের বীজ? হ্যাঁ ? না

৫২। কাব্যের বই? হ্যাঁ ? না

৫৩। বৈজ্ঞানিকদের জীবনী ? হ্যাঁ ? না

৫৪। হিসাবের জন্যে খাতা ? হ্যাঁ ? না

৫৫। তোমার বিদ্যালয়ের পত্রিকায় বা অন্য কোন পত্রিকায় তোমার কোন প্রবন্ধ বেরিয়েছে কি না ? হ্যাঁ ? না

৫৬। বাড়ীর বা স্কুলের বাগানে তুমি কি নিয়মিত কাজ কর ? হ্যাঁ ? না

৫৭। কলকারখানা দেখতে তোমার খুব ভাল লাগে কি না ? হ্যাঁ ? না

৫৮। বাড়ীর আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখতে তোমার ভাল লাগে কি ? হ্যাঁ ? না

৫৯। তুমি কি অবসর সময়ে যন্ত্রপাতির কাজ করিতে ভালবাস ? হ্যাঁ ? না

৬০। তোমার কি সাধারণতঃ শিল্পীদের জীবনী পড়তে ভালো লাগে ? হ্যাঁ ? না

৬১। কলা প্রদর্শনীতে তুমি কি প্রায়ই যাও ? হ্যাঁ ? না

৬২। খুঁটিনাটি যন্ত্রপাতির কাজ তোমার ভাল লাগে কি না ? হ্যাঁ ? না

৬৩। দোকানদারি তোমার কি খারাপ লাগে ? হ্যাঁ ? না

৬৪। তুমি কি বৈজ্ঞানিকদের জীবনী সম্পর্কে জানবার জন্যে বিশেষ কৌতূহলী ? হ্যাঁ ? না

৬৫। খবরের কাগজের বা কোন পত্রিকার ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক, শেয়ার মার্কেটের পৃষ্ঠা মন দিয়ে পড় কি না ? হ্যাঁ ? না

৬৬। মালীদের কাজ তোমার ভাল লাগে কি না ? হ্যাঁ ? না

৬৭। কোন অভিনয়ে কোন দিন কোন অংশ গ্রহণ করেছ কি না ? হ্যাঁ ? না

৬৮। অন্য কিছু লিখতে লিখতে খাতায় প্রায় হিজিবিজি আঁক কি না ? হ্যাঁ ? না

৬৯। কাদা মাটি দিয়ে মডেল তৈয়ারী কাজ তোমার ভাল লাগে কি না ? হ্যাঁ ? না

৭০। গ্রামে মাঝে মাঝে চাষ-বাস ক্ষেতক্ষামার দেখতে গিয়ে তাদের কাছ থেকে গাছপালার সম্বন্ধে জেনে নাও কি না ? হ্যাঁ ? না

৭১। অন্য বইয়ের তুলনায় তুমি বিজ্ঞানের বই বেশী পড়েছ কি না? হ্যাঁ ? না
৭২। সভ্যতার ইতিহাসের বই পড়তে তোমার খারাপ লাগে কি? হ্যাঁ ? না
৭৩। তুমি কি সাধারণ গল্প বা উপন্যাসের চেয়ে তথ্যমূলক প্রবন্ধ পড়তে ভালবাস? হ্যাঁ ? না
৭৪। স্কুলের বেশী ভাগ সময় বিজ্ঞানের কক্ষে কাটে কি না? হ্যাঁ ? না
৭৫। ভূগোলের ক্লাস তোমার অন্য সব ক্লাসের চেয়ে ভাল লাগে কি না? হ্যাঁ ? না
৭৬। উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের বই পড়তে তোমার খারাপ লাগে কি না? হ্যাঁ ? না
৭৭। তুমি কি ছোটখাট যন্ত্রপাতি হাতে পেলে তা সহজে ছাড়তে চাও না? হ্যাঁ ? না
৭৮। তুমি কি প্রাণি-বিজ্ঞানের বিষয় বেশী জানতে চাও? হ্যাঁ ? না
৭৯। তুমি কোন কিছু কলকজা দেখলে তার খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা কর? হ্যাঁ ? না
৮০। দিনের বেশীর ভাগ পড়ার সময় তুমি কি অঙ্ক কষে কাটাও? হ্যাঁ ? না
৮১। একটু অবসর সময় পেলেই তুমি কি বাড়ীর বাগানটিতে গাছপালার জন্য সময় দাও? হ্যাঁ ? না
৮২। তোমার হাতখরচ থেকে পয়সা বাঁচিয়ে তুমি কি এমন কোন জিনিষ কেনো যার থেকে তোমার ভবিষ্যতে লাভ হ'তে পারে? হ্যাঁ ? না
৮৩। তুমি কি বাড়ীতে গাছ বা কলম কিনবার জন্য প্রায়ই কিছু কিছু ব্যয় কর? হ্যাঁ ? না
৮৪। তুমি কি মাঝে মাঝে কোন দোকানে গিয়ে তাদের ব্যবসার লাভ-ক্ষতির খোঁজ খবর নাও? হ্যাঁ ? না

বিষয়ানুরাগ পরীক্ষা (২)

নির্দ্দেশ ঃ—তোমাদের কাছে অনেক রকমের অনেকগুলো প্রশ্ন দেওয়া হচ্ছে। সব প্রশ্নেরই উত্তর করবার চেষ্টা ক'রবে। তবে উত্তর করবার আগে সব প্রশ্নগুলো একবার পড়ে নিতে হ'বে।

প্রশ্ন	উত্তর
১। কোন্ জাতি ভারতবর্ষে সবচেয়ে কমদিন রাজত্ব করেছিল ?	
২। কি কি সার কপি গাছের পক্ষে প্রয়োজন ?	
৩। মোগল চিত্রশিল্পে কে কে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন ?	
৪। যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হিসাব-পত্রের সুবিধার জন্য কি কি খাতা বা Register এর একান্ত প্রয়োজন ?	
৫। পদার্থ বিজ্ঞানকে কি কি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ?	
৬। ইঞ্জিনের Piston কোন্ কাজে লাগে ?	
৭। ভারতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কে কি "নোবেল প্রাইজ" পেয়েছেন ?	
৮। গাছের গোড়া কোন্ সময়ে খুঁড়ে দেওয়া উচিত ?	
৯। শিল্পী কোন্ প্রতিমার মুখে কোন্ বিশেষ অংশ সবচেয়ে শেষে যোজনা করে ?	
১০। সাধারণতঃ বিদেশের সঙ্গে ব্যবসায় কি ভাবে টাকাকড়ির আদান-প্রদান হয়।	
১১। আইনষ্টাইনের অবদান কি ?	
১২। একটা ঘড়িতে সাধারণতঃ কটা wheel থাকে ?	
১৩। পিথাগোরাস কিসের জন্য বিখ্যাত ?	
১৪। পাট জন্মাবার জন্য কিরূপ জমি নির্ব্বাচন করা উচিত ?	
১৫। চেক কি কি রকমের আছে ?	
১৬। যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে কোন্ আকারের জিনিষ সবচেয়ে বেশী কাজে লাগে ?	
১৭। "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"—এটি কার উক্তি ?	
১৮। কোন্ কোন্ গাছ অল্প অন্ধকার জায়গায় ভাল জন্মায় ?	

প্রশ্ন	উত্তর
১৯। পাশ্চাত্যের শিল্পীদের কাকে তোমার ভাল লাগে ?	
২০। Balance Sheet কাকে বলে ?	
২১। বাসের কোন্ চাকার সাথে ইঞ্জিনের যোগাযোগ থাকে ?	
২২। কীট-পতঙ্গ থেকে কি ভাবে গাছকে রক্ষা করা যায় ?	
২৩। আর্ট কতরকম আছে ?	
২৪। অডিটারদের সাধারণতঃ কি কাজ ?	
২৫। বেতারে যে গান আমরা শুনি তা কিসের মাধ্যমে আমাদের কাছে এসে পৌছায় ?	
২৬। একটা টর্চলাইট-এর ব্যাটারীতে কত ভোল্টের কোন্ Cell থাকে ?	
২৭। একই জমিতে বছরে সবচেয়ে বেশী কতবার ধান চাষ করা যায় ?	
২৮। কোন রঙ্ এর সঙ্গে কালোকে সবচেয়ে উজ্জল দেখায় ?	
২৯। "লিমিটেড ফার্ম" কি কি রকমের ?	
৩০। এটমের উপাদান কি কি ?	
৩১। দক্ষিণ ভারত কোন্ কোন্ কারুশিল্পের জন্য বিখ্যাত ?	
৩২। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গণিতের কোন্ শাখার প্রয়োগ সবচেয়ে বেশী ?	
৩৩। রেলগাড়ীর পাখা (Signal) যে তার দিয়ে উঠান ও নামান হয়, সে তার যদি হঠাৎ কেটে যায় তবে পাখা কোন্ অবস্থায় থাক্‌বে ?	
৩৪। কে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সমাজকে বিশ্লেষণ ক'রে নূতন মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন ?	
৩৫। বাঙালী সমাজের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে বাঙালীর লেখা কোন্ গ্রন্থ সবচেয়ে আধুনিক ও প্রশংসিত ?	
৩৬। সেলাইএর কলের ছুঁচ কিরূপ হয় ও কি ভাবে লাগান থাকে ?	

বিষয়ানুরাগ পরীক্ষা (৩)

সঙ্গে যে প্রশ্নপত্রটি দেওয়া হয়েছে তার মধ্য দিয়ে বৃত্তি বা উপজীবিকা সম্বন্ধে তোমার পছন্দ অপছন্দ যাচাই করা যাবে, যদি তুমি খোলা মনে প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা কর। কোন প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় কেবল তোমার নিজের ভাল লাগা বা না-লাগার কথাই ভাববে—এবং সেইমত উত্তর দিয়ে যাবে।

এখন নীচের প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দিয়ে যাও। সব প্রশ্নগুলিরই উত্তর দিতে হবে, একটিও ছেড়ে দেবে না।

প্রত্যেক প্রশ্নের পাশে পছন্দ, অপছন্দ ও প্রশ্নসূচক চিহ্ন (?) দেওয়া রয়েছে। যদি পছন্দ হয় তবে পছন্দর চারিপাশে O এইরূপ একটি চিহ্ন এঁকে দেবে। যদি অপছন্দ থাকে, তবে অপছন্দর চারিপাশে একটি O এঁকে দেবে; আর যদি পছন্দ, অপছন্দ কোনটাই ঠিক কর'তে না পার, তবে প্রশ্নসূচক চিহ্নের চারিপাশে এইরূপ O চিহ্ন এঁকে দেবে।

১। যন্ত্রপাতির কাজ করা	প	অ	?
২। অঙ্ক কষা	প	অ	?
৩। ল্যাবরেটরির কাজ	প	অ	?
৪। বিজ্ঞানের বই পড়া	প	অ	?
৫। ড্রইং করা	প	অ	?
৬। সাজসজ্জার কাজ করা	প	অ	?
৭। চাঁদা তোলা	প	অ	?
৮। স্কুলে অভিনয় করা	প	অ	?
৯। বিতর্কে যোগ দেওয়া	প	অ	?
১০। সাহিত্য প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়া	প	অ	?
১১। বিদ্যালয় পত্রিকায় লেখা	প	অ	?
১২। মাটির জিনিষ তৈরী করা	প	অ	?
১৩। স্কুলের বাগান করা	প	অ	?
১৪। গাছপালার বিষয় পড়া	প	অ	?
১৫। কাঠের কাজ করা	প	অ	?
১৬। সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়া	প	অ	?

১৭। সাহিত্য পড়া	প	অ	?
১৮। কবিতা লেখা	প	অ	?
১৯। খবরের কাগজ পড়া	প	অ	?
২০। গল্প লৈখা	প	অ	?
২১। পৌরবিজ্ঞান পড়া	প	অ	?
২২। ভূগোল পড়া	প	অ	?
২৩। ম্যাপ আঁকা	প	অ	?
২৪। ইতিহাস পড়া	ও	অ	?
২৫। উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান পড়া	প	অ	?
২৬। প্রাণীদের বিষয় জানা	প	অ	?
২৭। কালি ও রঙ তৈরী করা	প	অ	?
২৮। পদার্থ বিজ্ঞান পড়া	প	অ	?
২৯। যন্ত্রের ছবি আঁকা	প	অ	?
৩০। চারুশিল্প শেখা	প	অ	?
৩১। মডেল তৈরী করা	প	অ	?
৩২। যন্ত্রপাতি মেরামত করা	প	অ	?
৩৩। খেলাঘর তৈরী করা	প	অ	?
৩৪। কাঠ বা পাথর খোদাই করা	প	অ	?
৩৫। আবিষ্কারকদের জীবনী পড়া	প	অ	?
৩৬। ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা দেখা	প	অ	?
৩৭। বিবিধ বীজের নমুনা সংগ্রহ করা	প	অ	?
৩৮। খেলনা তৈরী করা	প	অ	?
৩৯। ঘড়ির মেরামতি কাজ করা	প	অ	?
৪০। ঘর-বাড়ী তৈরীর কাজ করা	প	অ	?
৪১। প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি আঁকা	প	অ	?
৪২। ফটো তোলা	প	অ	?
৪৩। ভ্রমণকাহিনী পড়া	প	অ	?
৪৪। অঙ্কের ধাঁধাঁ তৈরী করা	প	অ	?
৪৫। জন্তুজানোয়ার পোষা	প	অ	?

৪৬।	শাকসব্জীর বাগান করা	প	অ	?
৪৭।	মৌমাছি পালন করা	প	অ	?
৪৮।	হাঁস মুরগী পোষা	প	অ	?
৪৯।	কাঠের কাজ করা	প	অ	?
৫০।	রঙ তুলির কাজ করা	প	অ	?
৫১।	ফুলের বাগান করা	প	অ	?
৫২।	বক্তৃতা দেওয়া	প	অ	?
৫৩।	গান শেখা	প	অ	?
৫৪।	যন্ত্র বাজাতে শেখা	প	অ	?
৫৫।	ঘড়ি মেরামতের কাজ করা	প	অ	?
৫৬।	চামড়ার কাজ করা	প	অ	?
৫৭।	ধাতু শিল্পের কাজ করা	প	অ	?
৫৮।	বেচাকেনার কাজ করা	প	অ	?
৫৯।	সংবাদদাতার কাজ করা	প	অ	?
৬০।	রাসায়নিকের কাজ করা	প	অ	?
৬১।	রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করা	প	অ	?
৬২।	চাষব্যাস করা	প	অ	?
৬৩।	কুটীর-শিল্পের কাজ করা	প	অ	?
৬৪।	ক্ষেতখামারের কাজ করা	প	অ	?
৬৫।	দুধের ব্যবসা করা	প	অ	?
৬৬।	বইপত্র জুটিয়ে আনা	প	অ	?
৬৭।	দোকানদারি করা	প	অ	?
৬৮।	বনবিভাগের কাজ করা	প	অ	?

বিষয়ানুরাগ পরীক্ষা (৪)

নীচে ২০টি প্রশ্নগুচ্ছ আছে। প্রত্যেক গুচ্ছে তিনটি করে প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় তুমি সত্যিই যা কর বা করবে বা তোমার নিজের যা ভাল লাগে বা না লাগে সেই মত উত্তর দেবে ও সরলভাবে প্রকাশ করবে। প্রত্যেক গুচ্ছের তিনটি প্রশ্নে তিন রকম কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে যে কাজটি সবচেয়ে তোমার বেশী করার সম্ভাবনা বা বেশী পছন্দ তার উল্টো দিকে (১) লিখবে, যেটি সবচেয়ে কম করার সম্ভাবনা সেখানে (৩) লিখবে, আর যেখানে তুমি কাজটিকে খুব পছন্দ বা অপছন্দ কিছুই কর না সেখানে (২) দেবে। এমনি করে প্রত্যেক প্রশ্ন গুচ্ছেরই উত্তর দিয়ে যাবে।

(ক) ছুটির দিনে বাড়ীতে বসে তুমি কি কোন প্রবন্ধ লিখবে ?

ছুটির দিনে বাড়ীতে বসে তুমি কি কোন ভাঙ্গা ঘড়ি নিয়ে সারাবার চেষ্টা করবে ?

ছুটির দিনে বাড়ীতে বসে তুমি কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গল্প পড়বে ?

(খ) তোমার অবসরগুলির বেশীর ভাগ কি গানবাজনা করে কাটাও ?

তোমার অবসগুলির বেশীর ভাগ কি অঙ্ক বা ধাঁধার উত্তর করে কাটাও ?

তোমার অবসরগুলির বেশীর ভাগ কি কলকারখানা দেখে কাটাও ?

(গ) বাড়ীতে বসে তুমি কি টুকিটাকি ভাঙ্গা ঘড়ি বা যন্ত্রপাতি সারার চেষ্টা কর ?

বাড়ীতে বসে তুমি কি বিজ্ঞানের কথা বেশীর ভাগ পড় ?

বাড়ীতে বসে তুমি কি গাছপালা নিয়ে সময় কাটাও ?

(ঘ) অন্য বইয়ের তুলনায় বিজ্ঞানের বই বেশী পড় কি না ?

তুমি কি হাতে সময় পেলে বেশীর ভাগ বাগানের কাজ কর ?

তুমি কি প্রায়ই তোমার পড়ার ঘরটিকে ছবি দিয়ে সাজাও ?

(ঙ) কোন স্টেশনে গিয়ে বেশ কিছু সময় হাতে থাকলে তুমি কি কখনও ফেরীওয়ালাদের কাছ থেকে তাদের লাভ ক্ষতির কথা জিজ্ঞেস কর ?

কোন স্টেশনে গিয়ে বেশ কিছু সময় হাতে থাকলে তুমি কি ইঞ্জিনের খুঁটিনাটি জানবার চেষ্টা করবে ?

কোন স্টেশনে গিয়ে বেশ কিছু সময় হাতে থাকলে তুমি কি কোন সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা কিনবে ?

(চ) কোন বর্ষার দিনে তুমি কি তোমার সংগৃহীত গাছের বীজ বেছে ফেলার চেষ্টা করবে ?
কোন বর্ষার দিনে তুমি কি দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী মন দিয়ে পড়বে ?
কোন বর্ষার দিনে তুমি কি কোন তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পড়ে সময় কাটাবে ?

(ছ) তোমার পড়ার সময় ছাড়াও তুমি কি ব্যাকরণ বা প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা কর ?
তোমার পড়ার সময় ছাড়াও তুমি কি কলকব্জা ও টুকিটাকি জিনিষ নিয়ে সময় কাটাও ?
তোমার পড়ার সময় ছাড়াও তুমি কি উদ্ভিদের জীবন সম্পর্কে জানবার চেষ্টা কর ?

(জ) স্কুলের ছুটির পর তুমি কি নির্জ্জন জায়গায় গিয়ে ছবি আঁকবে ?
স্কুলের ছুটির পর তুমি কি বিজ্ঞান কক্ষে গিয়ে বিজ্ঞানের সরঞ্জাম লক্ষ্য করবে ?
স্কুলের ছুটির পর তুমি কি খবরের কাগজের বাঘের ধাঁধার সমাধান করবার চেষ্টা করবে ?

(ঝ) হঠাৎ কোনদিন স্কুলের ছুটি হয়ে গেলে স্কুলের যে ঘরে ছোটখাট যন্ত্রপাতি থাকে সেখানে গিয়ে কি কোন হাতের জিনিষ তৈরী কর ?
হঠাৎ কোনদিন স্কুলের ছুটি হয়ে গেলে কোন নির্জ্জন ঘরে গিয়ে কি কবিতা লিখবে ?
হঠাৎ কোনদিন স্কুলের ছুটি হয়ে গেলে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদের কাজকর্ম্ম কি লক্ষ্য কর ?

(ঞ) অন্য সব ক্লাসের চেয়ে বিজ্ঞানের ক্লাস তোমার কি ভাল লাগে ?
সময় পেলেই তুমি কি বাড়ীতে শাকসব্জি উৎপন্ন করবার চেষ্টা কর ?
সময় পেলেই তুমি কি বাড়ীর মাসিক দোকান বাজারের হিসাব-পত্র করে আনন্দ পাও ?

(ট) বাড়ীতে কোন টাইপ মেসিন থাকলে টাইপ করে তুমি কি কিছু পয়সা আয়ের চেষ্টা করবে ?

লাইব্রেরীতে বসে তুমি কি সবচেয়ে বিজ্ঞানের কথা বেশী করে জানতে চাইবে ?

লাইব্রেরীতে বসে ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করবে ?

(ঠ) সুবিধে পেলে গ্রামে গিয়ে চাষীদের সঙ্গে ফসল সার বীজ সম্পর্কে আলাপ করবে ?

হাতে কিছু টাকা পেলে তুমি কি তা দিয়ে আঁকার সরঞ্জাম কিনবে ?

সময় থাকলে কারও দোকানে গিয়ে ব্যবসা শিখবার চেষ্টা করবে ?

(ড) হাতের সামনে অনেক রকম কাজ থাকলে তার মধ্যে তুমি কি অঙ্কের বা ভূগোলের সমাধান আগে করতে চাইবে ?

হাতের সামনে অনেক রকম কাজ থাকলে তার মধ্যে তুমি কি কাদামাটি দিয়ে কিছু গড়তে চাইবে ?

হাতের সামনে অনেক রকম কাজ থাকলে তার মধ্যে তুমি কি বীজের বাক্স ও তালিকা দিয়ে নাড়াচাড়া করবে ?

(ঢ) তুমি কি যে-কোন কলা-প্রদর্শনী কাছাকাছি হলে প্রায় যাও ?

তুমি কি খবরের কাগজে ব্যবসা-বাণিজ্যের খবর মন দিয়ে পড় ?

তুমি কি কোন পত্রিকায় বা হাতের লেখা কাগজে প্রবন্ধ দাও ?

(ণ) তোমার বেশীর ভাগ সময় কি কলকব্জা যন্ত্রপাতি নিয়ে কাটাতে ভালোবাস ? তোমার বেশীর ভাগ সময় কি বৈজ্ঞানিকদের জীবন-বৃত্তান্ত পড়ে কাটাও ? তোমার বেশীর ভাগ সময় কি বাড়ী বা ক্লাসের হিসেব-নিকেশ লিখে কাটাও ?

(ত) প্রাণীবিজ্ঞান বা শরীরতত্ত্ব বিষয় জানবার জন্য তুমি কি খুব চেষ্টা কর ?

তোমার খাতায় লিখতে লিখতে প্রায়ই কি তুমি নানা হিজিবিজি আঁকতে থাক ?

সময় থাকলে কোন ব্যবসা বিষয়ে জানবার জন্তে তুমি কি নানাভাবে চেষ্টা কর ?

(থ) তোমার হাতে কিছু টাকা পেলে তুমি কি তা দিয়ে সাময়িক লাভের চেষ্টা করবে ?

তোমার হাতে কিছু টাকা পেলে তুমি কি তা দিয়ে ফুলফলের বীজ কিনবে ?

তোমার হাতে কিছু টাকা পেলে তুমি কি তা দিয়ে বিশ্বসাহিত্যের বই কিনবে ?

(দ) তুমি কি কাছাকাছি কোন কৃষি প্রদর্শনী হলে তাতে অবশ্যই যাবে ?
অবসর সময়ে তুমি কি যে-কোন ছবিতে বসে বসে রঙ লাগাবে ?
অবসর সময়ে তুমি কি কোন ছোটখাট যন্ত্রের অংশ বিশ্লেষণ কর ?

(ধ) কোথাও বেড়াতে গেলে তুমি কি সেই জায়গার ঘটনা নিয়ে গল্প বা কাব্য রচনা কর ?
কোথাও বেড়াতে গেলে তুমি কি সেই স্থানের সস্তার জিনিস ও ব্যবসা সম্পর্কে জেনে নাও ?
কোথাও বেড়াতে গেলে তুমি কি সেখানকার স্থানীয় যন্ত্রশিল্প আগে দেখতে যাও ?

(ন) তোমার বন্ধুদের কাছ থেকে তুমি কি প্রায়ই বাগানের জন্যে চারাগাছ সংগ্রহ কর ?
সময় মত সস্তায় কোন দরকারী জিনিষ কিনে তুমি কি পরে বেশী দামে বিক্রয় করার চেষ্টা কর ?
যেখানে যেখানে তুমি যাও সেখান থেকে কি টুকিটাকি যন্ত্র বা কলকজা সংগ্রহ করে নিয়ে এস ?

ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা

নির্দ্দেশঃ প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ছবি ও কাজ আছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তুমি তোমার পছন্দমত যে-কোন একটি কাজ বেছে নাও।

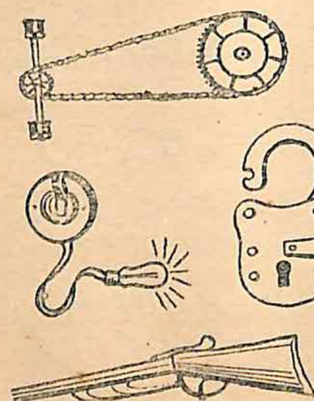
শূন্যস্থান পূর্ণ কর

নীলদর্পন

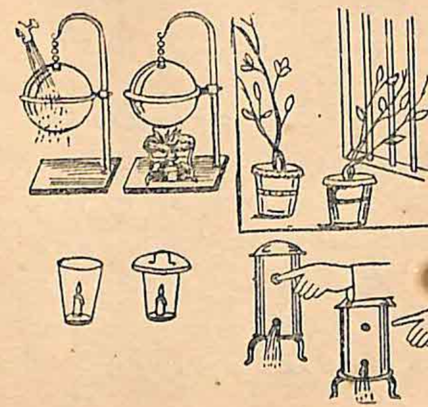
লেখকের নাম

আনুমানিক রচনা কাল

নীচের জিনিষগুলিতে ঠিক যেখানে ভুল আছে, সেখানে ছোট করিয়া লাল পেন্সিল দিয়া Cross (×) চিহ্ন দাও।



নীচে চারজোড়া ভিন্ন ভিন্ন ছবি আছে। প্রত্যেক জোড়ার মধ্যে একটি ভুল ছবি আছে। যেটি ভুল সেটির উপর Cross (×) চিহ্ন দাও।



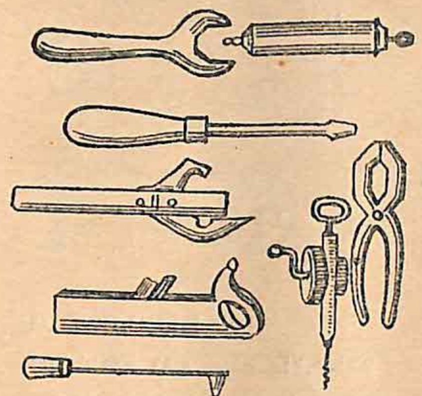
শূন্যস্থান পূর্ণ কর

মানব ও সমাজ

লেখকের নাম: রা...

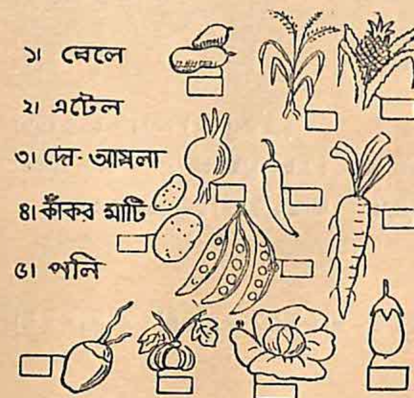
আনুমানিক রচনা কাল:

নীচের কোন্ জিনিষ দিয়া কি কাজ করা হয় তাহা জিনিষগুলির গায়ে সংক্ষেপে লিখিয়া দাও।



নীচের ছবিতে যে যে গাছের ফসল দেওয়া আছে উহারা কোন্ মাটিতে ভালো জন্মায়, তাহা সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত কর। যে গাছ যে মাটিতে ভালো জন্মায়, মাটির সেই সংখ্যা ছবির নীচের ঘরে বুঝিয়া বসাও। উদাহরণ—বেলে মাটির সংখ্যা ১—এখন যে ফসল বেলে মাটিতে ভালো জন্মাবে তার নীচে ১ বসিবে।

১। বেলে
২। এটেঁল
৩। দো-আঁশলা
৪। কাঁকর মাটি
৫। পলি



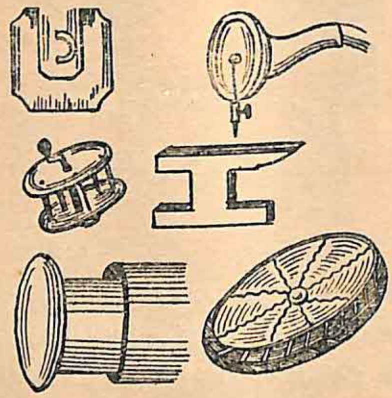
শূন্যস্থান পূর্ণ কর

[ ]

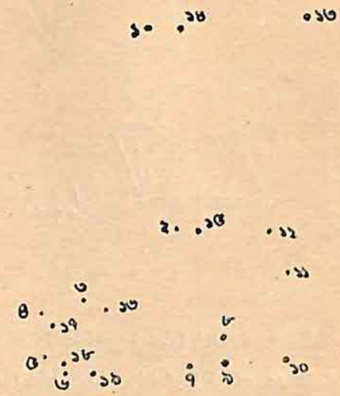
সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক [ ]

১৯৫৬

কোন্ জিনিষটিকে কোথায় বা কোন্ জিনিষের সঙ্গে দেখিয়া থাক ?



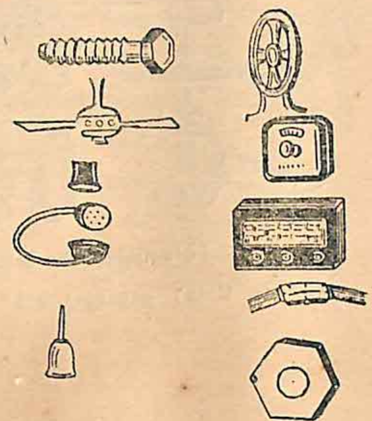
নীচে কয়েকটি বিন্দু দেওয়া আছে ও প্রত্যেক বিন্দুর এক একটি নম্বর আছে। নম্বরগুলি পরপর যোগ করিলে কি হইবে বল।



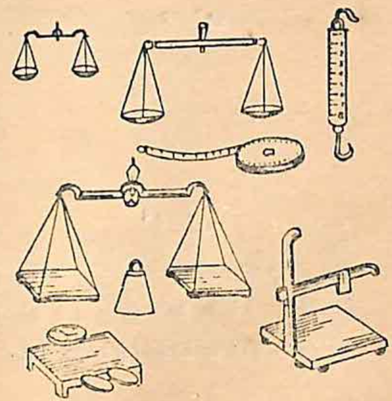
নীচে তিনজন মনীষীর ছবি দেওয়া আছে। তাঁহাদের নামের ডানদিকের স্থানে তাঁহাদের রচিত যে কোন একটি রচনা বা গ্রন্থের নাম লিখ।



নীচে বাঁ দিকে পাঁচটি ও ডান দিকে পাঁচটি জিনিষ আছে। বাঁ দিকের কোন্ জিনিষের সঙ্গে ডান দিকের কোন জিনিষের সম্পর্ক আছে তাহা নম্বর দিয়া বুঝাও। যে জিনিষের সঙ্গে যে জিনিষের সম্পর্ক আছে তাদের দুটিরই এক নম্বর দিবে।



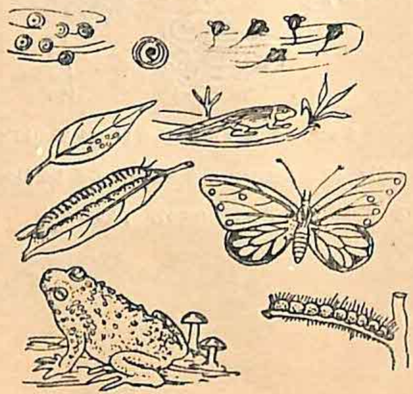
নীচে কয়েক রকম মাপ দেওয়া আছে। কোন্ মাপ কোথায় বা কোন্ কাজে লাগে তাহা মাপগুলির গায়ে লিখিয়া দাও।



নীচে কয়েকটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্মৃতির ছবি আছে। কোন্ স্মৃতি কোন্ স্থানে কোন্ সময় নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল—নিৰ্দ্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া দাও।



ছবিটির মধ্যে দুটি প্রাণীর জীবনের ভিন্ন স্তর আঁকা আছে। প্রথম প্রাণীটির স্তরগুলি পর পর ১, ২, ৩, ৪ সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করিয়া বুঝাইয়া দাও। দ্বিতীয় প্রাণীটির স্তর পর পর ক, খ, গ, ঘ দিয়া বুঝাইয়া দাও।



যে ফসল যে ঋতুতে বেশী জন্মায় তা সংখ্যা দিয়া চিহ্নিত কর। যে ফসল গ্রীষ্মকালে বেশী জন্মায়—তার গায়ে ১ নং বসাও, এরূপভাবে বসিয়ে যাও।

১। গ্রীষ্ম
২। বর্ষা
৩। শরৎ
৪। হেমন্ত
৫। শীত
৬। বসন্ত



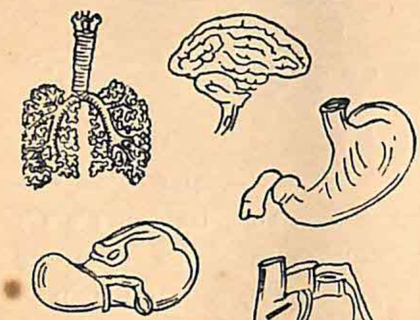
শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

নীলদর্পন

লেখকের নাম

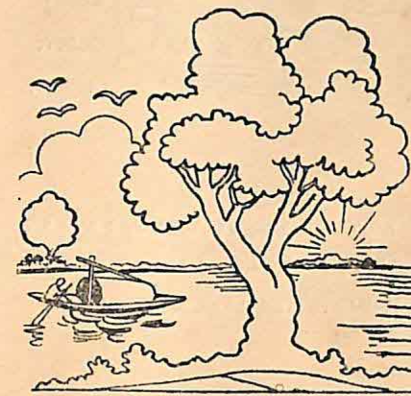
আনুমানিক রচনা কাল

নীচে দেহের কয়েকটি অংশ দেখান আছে ও কয়েকটি সংখ্যাচিহ্নিত নাম আছে। যে নামের সংখ্যা যে অংশের উপর বসিবে বসাইয়া দাও।



১। ফুসফুস ২। মস্তিষ্ক ৩। পাকস্থলী ৪। যকৃৎ ৫। হৃৎপিণ্ড

নীচে একটি ছবি আছে। যেখানে যে রঙ দিলে মানায় তা রঙের পেন্সিলের সাহায্যে দিয়া যাও।



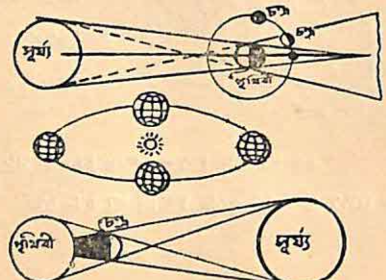
শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

মানব ও সমাজ

লেখকের নাম: রা...

আনুমানিক রচনা কাল:

নীচের তিনটি ছবির মধ্যে কোন্‌টি কি বুঝায়, ছবির উপর লিখিয়া দাও।



নীচের জিনিষগুলিতে কোন্‌টি কোন্ ব্যবসায়ে লাগে? যদি একের বেশী জিনিষ একটি ব্যবসায়ে লাগে তবে তাদের সবগুলিতে একই চিহ্ন দিয়া বুঝাইয়া দাও।



শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক

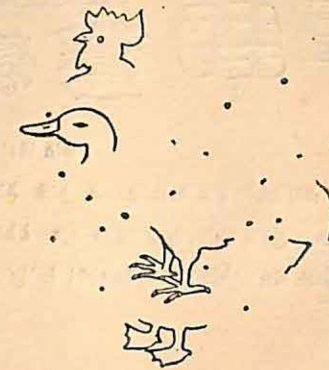
১৯৫৬

যে সার যে গাছের পক্ষে বেশী উপযোগী সেই সারের নম্বর গাছের নীচের ঘরে বসাও।

১ গোবর
২ কম্পোষ্ট
৩ ছাই
৪ খৈল



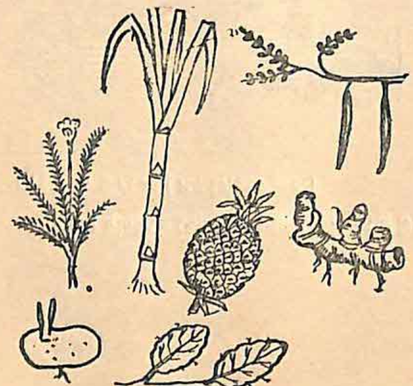
নীচের বিন্দুগুলি এমনভাবে যোগ কর যে দুটি ভিন্ন পাখী পাওয়া যাইবে।



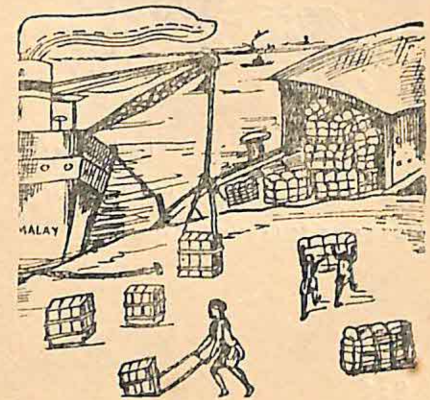
নীচে তিনজন মনীষীর ছবি দেওয়া আছে। তাঁহাদের নামের ডানদিকের স্থানে তাঁহাদের রচিত যে কোন একটি রচনা বা গ্রন্থের নাম লিখ।



নীচের গাছগুলির যে অংশ মাটিতে পুতিলে নূতন গাছ জন্মায় তাহা গাছের নীচে লিখিয়া দাও।



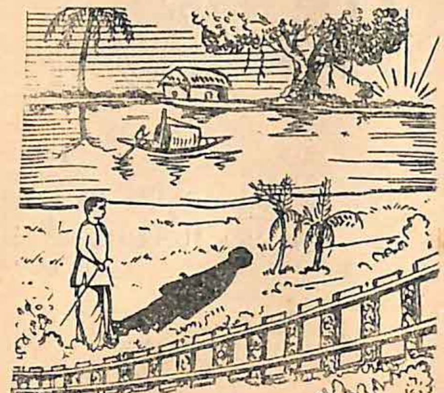
ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে নীচের ছবিটির কোন সম্পর্ক থাকিলে ছবিটি কি বুঝায় এক কথায় লিখিয়া দাও।



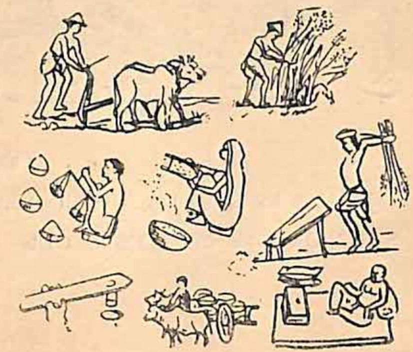
নীচে কয়েকটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্মৃতির ছবি আছে। কোন্ স্মৃতি কোন্ স্থানে কোন্ সময় নির্মিত হইয়াছিল—নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া দাও।



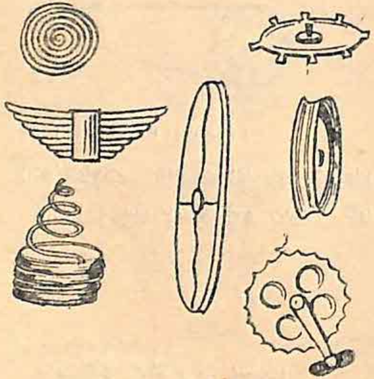
নীচের ছবিটিতে যেখানে যেখানে ভুল আছে ঠিক সেই স্থানে Cross (×) চিহ্নিত কর।



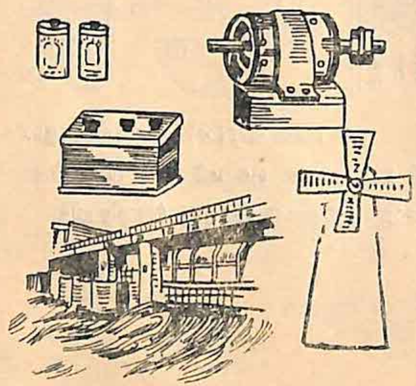
ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে নীচের ছবিটির কোন সম্পর্ক থাকিলে ছবিটি কি বুঝায় এক কথায় লিখিয়া দাও।



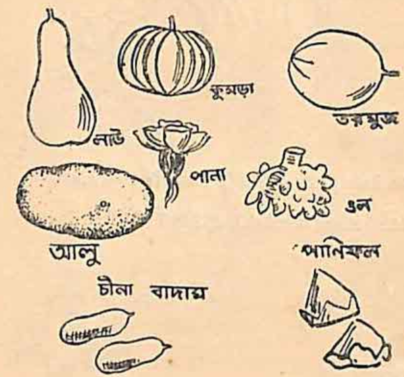
নীচে কয়েকটি স্প্রিং ও চাকা আছে। কোন্ স্প্রিং ও কোন্ চাকা কোথায় ব্যবহৃত হয় তাহা জিনিষগুলির গায়ে লিখিয়া দাও।



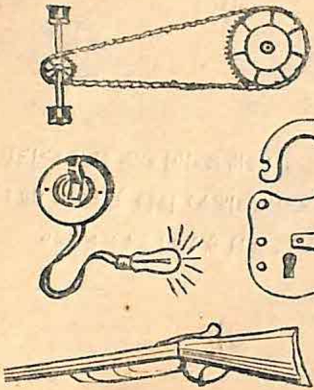
কোন্‌টিকে কি বলে, ছবির নীচে নীচে লিখিয়া দাও।



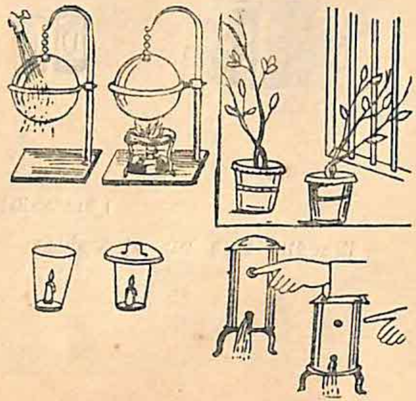
নীচের ফসলগুলির মধ্যে কোন্‌টি জলে, কোন্‌টি স্থলে, কোন্‌টি মাটিতে, কোন্‌টি মাটির নীচে, কোন্‌টি বা মাচাতে হয় তাহা ফসলটির গায়ে সংক্ষেপে লিখিয়া দাও।



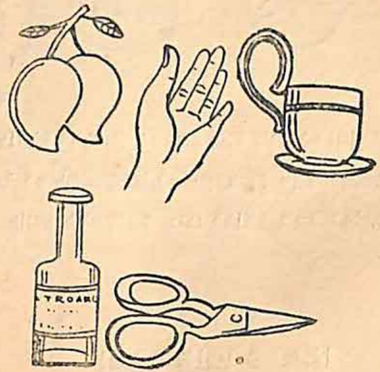
নীচের জিনিষগুলিতে ঠিক যেখানে ভুল আছে, সেখানে ছোট করিয়া লাল পেন্সিল দিয়া Cross (×) চিহ্ন দাও।



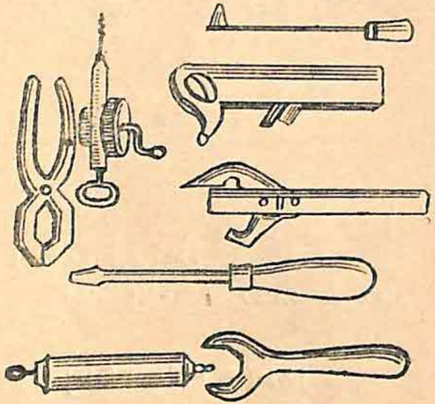
নীচে চারজোড়া ভিন্ন ভিন্ন ছবি আছে। প্রত্যেক জোড়ার মধ্যে একটি ভুল ছবি আছে। যেটি ভুল সেটির উপর Cross (×) চিহ্ন দাও।



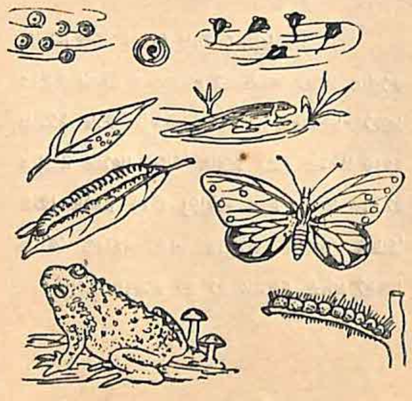
নীচের ছবিটিতে যেখানে যেখানে ভুল বা অস্বাভাবিকতা আছে ঠিক সেই স্থান চিহ্নিত কর।



নীচের কোন্ জিনিষ দিয়া কি কাজ করা হয় তাহা জিনিষগুলির গায়ে সংক্ষেপে লিখিয়া দাও।



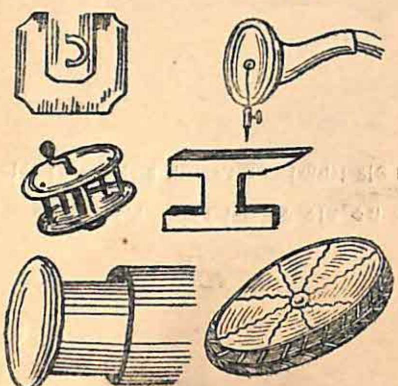
ছবিটির মধ্যে দুটি প্রাণীর জীবনের ভিন্ন স্তর আঁকা আছে। প্রথম প্রাণীটির স্তরগুলি পর পর ১, ২, ৩, ৪ সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করিয়া বুঝাইয়া দাও। দ্বিতীয় প্রাণীটির স্তর পর পর ক, খ, গ, ঘ দিয়া বুঝাইয়া দাও।



উপরে ও নীচে তিনটি তিনটি করিয়া ছবি আছে। উপরের কোন্ ছবিটির নীচের কোন ছবিটির সঙ্গে সম্পর্ক আছে তাহা একই সংখ্যা দিয়া বুঝাও।



কোন্ জিনিষটিকে কোথায় বা কোন্ জিনিষের সঙ্গে দেখ?

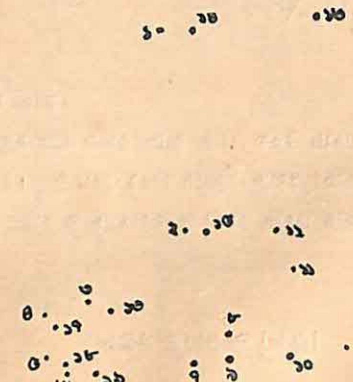


নীচের ছবিতে যে যে গাছের ফসল দেওয়া আছে, উহারা কোন্ মাটিতে ভালো জন্মায়, তাহা সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত কর। যে গাছ যে মাটিতে ভালো জন্মায়, মাটির সেই সংখ্যা ছবির নীচের ঘরে বুঝিয়া বসাও। উদাহরণ—বেলে মাটির সংখ্যা ১—এখন যে ফসল বেলে মাটিতে ভালো জন্মাবে তার নীচে ১ বসিবে।

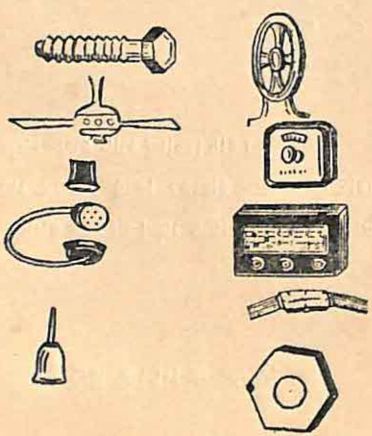
১। বেলে
২। এটেঁল
৩। দেন্ন-আমলা
৪। কাঁকর মাটি
৫। পলি



নীচে কয়েকটি বিন্দু দেওয়া আছে ও প্রত্যেক বিন্দুর এক একটি নম্বর আছে। নম্বরগুলি পরপর যোগ করিলে কি হইবে বল।



নীচে বাঁ দিকে পাঁচটি ও ডান দিকে পাঁচটি জিনিষ আছে। বাঁ দিকের কোন্ জিনিষের সঙ্গে ডান দিকের কোন্ জিনিষের সম্পর্ক আছে তাহা নম্বর দিয়া বুঝাও। যে জিনিষের সঙ্গে যে জিনিষের সম্পর্ক আছে তাদের দুটিরই এক নম্বর দিবে।

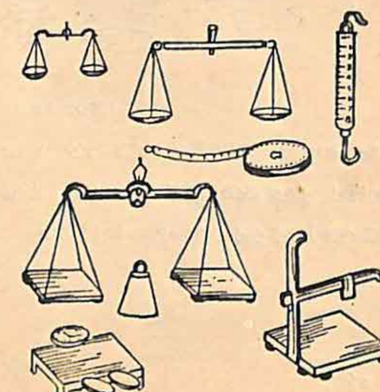


যে ফসল যে ঋতুতে বেশী জন্মায় তা সংখ্যা দিয়া চিহ্নিত কর। যে ফসল গ্রীষ্মকালে বেশী জন্মায়—তার গায়ে ১ নং বসাও, এরূপভাবে বসিয়ে যাও।

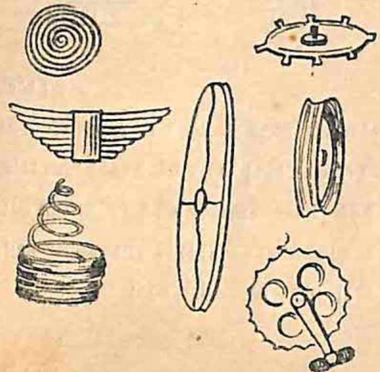
১। গ্রীষ্ম
২। বর্ষা
৩। শরৎ
৪। হেমন্ত
৫। শীত
৬। বসন্ত



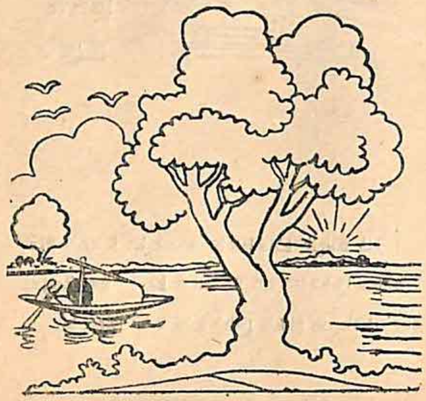
নীচে কয়েক রকম মাপ দেওয়া আছে। কোন্ মাপ কোথায় বা কোন্ কাজে লাগে তাহা মাপগুলির গায়ে লিখিয়া দাও।



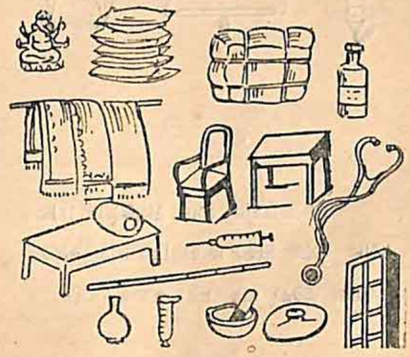
নীচে কয়েকটি স্প্রিং ও চাকা আছে। কোন্ স্প্রিং ও কোন্ চাকা কোথায় ব্যবহৃত হয় তাহা জিনিষগুলির গায়ে লিখিয়া দাও।



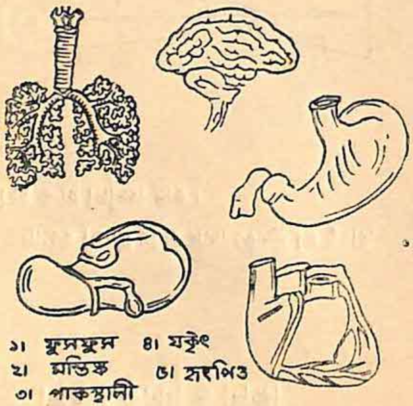
নীচে একটি ছবি আছে। যেখানে যে রঙ দিলে মানায় তা রঙের পেন্সিলের সাহায্যে দিয়া দাও।



নীচের জিনিষগুলিতে কোনটি কোন্ ব্যবসায়ে লাগে? যদি একের বেশী জিনিষ একটি ব্যবসায়ে লাগে তবে তাদের সবগুলিতে একই চিহ্ন দিয়া বুঝাইয়া দাও।



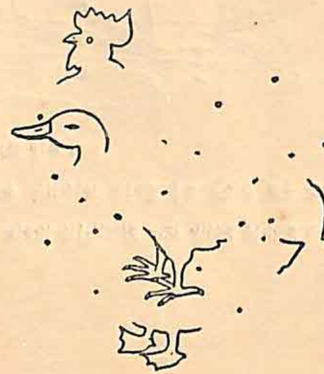
নীচে দেহের কয়েকটি অংশ দেখান আছে ও কয়েকটি সংখ্যাচিহ্নিত নাম আছে। যে নামের সংখ্যা যে অংশের উপর বসিবে বসাইয়া দাও।



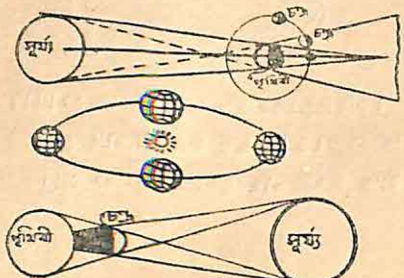
যে সার যে গাছের পক্ষে বেশী উপযোগী সেই সারের নম্বর গাছের নীচের ঘরে বসাও।



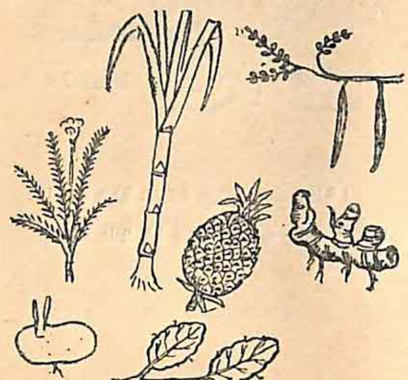
নীচের বিন্দুগুলি এমনভাবে যোগ কর যে দুটি ভিন্ন পাখী পাওয়া যাইবে।



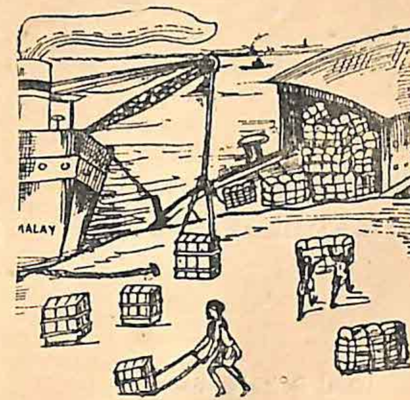
নীচের তিনটি ছবির মধ্যে কোন্‌টি কি বুঝায়, ছবির উপর লিখিয়া দাও।



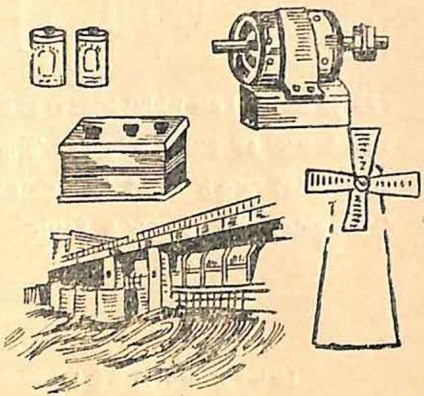
নীচের গাছগুলির যে অংশ মাটিতে পুতিলে নূতন গাছ জন্মায় তাহা গাছের নীচে লিখিয়া দাও।



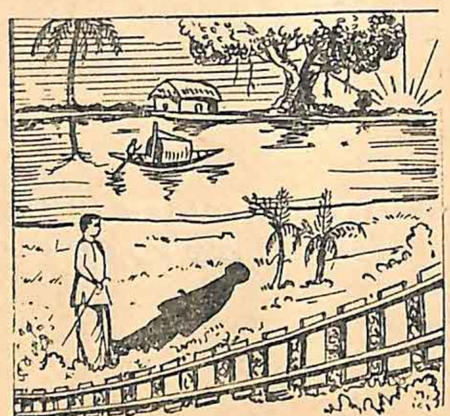
ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে নীচের ছবিটির কোন সম্পর্ক থাকিলে ছবিটি কি বুঝায় এক কথায় লিখিয়া দাও।



কোন্‌টিকে কি বলে, ছবির নীচে নীচে লিখিয়া দাও।



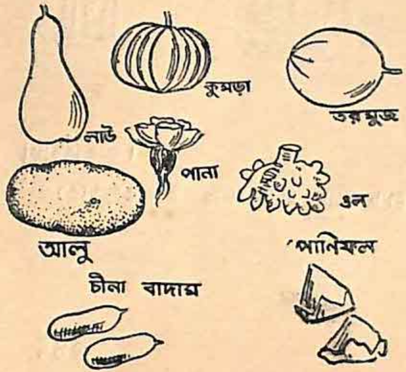
নীচের ছবিতে যেখানে যেখানে ভুল আছে ঠিক সেই স্থানে Cross (×) চিহ্নিত কর।



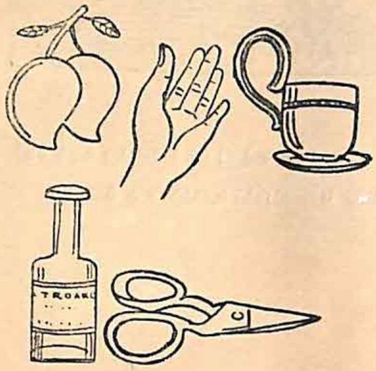
নীচের ছবিটির মধ্যে কোন ব্যবসায় ভিন্ন ভিন্ন স্তর দেওয়া আছে। কাহার পর কি স্তর তাহা পরপর ছবির গায়ে সংখ্যা দিয়া বুঝাও।



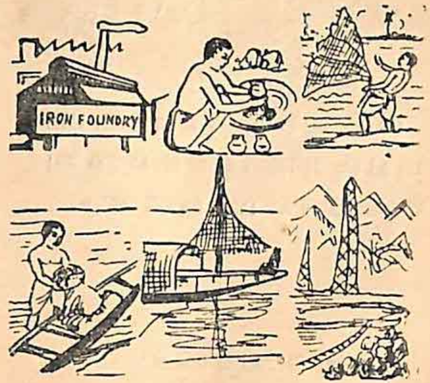
নীচের ফসলগুলির মধ্যে কোনটি জলে, কোনটি স্থলে, কোনটি মাটিতে, কোনটি মাটির নীচে, কোনটি বা মাচাতে হয় তাহা ফসলটির গায়ে সংক্ষেপে লিখিয়া দাও। শূন্যস্থান পূর্ণ কর।



নীচের ছবিটিতে যেখানে যেখানে ভুল বা অস্বাভাবিকতা আছে ঠিক সেই স্থান চিহ্নিত কর।



নীচের ছবিটির মধ্যে কোন ব্যবসার ভিন্ন ভিন্ন স্তর দেওয়া আছে। কাহার পর কি স্তর তাহা পরপর ছবির গায়ে সংখ্যা দিয়া বুঝাও।



বিষয়ানুরাগ পরীক্ষা (৫)

নির্দ্দেশ ঃ প্রত্যেক পৃষ্ঠার প্রত্যেক পঙক্তিতে ছয়টি করিয়া খবর আছে। ছয়টি খবরের মধ্যে যে খবরটি সম্পর্কে তুমি বেশী কৌতূহলী কেবলমাত্র তাহার নীচে দাগ দাও। পর পর ১০টি পৃষ্ঠায় খবর পড়িয়া এরূপভাবে দাগ দিয়া যাও।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার

ভারতে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাবার মত সাহিত্যিক আজ নেই বললে ভুল হয়। তবে তাঁদের সাহিত্যিক দৃষ্টি হয়ত আজ ঠিক পথে নির্দ্দিষ্ট নয়। অধিকাংশই সাময়িক রুচিকে প্রাধান্য দিয়ে সাহিত্যের চিরন্তন সুরটিকে বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত নন।

ইঞ্জিনের কারখানায় নূতন যন্ত্রের আমদানী

এবার চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিনের কারখানায় বয়লার তৈয়ারীর জন্য একটি নূতন ধরণের বিরাট যন্ত্রের আমদানী করা হয়েছে। যন্ত্রটি একসাথে ৪০জন লোকের কাজ করিতে পারে ও বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালিত হয়।

মঙ্গলগ্রহ হইতে প্রথম নাদ-তরঙ্গ মার্কিণ রেডিও টেলিস্কোপে ধৃত

মার্কিণ নৌবাহিনী ঘোষণা করিয়াছে যে মঙ্গলগ্রহ হইতে সর্ব্বপ্রথম মার্কিণ যন্ত্রে শব্দতরঙ্গ পাওয়া যায়। মঙ্গল যখন সবচেয়ে নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল তখন এই শব্দতরঙ্গ ধরা পড়ে। ৬০ ইঞ্চি রেডিও-টেলিস্কোপে এই নাদ-তরঙ্গ ধরা পড়িয়াছে।

কালিদাস স্মৃতি উৎসব

মস্কো বিশ্ব-শান্তি সংসদের আবেদনে এবছর নভেম্বর মাসে রাশিয়ার রঙ্গমঞ্চে কালিদাসের নাটকের অভিনয় ও তাঁর কাব্য নিয়ে সমালোচনা হয়। রাশিয়ার কোন প্রখ্যাত সাহিত্যিকের মতে শকুন্তলা গুপ্ত-রাজত্বকালের সাংস্কৃতিক মহাকোষের মত। কালিদালের অমর প্রতিভার উদ্দেশ্যে এই সংসদ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রকাশ করেন।

রেডিওর নূতন মডেল

ক্রিষ্টালের সাহায্যে অতি অল্প খরচে রেডিও তৈয়ারী সম্ভবপর। এই যন্ত্রের সরঞ্জাম হিসাবে ক্রিষ্টাল, কয়েল, হেডফোন ব্যবহৃত হয়। বেতারকেন্দ্র হইতে ৪০ মাইলের মধ্যে বিনা বৈদ্যুতিক শক্তিতে এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রোগ্রাম শোনা যায়।

পাটের শ্রেষ্ঠ শত্রু

পাটের চাষ বৃদ্ধির জন্য এক বিশেষ গবেষণায় প্রকাশিত তথ্য এই যে, পাটের শ্রেষ্ঠ শত্রু একপ্রকার কীট। এই কীট ধ্বংস করিবার জন্য একপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োগ কার্য্যকরী। পাটের পাতায় এই দ্রব্য ছিটাইয়া দিতে হয়

কলিকাতায় রচনা প্রতিযোগিতা

এবছরে ২০ বৎসরের নীচে নিখিল-ভারত-রচনা প্রতিযোগিতায় বঙ্গভারতী তিনটি বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। রচনার বিষয়বস্তু 'বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠায়' ভারতের দান।

সেলাইয়ের কলে নূতন যান্ত্রিক ব্যবস্থা

এবার কুটীর-শিল্পের এক প্রদর্শনীতে একটি নূতন ধরণের সেলাইয়ের কল সকলের বিস্ময় সঞ্চার করে। কলটিতে যে কোন কাপড় সেলাইয়ের জন্যে রাখলে আপনা থাকতে কাপড়টি সরে সরে যায় ও সেলাই হ'য়ে যায়।

অভিনয় শিল্পের নূতন অধ্যায়

রঙ্গমঞ্চ ও ফিল্মে আজ নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে। এমন কি আজ ফিল্মে সংলাপ ও সঙ্গীতকে প্রাধান্য না দিয়া ভাবের দিক হইতে নূতনত্বের প্রয়োজন স্বীকার করা হইতেছে।

ঐতিহাসিক তথ্যের নূতন গবেষণা

বাংলাদেশের প্রথম পত্তনের সময় কাল সম্পর্কে এক নূতন গবেষণা স্থরু হইয়াছে। কবে কোন্ রাজত্বকালে বাঙলা দেশের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হয় সে সম্পর্কেও নূতন আলোকপাত করা এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

কাপড় ধোলাইয়ের জন্যে নূতন যন্ত্রের আমদানী

অল্প সময়ে ও অল্প আয়াসে যাতে অনেক কাপড় এক সঙ্গে ধোলাই করা যায় সেজন্যে তড়িৎচালিত এক প্রকার যন্ত্র আজ প্রবর্ত্তিত হয়েছে। এই যন্ত্রের মধ্যে কাপড়চোপড় সাবান গোলা জলে ঘুরতে থাকে ও ক্রমশঃ পরিষ্কার হতে থাকে।

বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানী হ্রাসের আবশ্যকতা

একটি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের এক অধিবেশনে ভারতের বাইরের দেশ থেকে আমদানী কমাবার এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যাতে দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের সমাদর হয় সেদিকেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

আগ্রায় বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন

সম্প্রতি আগ্রায় যে বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রবোধকুমার সান্যাল, নীহার রঞ্জন রায়, প্রমুখ সাহিত্যিক যোগদান করেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবির। তাঁহার মতে বঙ্গ-সাহিত্যের আজ এক সন্ধিক্ষণ।

শক্তির উৎস প্রাকৃতিক গ্যাস

প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে প্রচণ্ড শক্তি উৎপাদন করা কিরূপে সম্ভব, ভূগর্ভে প্রাকৃতিক গ্যাস কি ক'রে এল এ নিয়ে নানা মত আছে। তবে অনেকেই মনে করেন পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্ম একই বস্তু থেকে। বিশ্লেষণ ক'রে দেখা গিয়াছে যে এদের উপাদানগুলি কার্বণ ও হাইড্রোজেন সমন্বয়ে গঠিত।

স্যাণ্ড-কালচার পদ্ধতিতে শাকসব্জির চাষ

জমি ছাড়াও শাকসব্জি উৎপাদন করা যায়। ইচ্ছা থাকিলে রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বাড়ীর ছাদে শাকসব্জির চাষ করিতে পারেন। এই চাষ প্রণালীতে বালি এবং নুড়ি পাথর একত্র মিশাইয়া একরকম রাসায়নিক প্রয়োগ করিলে আনাজপাতি, ফলফুল জন্মান যায়।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার

ভারতে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাবার মত সাহিত্যিক আজ নেই বললে ভুল হয়। তবে তাঁদের সাহিত্যিক দৃষ্টি হয়ত আজ ঠিক পথে নির্দ্দিষ্ট নয়। অধিকাংশই সাময়িক রুচিকে প্রাধান্য দিয়ে সাহিত্যের চিরন্তন সুরটিকে বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত নন।

নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

বিজ্ঞানে এক যুগান্তরের সূচনা হইয়াছে। আমেরিকায় বৈজ্ঞানিকগণ আজ জীব উৎপাদনের এক নূতন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করিয়াছেন। এক জটিল বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় এই সৃষ্টি সম্ভবপর হয়।

ভারতীয় সঙ্গীতের আসর

ভারতীয় সঙ্গীতের আসরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বোদ্ধা আজ ক্রমশঃই কমে আসছে। সম্প্রতি দিল্লীতে একটি আসরে শুভলক্ষ্মী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে এক অপূর্ব্ব সাফল্যের পরিচয় দিয়াছেন। পরে ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা হয়।

কলিকাতায় রচনা প্রতিযোগিতা

এবছরে ২০ বৎসরের নীচে নিখিল-ভারত-রচনা প্রতিযোগিতায় বঙ্গভারতী তিনটি বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। রচনার বিষয়বস্তু 'বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠায়' ভারতের দান।

ঐতিহাসিক তথ্যের নূতন গবেষণা

বাংলাদেশের প্রথম পত্তনের সময় কাল সম্পর্কে এক নূতন গবেষণা স্থরু হইয়াছে। কবে কোন্ রাজত্বকালে বাংলা দেশের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হয় সে সম্পর্কেও নূতন আলোকপাত করা এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

সূর্য্যের তাপহ্রাস

একদল বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস করেন যে সূর্য্যেরও তাপ হ্রাস পাচ্ছে। এই তাপ পরিমাপ করবার জন্যও যন্ত্রের আবিষ্কার করার চেষ্টা চলেছে, তবে কি পরিমাণে সূর্য্যের তাপহ্রাস হ'য়েছে সে নিয়েও গবেষণা চ'লেছে।

বীজ সংরক্ষণের উপায়

যাতে অনেকদিন ধরে বীজ সংরক্ষণ করা যায় সেজন্যে চাষীরা আজ আগ্রহ প্রকাশ করছেন। এজন্যে বীজকে সংরক্ষিত স্থানে এমনভাবে রাখতে হয় যাতে জল হাওয়া বেশী না লাগে। মাঝে মাঝে বীজের ওপর নানা রাসায়নিক দ্রব্য ছড়িয়ে দিতে হয়।

শিল্পবাণিজ্যের গতি

বিশ্ব-পরিস্থিতির অনিশ্চিত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থাও জটিল হয়ে পড়েছে। দেশের শিল্প বিদেশী শিল্পের তুলনায় এখনও পিছিয়ে আছে। তাছাড়া আবার যুদ্ধের সন্ত্রাস এখনও রয়েছে। ফলে শিল্পের স্বাভাবিক গতি নেই।

মৃৎ-শিল্প প্রদর্শনী

সম্প্রতি কলিকাতায় এক মৃৎশিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। এই প্রদর্শনীতে নানারকমের প্রতিমা ও মাটির নানা খেলনার আয়োজন হয়। দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল থেকে নানা শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী হয়।

আগ্রায় বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন

সম্প্রতি আগ্রায় যে বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রবোধ কুমার সান্যাল, নীহার রঞ্জন রায় প্রমুখ সাহিত্যিক যোগদান করেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবির। তাঁহার মতে বঙ্গ-সাহিত্যের আজ এক সন্ধিক্ষণ।

লাইনে পাটের চাষ

পাট লাইনে বুনিয়া যেসব সুফল পাওয়া গিয়াছে তাহা অপ্রত্যাশিত। হাতে ছিটাইয়া বুনিতে প্রতি একরে তিন সের দেশী ও পাঁচ সের তিতা পাটের বীজ লাগে।

অল্প মূলধনে ব্যবসা

বর্ত্তমানে সমবায় প্রথায় অল্প মূলধনে যাতে ব্যবসা চলতে পারে সে সুযোগ দেবার জন্যে সরকার এখন তৎপর। প্রতি দেশেই এই দিকে সরকারী দৃষ্টি ফিরেছে।

কালিদাস স্মৃতি উৎসব

মস্কো বিশ্ব-শান্তি সংসদের আবেদনে এবছর নভেম্বর মাসে রাশিয়ার রঙ্গমঞ্চে কালিদাসের নাটকের অভিনয় ও তাঁর কাব্য নিয়ে সমালোচনা হয়। রাশিয়ার কোন প্রখ্যাত সাহিত্যিকের মতে শকুন্তলা গুপ্ত-রাজত্বকালের সাংস্কৃতিক মহাকোষের মত। কালিদাসের অমর প্রতিভার উদ্দেশ্যে এই সংসদ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রকাশ করেন।

নৃত্যশিল্পীর অপূর্ব সাফল্য

ভারতের প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর ওয়াশিংটন শহরের রঙ্গমঞ্চে নটরাজ-নৃত্য দেখাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন। শিবের ধ্যানভঙ্গ এই রঙ্গমঞ্চে অপূর্ব্বরূপে রূপায়িত হয়।

নূতন কর-ধার্য্যের প্রস্তাবে শেয়ার বাজারের বিস্ময়

নূতন কর ধার্য্যের প্রস্তাবে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের শেয়ার বাজারে ফটকা ও অন্যান্য প্রধান প্রধান শেয়ারের দর যথেষ্ট হ্রাস পায়। এই প্রস্তাবে লেন-দেনকারীর মধ্যে বিস্ময় লক্ষিত হয়। কি কারণে নূতন কর ধার্য্য হ'ল তা নিয়েও সমালোচনা হয়।

ইঞ্জিনের কারখানায় নূতন যন্ত্রের আমদানী

এবার চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিনের কারখানায় বয়লার তৈয়ারীর জন্য একটি নূতন ধরণের বিরাট যন্ত্রের আমদানী করা হয়েছে। যন্ত্রটি একসাথে ৪০ জন লোকের কাজ করতে পারে ও বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালিত হয়।

উন্নত ধরণের ছাপাইবার যন্ত্র

আমেরিকায় এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহাতে কোন কিছু বলিবার সঙ্গে সঙ্গে ছাপা হইয়া যায়। এই ধরণের যন্ত্র তড়িৎ-চালিত ও উন্নত ধরণের বৈজ্ঞানিক প্রণালী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

পরমাণু পরিমাপের পদ্ধতি

আণবিক শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নিরূপণের জন্য একটি অদ্ভুত যন্ত্র আবিষ্কারের কথা শোনা যাইতেছে। ইহা খুবই বিস্ময়কর ও জটিল।

নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

বিজ্ঞানে এক যুগান্তরের সূচনা হইয়াছে। আমেরিকায় বৈজ্ঞানিকগণ আজ জীব উৎপাদনের এক নূতন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করিয়াছেন। এক জটিল বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় এই সৃষ্টি সম্ভবপর হয়।

বড় আকারের কপি জন্মাইবার সরঞ্জাম

কোন বিশিষ্ট কৃষিবিদ্ একটি কৃষি প্রদর্শনীতে একটি বিরাট কপির নমুনা দেন। কপিটি ওজনে আধমণ। তিনি বলেন, কপিটিতে উৎপাদন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয়।

চিত্র-শিল্পের অপূর্ব আয়োজন

শান্তিনিকেতন কলাভবন কেন্দ্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পীদের এক সমাবেশ হয়। ভারতীয় চিত্রশিল্পে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়ের প্রতিভা বিশ্লেষণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য এক সারগর্ভ বক্তৃতা দেন।

কাপড় ধোলাইয়ের জন্যে নূতন যন্ত্রের আমদানী

অল্প সময়ে ও অল্প আয়াসে যাতে অনেক কাপড় এক সঙ্গে ধোলাই করা যায় সেজন্যে তড়িৎচালিত এক প্রকার যন্ত্র আজ প্রবর্ত্তিত হয়েছে। এই যন্ত্রের মধ্যে কাপড়-চোপড় সাবান গোলা জলে ঘুরতে থাকে ও ক্রমশঃ পরিষ্কার হতে থাকে।

মঙ্গলগ্রহ হইতে প্রথম নাদ-তরঙ্গ মার্কিণ রেডিও টেলিস্কোপে ধৃত

মার্কিণ নৌবাহিনী ঘোষণা করিয়াছে যে মঙ্গল গ্রহ হইতে সর্ব্বপ্রথম মার্কিণ যন্ত্রে শব্দতরঙ্গ পাওয়া যায়। মঙ্গল যখন সবচেয়ে নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল তখন এই শব্দতরঙ্গ ধরা পড়ে। ৬০ ইঞ্চি রেডিও-টেলিস্কোপে এই নাদ-তরঙ্গ ধরা পড়িয়াছে।

বাণিজ্যর গোড়ার কথা

বাণিজ্যে উন্নতি করতে হলে কেবল মূলধনই সব নয়। সংগঠন, দূরদৃষ্টি না থাকলে বাণিজ্যের উন্নতি কঠিন হয়ে পড়ে। ব্যাঙ্ক মূলধন নিয়ে অনেকেই তাই বড় ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছেন।

রেডিওর নূতন মডেল

ক্রুষ্টালের সাহায্যে অতি অল্প খরচে রেডিও তৈয়ারী সম্ভবপর। এই যন্ত্রের সরঞ্জাম হিসাবে ক্রুষ্টাল, কয়েল, হেডফোন ব্যবহৃত হয়। বেতার কেন্দ্র হইতে ৪০ মাইলের মধ্যে বিনা বৈদ্যুতিক শক্তিতে এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রোগ্রাম শোনা যয়।

লাইনে পাট চাষ

পাট লাইনের বুনিয়া যেসব সুফল পাওয়া গিয়াছে তাহা অপ্রত্যাশিত। হাতে ছিটাইয়া বুনিতে প্রতি একরে তিন সের দেশী ও পাঁচ সের তিতা পাটের বীজ লাগে।

মৃৎ-শিল্প প্রদর্শনী

সম্প্রতি কলিকাতায় এক মৃৎশিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। এই প্রদর্শনীতে নানারকমের প্রতিমা ও নানা মাটির খেলনার আয়োজন হয়। দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল থেকে নানা শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী হয়।

উন্নত ধরণের ছাপাইবার যন্ত্র

আমেরিকায় এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহাতে কোন কিছু বলিবার সঙ্গে সঙ্গে ছাপা হইয়া যায়। এই ধরণের যন্ত্র তড়িৎ-চালিত ও উন্নত ধরণের বৈজ্ঞানিক প্রণালী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

স্যাণ্ড-কালচার পদ্ধতিতে শাকসব্জির চাষ

জমি ছাড়াও শাকসব্জি উৎপাদন করা যায়। ইচ্ছা থাকিলে রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বাড়ীর ছাদে শাকসব্জির চাষ করিতে পারেন। এই চাষ প্রণালীতে বালি এবং নুড়ি পাথর একত্র মিশাইয়া একরকম রাসায়নিক প্রয়োগ করিলে আনাজপাতি, ফলফুল জন্মান যায়।

বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানী হ্রাসের আবশ্যকতা

একটি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের এক অধিবেশনে ভারতের বাইরের দেশ থেকে আমদানী কমাবার এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যাতে দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের সমাদর হয় সে দিকেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

সেলাইয়ের কলে নূতন যান্ত্রিক ব্যবস্থা

এবার কুটীর-শিল্পের এক প্রদর্শনীতে একটি নূতন ধরণের সেলাইয়ের কল সকলের বিস্ময় সঞ্চার করে। কলটিতে যে কোন কাপড় সেলাইয়ের জন্যে রাখলে আপনা থাকতে কাপড়টি সরে সরে যায় ও সেলাই হ'য়ে যায়।

চিত্র-শিল্পের অপূর্ব আয়োজন

শান্তিনিকেতন কলাভবন কেন্দ্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পীদের এক সমাবেশ হয়। ভারতীয় চিত্রশিল্পে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়ের প্রতিভা বিশ্লেষণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য এক সারগর্ভ বক্তৃতা দেন।

বাণিজ্যের গোড়ার কথা

বাণিজ্যে উন্নতি করতে হলে কেবল মূলধনই সব নয়। সংগঠন, দূরদৃষ্টি না থাকলে বাণিজ্যের উন্নতি কঠিন হয়ে পড়ে। ব্যাঙ্ক মূলধন নিয়ে অনেকেই তাই বড় ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছেন।

সূর্যের তাপহ্রাস

একদল বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস করেন যে সূর্য্যেরও তাপ হ্রাস পাচ্ছে। এই তাপ পরিমাপ করবার জন্যও যন্ত্রের আবিষ্কার করার চেষ্টা চলেছে, তবে কি পরিমাণে সূর্য্যের তাপহ্রাস হয়েছে সে নিয়েও গবেষণা চলেছে।

বড় আকারের কপি জন্মাইবার সরঞ্জাম

কোন বিশিষ্ট কৃষিবিদ্ একটি কৃষি প্রদর্শনীতে একটি বিরাট কপির নমুনা দেন। কপিটি ওজনে আধমণ। তিনি বলেন, কপিটিতে উৎপাদন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয়।

ভারতীয় সঙ্গীতের আসর

ভারতীয় সঙ্গীতের আসরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বোদ্ধা আজ ক্রমশঃই কমে আসছে। সম্প্রতি দিল্লীতে একটি আসরে শুভলক্ষ্মী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে এক অপূর্ব্ব সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। পরে ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা হয়।

শক্তির উৎস প্রাকৃতিক গ্যাস

প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে প্রচণ্ড শক্তি উৎপাদন করা কিরূপে সম্ভব, ভূগর্ভে প্রাকৃতিক গ্যাস কি ক'রে এল, এ নিয়ে নানা মত আছে। তবে অনেকেই মনে করেন পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্ম একই বস্তু থেকে। বিশ্লেষণ ক'রে দেখা গিয়াছে যে এদের উপাদানগুলি কার্বণ ও হাইড্রোজেন সমন্বয়ে গঠিত।

বীজ সংরক্ষণের উপায়

যাতে অনেকদিন ধরে বীজ সংরক্ষণ করা যায় সেজন্যে চাষীরা আজ আগ্রহ প্রকাশ করছেন। এজন্যে বীজকে সংরক্ষিত স্থানে এমনভাবে রাখতে হয় যাতে জল হাওয়া বেশী না লাগে। মাঝে মাঝে বীজের ওপর নানা রাসায়নিক দ্রব্য ছড়িয়ে দিতে হয়।

শিল্পবাণিজ্যের গতি

বিশ্ব-পরিস্থিতির অনিশ্চিত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পবাণিজ্যের অবস্থাও জটিল হয়ে পড়েছে। দেশের শিল্প বিদেশী শিল্পের তুলনায় এখনও পিছিয়ে আছে। তাছাড়া আবার যুদ্ধের সন্ত্রাস এখনও রয়েছে। ফলে শিল্পের স্বাভাবিক গতি নেই।

পরমাণু পরিমাপের পদ্ধতি

আণবিক শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নিরূপণের জন্য একটি অদ্ভুত যন্ত্র আবিষ্কারের কথা শোনা যাইতেছে। যন্ত্রটির ক্রিয়া খুবই বিস্ময়কর ও জটিল।

নৃত্যশিল্পীর অপূর্ব সাফল্য

ভারতের প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর ওয়াশিংটন শহরের রঙ্গমঞ্চে নটরাজ-নৃত্য দেখাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন। শিবের ধ্যানভঙ্গ এই রঙ্গমঞ্চে অপূর্ব্বরূপে রূপায়িত হয়।

অল্প মূলধনে ব্যবসা

বর্ত্তমানে সমবায় প্রথায় অল্প মূলধনে যাতে ব্যবসা চলতে পারে সে সুযোগ দেবার জন্যে সরকার এখন তৎপর। প্রতি দেশেই এই দিকে সরকারী দৃষ্টি ফিরেছে।

পাটের শ্রেষ্ঠ শত্রু

পাটের চাষ বৃদ্ধির জন্য এক বিশেষ গবেষণায় প্রকাশিত তথ্য এই যে, পাটের শ্রেষ্ঠ শত্রু একপ্রকার কীট। এই কীট ধ্বংস করিবার জন্য একপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োগ কার্য্যকরী। পাটের পাতায় এই দ্রব্য ছিটাইয়া দিতে হয়।

অভিনয় শিল্পের নূতন অধ্যায়

রঙ্গমঞ্চ ও ফিল্মে আজ নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে। এমন কি আজ ফিল্মে সংলাপ ও সঙ্গীতকে প্রাধান্য না দিয়া ভাবের দিক হইতে নূতনত্বের প্রয়োজন স্বীকার করা হইতেছে।

নূতন কর-ধার্যের প্রস্তাবে শেয়ার বাজারের বিস্ময়

নূতন কর ধার্য্যের প্রস্তাবে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের শেয়ার বাজারে ফটকা ও অন্যান্য প্রধান প্রধান শেয়ারের দর যথেষ্ট হ্রাস পায়। এই প্রস্তাবে লেন-দেনকারীর মধ্যে বিস্ময় লক্ষিত হয়। কি কারণে নূতন কর ধার্য্য হ'ল তা' নিয়েও সমালোচনা হয়

ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা (২)

নির্দ্দেশ ঃ

নীচের গল্পটি একটি মজার গল্প। চারটি চরিত্র গল্পটির বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভাবে প্রকট। কখন কোন্ চরিত্রের সাথে তোমার মিল খুঁজে পাও তা নির্দ্দেশ অনুযায়ী দাগ দিয়ে যাও। অর্থাৎ তুমি কোন্ অবস্থায় কার মতো কাজ ক'রবে তা এক একটি অংশ প'ড়বার পরই ঠিক ক'রে ফেলবে ও সেই চরিত্রের তলায় দাগ দেবে।

১। চারবন্ধু অজিত, বিকাশ, সুনীল ও মণীশ একবার সাইকেলে দেওঘর যাওয়া ঠিক ক'রল। ভোরে সকলে রওনা হ'ল। ব্যাণ্ডেলের কাছে গিয়ে অজিত হাঁফিয়ে উঠল ঃ ব'লল আজ আর গিয়ে দরকার নেই। বরং ম্যাটিনি সো'তে ঢুকে পড়া যাক। আবার কাল দেখা যাবে। বিকাশ তাতে ঘোর আপত্তি জানাল ও আরও এগিয়ে যেতে চাইল। ব'লল আমাদের কালকের মধ্যে পৌছাবার কথা। তাই আজ আরও এগিয়ে থাকতে হবে।

তুমি কার মত আচরণ ক'রতে?

অজিত বিকাশ

২। শেষে যখন এগিয়ে যাওয়াই ঠিক হ'ল তখন একটু বিশ্রাম করে সকলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বেরিয়ে পড়ল। বেশ খানিকটা রাস্তা পার হ'বার পর পথে এক দুর্ঘটনা ঘটল। সুনীলের সাইকেলে ধাক্কা মারল একটি গোরুর গাড়ী। সাইকেলও জখম হ'ল। এখন উপায় কি? সুনীল খুব ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়ল। সে সাইকেলের ব্যাগ থেকে টুকিটাকি যন্ত্রপাতি নিয়ে সারতে ব'সল; কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই বিরক্ত হ'য়ে উঠে প'ড়ল। তখন মণীশ এসে বসল সারবার জন্যে। কোন দিকে না তাকিয়ে সে যন্ত্রপাতি নিয়ে সারবার আপ্রাণ চেষ্টা ক'রতে লাগল।

তুমি কার মত আচরণ ক'রতে?

সুনীল মণীশ

৩। অনেক চেষ্টার পর মণীশ সাইকেলটিকে সেরে মোটামুটি চ'লবার অবস্থা আনল। আবার চলা সুরু হ'ল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে।

অথচ সকলেই ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছে। তখনও বর্দ্ধমান ঘণ্টাখানেকের পথ। অজিত বলল, 'এখানেই কোথাও রাত্রি কাটান যাক। আর যেরূপ পথের কষ্ট, বাকী পথটা ট্রেণে গেলেই হবে।' কিন্তু সুনীল তাতে আপত্তি জানিয়ে ব'লল, 'যখন একটা পরিকল্পনা নিয়ে বেরোন হ'য়েছে তখন কোন মতে আস্তে আস্তে সাইকেলে এগোনই ভালো।' তবে সেদিন সে আর এগুতে নারাজ হ'ল।

তুমি কার মতো আচরণ ক'রতে ?

অজিত ? সুনীল

৪। কিন্তু সে যুক্তি টিকল না। শেষে বিকাশের পাল্লায় প'ড়ে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত সেই রাত্রেই এগুতে হবে ঠিক হ'ল। মণীশ সকলকে উৎসাহ দিয়ে এগুতে লাগল। কিন্তু অজিত প্রবল অনিচ্ছা প্রকাশ ক'রতে লাগল ও শেষে ফিরে যাবার মনস্থ ক'রল।

তুমি কার মত আচরণ ক'রতে ?

মণীশ ? অজিত

৫। পরদিন সকালে পথে দুর্গাপুর প'ড়ল। দুর্গাপুরের কাছে এসে সুনীল ব'লল যে সে আর দেওঘর যাবে না, দুর্গাপুর দেখে ট্রেণে বাড়ী ফিরবে। পরক্ষণেই ভাবল দুর্গাপুর না গিয়ে স্টেশনে কিছু খেয়ে দেয়ে বাড়ী ফিরলেই ভাল হ'ত। বিকাশ কিন্তু এতে ঘোর আপত্তি জানাল ও যতক্ষণ দেওঘরে না পৌঁছান যায় ততক্ষণ ভীষণ অস্বস্তি অনুভব ক'রতে লাগল।

তুমি কার মত আচরণ ক'রতে ?

সুনীল ? বিকাশ

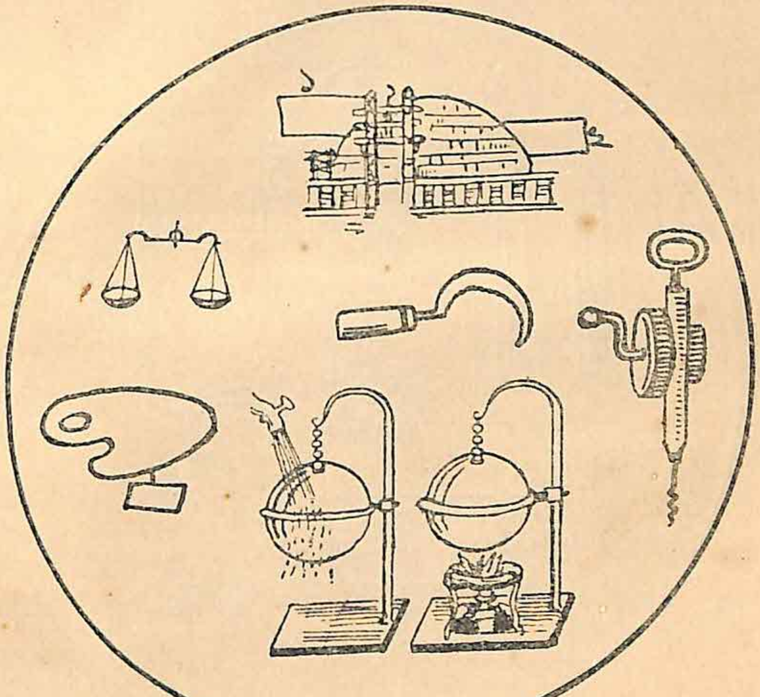
৬। শেষে তারা সারাদিন পরিশ্রমের পর দেওঘর পৌঁছল। কিন্তু—থাকবে কোথায় ? তার জন্যে পরিশ্রমও কম নয়। পাহাড়ের চূড়ায় এক মন্দিরে যাওয়া ঠিক হ'ল। কিন্তু সাইকেল নিয়ে উঠবে কে ? বিকাশ ব'লল—পাহাড়ে না উঠে—সহর ঘুরে এলেই ভালো হ'ত। মণীশ কিন্তু পাহাড়ে উঠবার সঙ্কল্প নিল। বারবার বসেও সে শেষে মন্দিরের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছল।

তুমি কার মত আচরণ ক'রতে ?

মণীশ ? বিকাশ

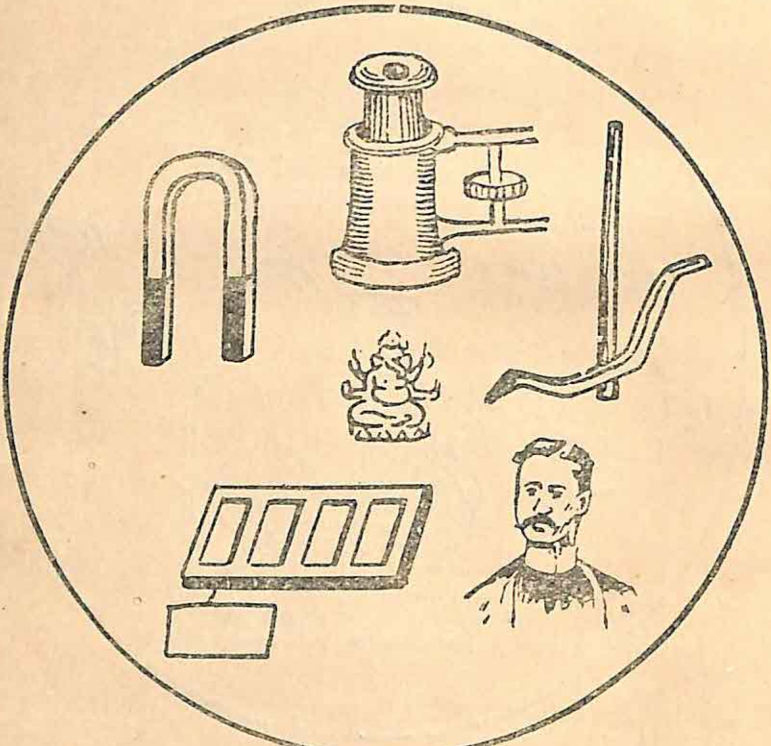
ফ্ল্যাশকার্ড

১



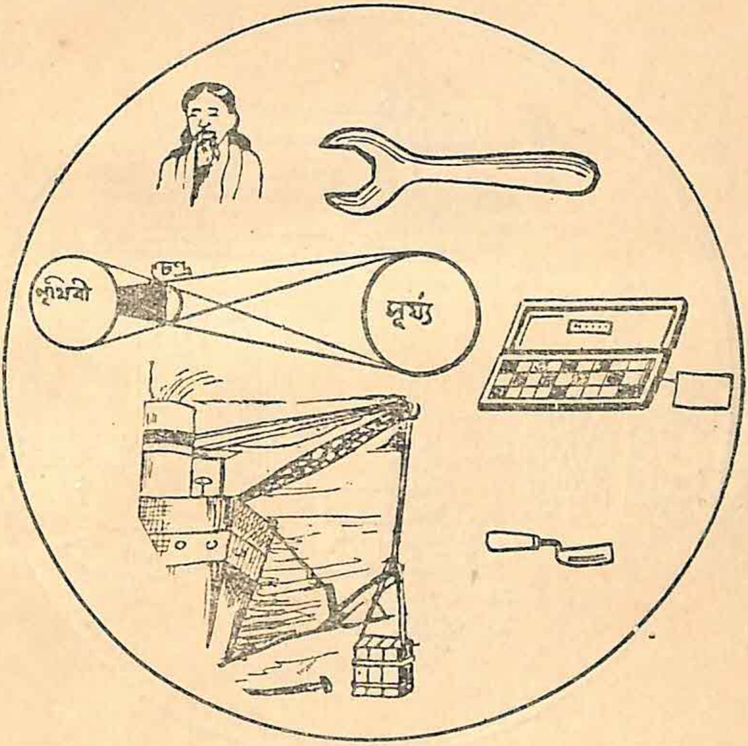
ফ্ল্যাশকার্ড

২



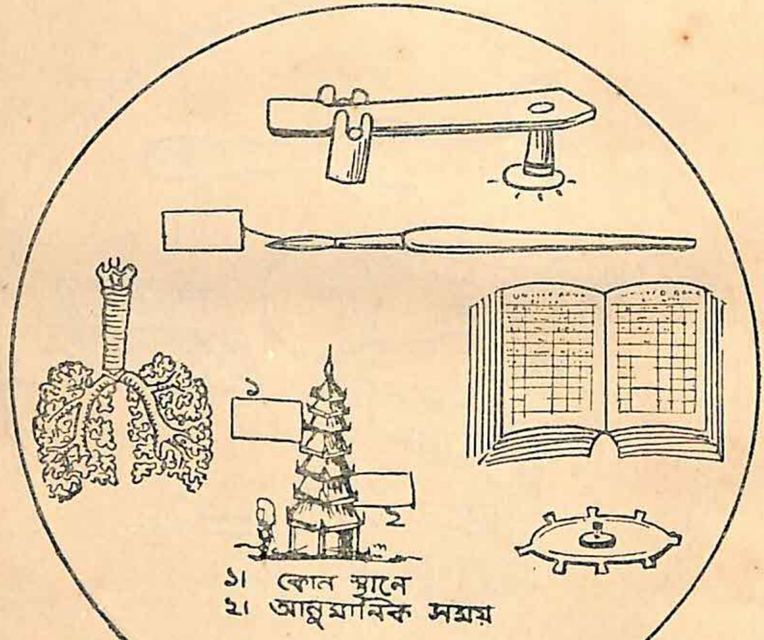
ফ্ল্যাশকার্ড

৩



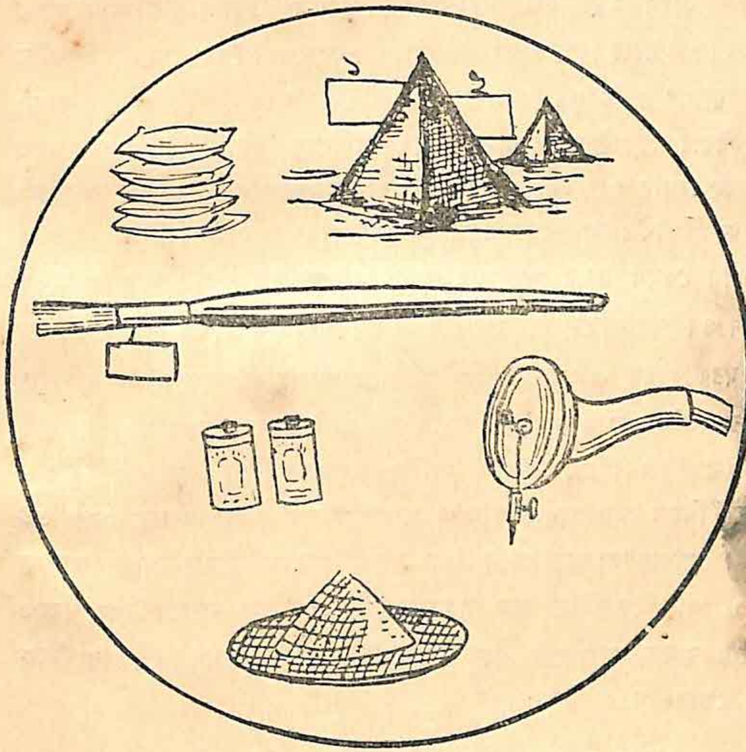
ফ্ল্যাশকার্ড

৪



ফ্ল্যাশকার্ড

৫



অভীক্ষার প্রয়োগ-পদ্ধতি ও ফলাফল বিচার

এই পুস্তকের মধ্যে যে সব অভীক্ষার নমুনা দেওয়া হ'য়েছে সেগুলি দিয়ে শিক্ষার্থীর বিষয়ানুরাগ ও অধ্যবসায় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা জন্মাবে। প্রশ্ন উঠতে পারে ব্যক্তিত্বের উপাদানের মধ্যে বিষয়ানুরাগ ও অধ্যবসায়কে নির্ব্বাচন করা হ'ল কেন? কারণ মনস্তাত্বিক গবেষণায় শিক্ষাক্ষেত্রে এই দুইটির মূল্য বিশেষ স্বীকৃতিলাভ ক'রেছে। অভিভাবক ও শিক্ষক প্রত্যেকেরই শৈশব থেকেই শিক্ষার্থীর বিষয়ানুরাগের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে ও সেই অনুযায়ী নির্দ্দেশ দিতে হবে। যে যে-বিষয়ে অনুরাগী তারই মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সহজ হয়। আর সেই সঙ্গে দেখার প্রয়োজন যে, কোন্ বিষয়ে তার লেগে থাকবার শক্তি কতটুকু। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের এই দুটি দেখার সার্থকতা তাই যথেষ্ট।

এখন কেমন ক'রে অভীক্ষার প্রয়োগ ক'রতে হবে ও অভীক্ষার ফলাফলের বিশ্লেষণ ও বিচার করতে হবে তা একে একে দেওয়া হ'ল। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা দরকার যে, এক জনের বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ বা অনুরাগ থাকতে পারে, তবে কোন্ বিষয়ে তার অনুরাগ সবচেয়ে বেশী তা পরীক্ষা করতে হবে।

কৃষ্টি-কেন্দ্রিক বিষয়, বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, চারুকলা ও কৃষি— এই ছয়টি বিষয়ে কার কতটুকু অনুরাগ সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবার জন্যে এই প্রচেষ্টা। সাধারণতঃ যারা কোন বিষয়ে অনুরাগী হয় সেই বিষয়ে তাদের সাফল্য আসে। আর যে বিষয়ে যার আগ্রহ সবচেয়ে বেশী তার মাধ্যমে নীরস বিষয়ও শিক্ষার্থীর কাছে আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠে। তাই অনুরাগ পরীক্ষার দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হ'য়েছে।

কোন্ বয়সের শিক্ষার্থীর উপর এই অভীক্ষা প্রয়োগ করতে হবে?

অষ্টম শ্রেণী থেকে যখন শিক্ষার্থী নবম শ্রেণীতে উঠবে, বিশেষ ক'রে তখন এই অভীক্ষার সার্থকতা খুব বেশী। তবে পরীক্ষামূলকভাবে এই অভীক্ষা প্রয়োগ ক'রে যদি দেখা যায় যে নির্দ্দিষ্ট বিষয়ানুরাগের সঙ্গে সেই বিষয়ে পরীক্ষার সাফল্যের সম্পর্ক আছে, তবে ব্যাপকভাবে এই অভীক্ষার প্রয়োগ আরও বাঞ্ছনীয় হবে।

অভীক্ষা ও অভীক্ষার প্রয়োগ-পদ্ধতি

অভীক্ষা	প্রয়োগ পদ্ধতি	বিশ্লেষণ
বিষয়ানুরাগ পরীক্ষা (১) : ৮৪টি প্রশ্ন	সমস্ত শ্রেণীকে দিতে হবে। নির্দ্দেশটি পড়ে দিতে হবে ও প্রয়োজন হ'লে বুঝিয়ে দিতে হবে। আনুমানিক সময়—১০ মিনিট	ছয়প্রকার অনুরাগ যাচাই ক'রবার জন্যে প্রশ্ন আছে। কোন্ প্রকার অনুরাগের জন্যে কে কত নম্বর পাবে তা তালিকা আকারে লিখে রাখা হবে। অনুকূল উত্তরের জন্যে ৩, প্রতিকূল উত্তরের জন্যে ১ এবং প্রশ্ন বা সংশয়াত্মক উত্তরের জন্যে ২ দেওয়া হবে। কোন্ প্রশ্ন কোন অনুরাগ পরীক্ষার জন্যে তা গবেষণা সাপেক্ষ। তবে বর্ত্তমানে কয়েকজন শিক্ষাবিদের মতামতের ওপর নির্ভর ক'রে পরীক্ষামূলক ভাবে কাজে এগোনো যায়।
বিষয়ানুরাগ পরীক্ষা (৪) প্রশ্নাবলী। ২০টি ভাগে ৬০টি প্রশ্ন সাজানো আছে	সমস্ত শ্রেণীকে দিতে হবে। নির্দ্দেশটি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে হবে। আনুমানিক সময়—৭ মিনিট	প্রতিটি প্রশ্নের বিপরীত দিকের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ও শিক্ষার্থীর রুচির স্তরভেদ অনুযায়ী—৩, ২, ১ বসিয়ে দিতে হবে। কোন পঙক্তির যে কাজটি বেশী ভালো লাগে সেখানে ৩, যেটি সবচেয়ে কম সেখানে ১, আর যেখানে মাঝামাঝি সেখানে ২ বসিয়ে দিতে হবে। আর কোন্ ধরণের প্রশ্নের জন্যে শিক্ষার্থী নানা অবস্থায় মোট কত সংখ্যা দিয়েছে তা বিশ্লেষণ করে তার অনুরাগ কোন্ বিষয়ে বেশী তা ঠিক ক'রতে হবে। কোন্ প্রশ্ন কোন্ বিষয়ানুরাগ পরীক্ষার জন্যে তা গবেষণা সাপেক্ষ। তবে বর্ত্তমানে কয়েকজন শিক্ষাবিদের মতামতের উপর নির্ভর ক'রে পরীক্ষামূলক ভাবে কাজে এগোনো যায়।

অভীক্ষা	প্রয়োগ পদ্ধতি	বিশ্লেষণ
বিষয়ানুরাগ পরীক্ষা (২) : ৩৬টি প্রশ্ন—৬টি করে প্রশ্ন এক এক বিষয়ানুরাগ পরীক্ষার জন্যে।	সমস্ত শ্রেণীকে দিতে হবে। অনুমানিক সময় ১৮ মিনিট	উত্তরদাতা প্রত্যেক সঠিক উত্তরের জন্যে ১ নম্বর পাবে। কোন্ কোন্ প্রশ্ন কোন্ কোন্ বিষয়ানুরাগের নির্দ্দেশক তা গবেষণা সাপেক্ষ। তবে বর্ত্তমানে কয়েকজন শিক্ষাবিদের মতামতের উপর নির্ভর ক'রে পরীক্ষামূলক ভাবে কাজে এগোনো যায়।
ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা (পৃষ্ঠা ১২৫-১৪৪)। (বিষয়ানুরাগ পরীক্ষা (৩) ৬০টি ছবি)	সমস্ত শ্রেণীকে দিতে হবে। সময় ২০ মিনিট	শিক্ষার্থী প্রত্যেকবার যে ধরণের ছবি বেছে নেবে সেই বিষয়ানুরাগের জন্যে ১ নম্বর ক'রে পাবে। কোন্ সংবাদ কোন্ বিষয়ানুরাগের নির্দ্দেশক তা গবেষণা সাপেক্ষ। তবে বর্ত্তমানে কয়েকজন শিক্ষাবিদের মতামতের উপর নির্ভর করে পরীক্ষামূলক ভাবে এগোনো যায়।
বিষয়ানুরাগ পরীক্ষা (৫) : সংবাদ তালিকা (৩০টি টুকরো সংবাদ নানাভাবে সাজানো)	ঐ	শিক্ষার্থী প্রত্যেকবার যে ধরণের সংবাদ পড়বার জন্যে বেছে নেবে সেই বিষয়ানুরাগের ক্ষেত্রে সে নম্বর পাবে। কোন্ সংবাদ কোন্ বিষয়ানুরাগের নির্দ্দেশক তা গবেষণা সাপেক্ষ। তবে বর্ত্তমানে কয়েকজন শিক্ষাবিদের মতামতের উপর নির্ভর ক'রে পরীক্ষামূলক ভাবে এগোনো যায়।
বিষয়ানুরাগ পরীক্ষা (৬) : ফ্ল্যাশকার্ড	১ মিনিট	যে ধরণের জিনিষ বেশী মনে থাকবে সেই দিকে বিষয়ানুরাগ অধিক। কোন্ ছবি কোন্ বিষয়ানুরাগের নির্দ্দেশক তা গবেষণা সাপেক্ষ। তবে বর্ত্তমানে কয়েকজন শিক্ষাবিদের মতামতের উপর নির্ভর ক'রে পরীক্ষামূলক ভাবে এগোনো যায়।

অভীক্ষার প্রয়োগ-পদ্ধতি ও ফলাফল বিচার

অভীক্ষা	প্রয়োগ পদ্ধতি	বিশ্লেষণ
ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা (১) (পৃষ্ঠা ১০৮) অধ্যবসায় পরীক্ষা : ১৮টি প্রশ্ন	সময় ৫ মিনিট	অধ্যবসায় দ্যোতক প্রশ্নের অনুকূল প্রতিটি উত্তরের জন্য শিক্ষার্থী ৩ নম্বর করে পাবে, প্রতিকূল প্রশ্নের জন্য ১ নম্বর পাবে, সন্দেহসূচক প্রশ্নের জন্যে ২ নম্বর পাবে।
ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা (২) : পৃষ্ঠা ১৫৫ ৬টি গল্পাংশ	ঐ	প্রত্যেক গল্পাংশের যে চরিত্রটি অপেক্ষাকৃত অধ্যবসায়ী, তার নামের তলায় দাগ দিলে প্রত্যেকবার শিক্ষার্থী ১ নম্বর ক'রে পাবে।
ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা (৩) : ৪ রকম কাজ	সময় ৩০ মিনিট	যতগুলি কাজ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করবে, তা দিয়ে সময়কে ভাগ ক'রতে হবে; যে বেশী সংখ্যক কাজ নির্দ্দিষ্ট সময়ে করবার চেষ্টা ক'রবে সে কম অধ্যবসায়ী।
ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা (৪) : ৬ রকমের কাজ আছে	সময় ১০ মিনিট	যতগুলি কাজ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করবে, তা দিয়ে সময়কে ভাগ ক'রতে হবে; যে বেশী সংখক কাজ নির্দ্দিষ্ট সময়ে করবার চেষ্টা ক'রবে সে কম অধ্যবসায়ী।

ত্ব অভীক্ষা (৪)

২

ছোট জিনিষের ছবি আছে, কোন্‌টি কি, ছবির ওপর

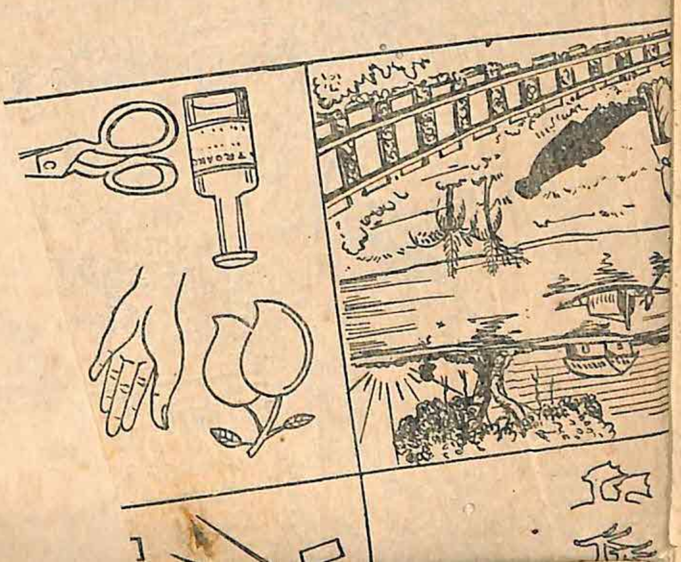
দেওয়া আছে তাহারা কোন্ মাটিতে ভালো জন্মায় তাহা
গাছ যে মাটিতে ভালো জন্মায় মাটির সেই সংখ্যা ছবির
হরণ—বেলে মাটির সংখ্যা ১—এখন যে ফসল বেলে
বসিবে।
সংখ্যা দিয়া চিহ্নিত কর। যে ফসল গ্রীষ্মকালে বেশী
রূপভাবে বসিয়ে যাও।
াগী সেই সংখ্যার নম্বর গাছের নীচের ঘরে বসাও।
পুঁতিলে ন

(ক) নী
পর

(খ) নী
অ

(গ) নী

(ঘ) নী



কয়েকটি বিন্দু দেওয়া আছে ও প্রত্যেক বিন্দুর এক একটি নম্বর আছে। নম্বরগুলি যোগ করিলে কি হইবে বল।

একটি ছবি আছে। যেখানে যে রঙ দিলে মানায় তা রঙের পেন্সিলের সাহায্যে য়া দাও।

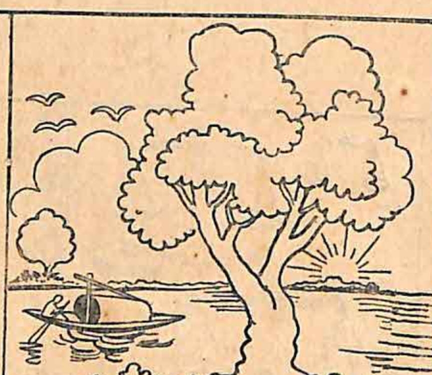
বিন্দুগুলি এমনভাবে যোগ কর যে দুটি ভিন্ন পাখী পাওয়া যাইবে।

কয়েকটি ছবি দেওয়া আছে। কোন্‌টি কি, ছবির ওপর লিখিয়া দাও।

ছবিতে যেখানে যেখানে ভুল আছে ঠিক সেই স্থানে Cross (×) চিহ্নিত কর।

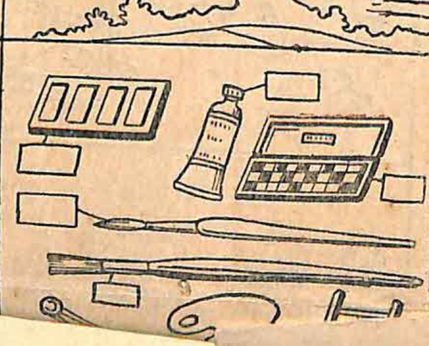
ছবিটিতে যেখানে যেখানে ভুল বা অস্বাভাবিকতা আছে ঠিক সেই স্থান চিহ্নিত কর।





খ





ঘ